নজরুল স্মৃতি

নজরুল স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

সাহিত্যম্ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কবি-শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

বাংলা দেশের জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত এই ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের দীর্ঘদিন থেকেই ছিলো। সম্প্রতি শ্রীবিশ্বনাথ দে-র সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হলো।. এই সংকলনের সমস্ত রচনা তিনিই সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই এই 'নজরুল-স্মৃতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

প্রকাশক

কবি-প্রশস্তি

[বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে]

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ায় সারা দেশের মানুষের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার গভীর আনন্দ প্রকাশ করছে এবং বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছে যে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে বোধ ও বাক্‌শক্তিহীন কবিকে আজ এ-কথা জানাবার কোনো উপায় নেই তিনি আমাদের কতো আদরের, কতো শ্রদ্ধার এবং কত গৌরবের।

বৃটিশ শাসিত ভারতের পরাধীনতার লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তিনি কিশোর বয়সেই দেশপ্রেমের আহ্বানে সাড়া দেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র সৈনিক হওয়ার প্রবল আগ্রহে তিনি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রজীবন ত্যাগ করে সৈনিকের জীবন গ্রহণ করেন।

এই সৈনিকজীবন থেকে তিনি যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর কাব্যের মোহনবাঁশি অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষুরধার অসিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি একবাক্যে তাঁকে বিদ্রোহী কবিরূপে বরণ করে নিলো।

অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর লেখনীকে বার বার স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে, তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু অত্যাচারের শাণিত কৃপাণ কখনো তাঁকে ক্লান্ত ও শান্ত করতে পারে নি। শিকল পরেই তিনি শিকল ভাঙার এবং কারাগারের লৌহকপাট লোপাট করার গান গেয়েছেন। পরাধীন ভারতের দুরন্ত যৌবনের গীতিকার কবি বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুবচিত্তকে রক্ত-রাঙা প্রভাতের আশায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের ফলে দেশের অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক বিশুদ্ধ শিল্প অথবা ধনতান্ত্রিক ইউরোপের অবক্ষয়বাদী ও পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিল্প-চর্চায় মগ্ন ছিলেন। এই সময় বিদ্রোহী

কবি নজরুলের কাব্য কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার শঙ্খ-নিনাদে নিবৃত্ত হয় নি—ইউরোপের পূর্ব প্রান্তে যে নূতন সমাজ সৃষ্টির সূচনা হয়েছিলো—তাকে স্বাগত জানিয়ে তার জয়ধ্বনি করে তিনি বিশ্ব-শ্রমিক মৈত্রীর রণধ্বনি 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের অনুবাদ এবং 'সাম্যবাদী' কবিতা রচনা করে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা প্রচারে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কবির সংগ্রামী ভাবাদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষাকেও তিনি নূতন সম্পদে ভূষিত করেছেন, নিত্য নূতন শব্দ চয়ন করে এবং ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে বাংলার ললিত গীতিকাব্যকে রণক্ষেত্রের তূর্যধ্বনিতে পরিণত করেছেন। এইভাবে কাব্যে ও সংগীতে তিনি যে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা করেছে।

বৃটিশ শাসনের যে অধ্যায়ে কবির আবির্ভাব—সেই অধ্যায়ে ধর্মীয় এবং মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারের সুযোগ নিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দেশের মধ্যে বিভেদের ষড়যন্ত্র করে। কবি নজরুল ইসলাম কেবল লেখনী দিয়ে নয়—নিজের জীবন দিয়ে এই বিভেদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আজ যখন রাষ্ট্রীয় কারণে বাঙালী জাতি খণ্ডিত, তখন তিনি আমাদের মধ্যে এমন একটি জীবন্ত সেতু—যার সাহায্যে দুই রাষ্ট্রের অধিবাসী বাঙালী মুহূর্তে নিজেদের এক অভিন্ন বলে ভাবতে দ্বিধাবোধ করে না।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরযৌবনের প্রতীক, উন্নততর জীবনের জন্য ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতীক। আজকের এই পুণ্য দিনে আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে আমরা প্রার্থনা করি—অনির্বাণ দীপশিখার মতো তিনি আমাদের চিত্তকে আলোকিত করুন এবং মানব-মুক্তির মহত্তম সাধনায় আমাদের চিরন্তন প্রেরণা হয়ে থাকুন। ইতি—

গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষে

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট সরকার

[কবির সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রদত্ত মানপত্রের প্রতিলিপি]

ভূমিকা

খুব ছোটো বয়সে 'ভোর হলো দোর খোলো' কবিতা পড়ে আমাদের বাঙালী ছেলে-মেয়েদের নজরুলের কবিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর 'কাঠবেড়ালি' কি 'দেখবো এবার জগৎটাকে' পড়ার বয়স পেরিয়ে এসে একদিন পরিচিত হয় কবির সেই বিখ্যাত কবিতা 'বলো বীর চির উন্নত মম শির'-এর সঙ্গে। জানতে পারে এই কবি নজরুল কবিতা লিখে, কাগজ বার করে একসময় জেল খেটে এসেছেন, ভোগ করে এসেছেন বিদেশী বৃটিশ সরকারের অকথ্য ঘৃণ্য নির্যাতন। আরো জানতে পারে, অনেক জ্বালাময়ী কবিতা ও গান লেখার জন্য এই কবি নজরুলকে বলা হয় 'বিদ্রোহী কবি'।

কিন্তু একজন পুরো মানুষকে জানার পক্ষে এইটুকুই কি সব?

না, তা নয়।

আর তা নয় বলেই আমাদের কিশোর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সামনে কবি নজরুল মানুষটিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য এই 'নজরুল স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো।

পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু মানুষ আসেন যাঁরা খুব ছোটোবেলা থেকেই মনের মধ্যে একটি গেরুয়া-পরা মানুষকে লালন করে রাখেন। পরে, সময় হলে, সেই মনের আড়ালের গেরুয়া-পরা মনটিই তাঁকে যোগী করে তোলে, দেশের মানুষ যাঁর অমৃত-নির্ঝর বাণী শুনবে, এমনি কণ্ঠস্বর আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে।

সে মানুষরা অনেক আলোর সামনে থেকেও অন্ধকারকে ভোলেন না। অফুরন্ত হাসি-আনন্দের মধ্যেও থাকে তাঁদের দুঃখের অনুভূতি। আর অযুত জনারণ্যের মাঝখানেও হারান না মনের গভীর নিঃসঙ্গতা।

নজরুলও এমনিই একটি মানুষ। অনেক আলোর মাঝখানে থেকেও যিনি অনেকের আঁধারের সঙ্গী হয়েছেন, শত আনন্দের মধ্যেও দুঃখকে কোনোদিন ভোলেননি, আর বহু মানুষের ভীড়ের মধ্যেও যিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, একা, নির্লিপ্ত।

আপাত দৃষ্টিতে যোগী অবশ্য তিনি হননি, কোনো ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাও তাঁকে নিতে দেখা যায়নি কোনোদিন। তিনি মন্দিরের নন, মসজিদও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি কখনো। বরং বলা যায়, মন্দির আর মসজিদের দুটি পৃথক

অবয়ব তাঁর চোখে এক হয়ে, একাকার হয়ে দেখা দিয়েছিলো। তাই তাঁর মধ্যে পেয়েছি আমরা নতুন যুগের নতুন যোগী, নতুনতর ধর্মপ্রচারকের আকৃতি। শুনেছি তাঁর ভেদাভেদ দূর করা একতার বেদমন্ত্র, সাম্যের সামগান।

নজরুলের নিকট-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কোনোদিনই ভুলবেন না তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি, ভাস্বর-ভানুত্ব। কবির সেই হিমালয়-নির্ঝর গুরু গুরু কণ্ঠস্বর আজো তাঁদের কানে বাজে। মনে পড়ে ঘরোয়া মানুষ দরদী কবি নজরুলের নিত্যদিনের কতো ঘটনার স্মৃতি-চিত্র।

এমনি অনেক লেখাই 'নজরুল-স্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবিকে কাছে থেকে দেখে যাঁরা নিজেদের স্মৃতিকথায় সে ছবি এঁকেছেন, এমন লেখাগুলি দেওয়া হয়েছে 'স্মৃতি-কথা' পর্যায়ে। এ পর্যায়ে যাঁদের লেখা সংকলিত হয়েছে তাঁরা অনেকেই ছিলেন কবি নজরুলের সুখ-দুঃখের সাথী, আবাল্যের সুহৃদ আর যৌবনের সহযাত্রী।

এ ছাড়া আরো তিনটি বিভাগে এই সংকলনের লেখাগুলিকে পৃথক করা হয়েছে। 'জীবন-কথা' পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে কবির জীবনী বিষয়ক রচনাগুলি। এ পর্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে কবি-জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনাবলীর সহজ সরল ছবি, যা—পড়ে কখনো মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, আবার কখনো বা কবির ঘরোয়া-জীবনের গল্পে, খেয়াল-খুশির ঘটনায় পাঠক-মন হেসে উঠবে নির্মল অনাবিল আনন্দে।

কবি নজরুলের সৃজন-বিষয়ক লেখাগুলি দেওয়া হয়েছে 'সৃজন-কথা' পর্যায়ে। কবিতা-গান-উপন্যাস-ছোটোগল্প-শিশু সাহিত্য—সর্ব বিষয়ে অবাধ পদসঞ্চারী নজরুলের পরিচিতি বহন করেছে এই পর্যায়ের রচনাগুলি। আর 'কল্প-কথা'য় মাত্র একটি রচনা দেওয়া হয়েছে। কবি আজ স্তব্ধ, নির্বাক। যদি নীরব কবির বোধ ফিরে আসে, আর যদি সেই দিন সেই ক্ষণে এই রচনার রচনাকার তাঁর সামনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন, তারই একটি চমৎকার কাল্পনিক ছবি এই রচনাটিতে পাওয়া যাবে। কবির জীবিত কালে তাঁকে হারানোর নির্মম দুঃখের মধ্যেও একটি আশার আলো যেন এ লেখায় জলে উঠেছে। সেই কারণে এই রচনাটি 'নজরুল স্মৃতি' সংকলন-গ্রন্থে সংযোজন করার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হলো।

কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে এই সংকলনের কিছু কিছু লেখা মূল রচনা

থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সংক্ষেপিত করে নিতে হয়েছে। লেখাগুলি সাজানোর সময় বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে চলা হয়নি, যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে সেইভাবেই পর পর ছাপা হলো।

'নজরুল-স্মৃতি' সম্পাদনার কাজে বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন কবি পুত্রদ্বয় কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ এবং আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এম. আসনান ও পারমিতা সেন। কবির হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিগুলি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ। এই সংকলনের কিছু কিছু লেখাও তাঁদের সৌজন্যে আমি পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আমাদের ছড়াকার-কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।'

সেই ভাগ-না-হওয়া কবি নজরুল সম্পর্কে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার একশত একজন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সমাজসংস্কারক-বিপ্লবী নেতার লেখা নিয়ে 'নজরুল স্মৃতি' প্রকাশিত হলো। প্রায় দশ বছর আগে প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ও সাহিত্য-প্রেমী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয়ের প্রচেষ্টায়, তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ক্যালকাটা বুক হাউস' থেকে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' নাম দিয়ে এ ধরনের একটি সংকলন-গ্রন্থ, কবিগুরুর জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে সমাদর লাভ করেছিলো। 'নজরুল-স্মৃতি'-ও যদি সেইরূপ সমাদৃত হয়, তবেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, কবি নজরুল সম্পর্কিত এই সংকলনের লেখাগুলি মূলত কিশোর বয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে রেখে গ্রথিত হলেও, কবি নজরুল ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি বাঙালী পাঠক-পাঠিকাই যাতে এই গ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্ত হন, সে চেষ্টা আমি করেছি।

পরিশেষে আর একটি কথা, এই দুর্মূল্যের দিনে এমন একটি বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থের এতো অল্প মূল্য ধার্য করার জন্য 'সাহিত্যম্'-এর কর্ণধার শ্রীনির্মলকুমার সাহা মহাশয়কে শুধু আমি নয়, নজরুল-অনুরাগী সমস্ত বাঙালী পাঠক-পাঠিকাও যে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিশ্বনাথ দে

NAZRUL SMRITI

Edited By

Biswanath Dey

Rs. 6·00

বহুদিন থেকে ইচ্ছে ছিল 'বিদ্রোহী কবি' সম্বন্ধে একটা বই প্রকাশ করার। সম্পাদক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন লেখকের রচনা সংগ্রহ ক'রে দেওয়ায় এতদিনে সে ইচ্ছা ফলবতী হ'ল। এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা-অভিভাষণ-চিঠিপত্র ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু। ১

বিপিনচন্দ্র পাল—বীণার ঝঙ্কারে। ৩

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বাঙালীর কবি নজরুল। ৪

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৪

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৫

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৫

সুভাষচন্দ্র বসু—কবি নজরুল। ২

স্মৃতিকথা ঃ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—আমাদের ছাত্র নজরুল। ২৩০

হেমেন্দ্রকুমার রায়—স্মৃতির গ্রামোফোনে···। ১০৫

নলিনীকান্ত সরকার—ছুটি ছোটো গল্প। ৩৯

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য—পুরোনো কথা। ৪১

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—ধূমকেতুর কবি নজরুল। ৬

মুজফ্‌ফর আহমদ—সুরের রাজ্যে নজরুল। ২৪

আবদুল হালীম—নজরুলের ধূমকেতু। ২৪৫

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—মানুষ নজরুল। ৪৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি স্মরণীয় দিন। ৩০

ইন্দুবালা দেবী—সুরের রাজা। ১৪২

আঙুরবালা দেবী—একটি করুণ কাহিনী। ১৫০

আব্বাসউদ্দীন আহমদ—কাজীদার কথা। ১৪৪

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—নজরুল। ২৯

ইব্রাহীম খাঁ—আমার জীবনে নজরুল। ১৭২

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রথম আলাপে। ৭২

মন্মথ রায়—উদার নজরুল। ৩৩
সূফী জুলফিকার হায়দার—স্মৃতি-রঙ্গ। ৯৮
শচীনদেব বর্মণ—কাজীদা। ১৫২
মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্ বাহার—কাজী সাহেব। ১০৭
বুদ্ধদেব বসু—নজরুল ইসলাম। ৭৮
জসীমউদ্দিন—কবি নজরুল প্রসঙ্গে। ৮৪
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—একদিনের ঘটনা। ৬৮
আবুলকালাম শামসুদ্দীন—নজরুলের সঙ্গে। ৫৪
জগৎ ঘটক—কবি নজরুল। ১৫৪
বেগম শামসুন্‌নাহার মাহমুদ—নজরুলকে যেমন দেখেছি। ১৫৯
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—মধুমালার গোড়ার কথা। ১৬৯
আয়নুল হক খাঁ—নজরুল চরিত্রের দু'একটি দিক। ২৫৯
পঞ্চানন ঘোষাল—নজরুল স্মৃতি। ৩৫৪
সারদা গুপ্ত—আমাদের কাজীদা। ২৪২
বরদা গুপ্ত—কাজীদার গান শেখানো। ২৬২
বেগম সুফিয়া কামাল—আমার জীবনে নজরুল। ১৮৪
অখিল নিয়োগী—আপন-ভোলা নজরুল। ১২৫
আবুল মনসুর আহমদ—নজরুল-সান্নিধ্যে। ২৯১
সরযূবালা দেবী—কাজীদার স্মৃতিকথা। ২২২
দেবনারায়ণ গুপ্ত—আজও মনে আছে। ২৯৫
যূথিকা রায়—কাজী সাহেবের কথা। ২২৮
দক্ষিণারঞ্জন বসু—ঐক্যের প্রতীক। ৩০৭
আজহারউদ্দীন খান—জীবন-সায়াহ্নে কবি নজরুল। ৩২৩
কাজী সব্যসাচী—বাল্যস্মৃতির একপাতা। ২৪৪
কল্যাণী কাজী—আমাদের মা। ২৬৪
দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়—কবিকে যেমন দেখেছি। ৩২৬
মজহারুল ইসলাম—কবি নজরুল প্রসঙ্গে। ৩৪১

জীবন-কথা ঃ

পরিমল গোস্বামী— আজ যাঁকে বেশী প্রয়োজন ছিলো। ২৩৬
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় —কাল বৈশাখী। ১১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—যোগাসীন নজরুল। ৬৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র—ঝড়। ৭৩
কাজী মোতাহার হোসেন- মানুষের কবি নজরুল। ২১৭
প্রবোধকুমার সান্যাল- নজরুল। ৭৫
মৈত্রেয়ী দেবী—গিরিবালা। ১৩৪
মুকুল সর্বাধিকারী—সাংবাদিক নজরুল। ২১
আবদুল কাদির—নজরুল-জীবনের প্রথম পর্ব। ১১৯
হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাজ-ভিখারী নজরুল। ৩৩৪
মইনুদ্দিন—নজরুলের ছেলেবেলা। ২৭০
গোপাল ভৌমিক—কবি-কথা। ২৪৭
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়—কারাজীবনে কবি নজরুল। ২৮১
গোলাম কুদ্দুস- নজরুল ইসলাম ও কে. মল্লিক। ৯৩
কল্পতরু সেনগুপ্ত—নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ। ২১৪
কাজী মোহম্মদ ইদ্রিস—ছাত্রজীবনে নজরুল। ২৩১
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়—টুকরো কথা। ২৬৯
এম. আবদুর রহমান—'আমি চির দুরন্ত, দুর্দম'। ১৭৬
চিত্তরঞ্জন দেব—মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই। ৩১৮
রাণা বসু—নীরব বিদ্রোহীর দিকে তাকিয়ে। ৩৪৫
সুভাষচন্দ্র চন্দ্র—বেতারে কবি নজরুল। ১৯২
পারমিতা সেন—কবির মর্যাদা। ৩০৪
ইন্দ্রজিৎ রায়—কিশোর-আচার্য নজরুল। ৩৪১
অরিন্দম সেন—প্রথম পাঠ। ১৮০
বিশ্বনাথ দে—ফুলের জলসায়। ৩২০
সরল দে—ফুলের ঘ্রাণ ঝড়ের গর্জন। ২০১

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়—জাতের নামে বজ্জাতি। ২৭৪
রমেন দাস—নজরুলের খেয়ালখুশি। ৩১৩

স্বজন-কথা ঃ

মোহিতলাল মজুমদার—কাজী সাহেবের কবিতা। ৪৫
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—নজরুল-সাহিত্যে নূতন ভাবধারা। ৫৯
সুখলতা রাও—'প্রভাতী' কবি নজরুল। ১১৬
কাজী আবদুল ওদুদ—নজরুল ইসলাম। ১১৩
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—শাক্ত পদাবলীর কবি নজরুল। ৬৩
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—কবি বিপ্লবী নজরুল। ১৭
সৈয়দ মুজতবা আলী—নজরুলের অনুবাদ-চর্চা। ৩০১
সঞ্জয় ভট্টাচার্য—বাংলার শেষ চারণ-কবি। ১৬৩
ফররুখ আহমদ—নজরুল-সাহিত্যের পটভূমিকা। ২১০
নারায়ণ চৌধুরী—নজরুলের গান। ১৩৮
মুহম্মদ এনামুল হক—মহাবিদ্রোহী নজরুল। ২৭৭
রমা চৌধুরী—সাধক-কবি নজরুল। ১৫৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—কাজী নজরুল। ২১২
মুহম্মদ আবদুল হাই—উপন্যাস রচনায় নজরুল। ১৬৬
গুরুদাস ভট্টাচার্য—ভাঙা-গড়ার কবি। ২২৫
সুশীলকুমার গুপ্ত—যৌবনের কবি নজরুল। ৮৯
রামেন্দ্র দেশমুখ্য—নজরুলের কিশোর-মন। ১৯৮
সলিল চৌধুরী—নজরুলের হাসির গান। ২০৭
কাজী অনিরুদ্ধ—নজরুল-গীতি। ১৫৬
আবদুল আজীজ আল-আমান—বিজ্ঞাপন রচয়িতা নজরুল। ২৪০
মিহির সেন—ছোটো-গল্পে নজরুল। ১৮৮
এস. এম. এহিয়া—হাসির রাজা নজরুল। ২৫০
অতীন মজুমদার—মুক্তো-হাসির ঝর্না। ৩৩৬

কল্প-কথা ঃ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যদি নীরব কবির বোধ ফিরে আসে। ৩৩০

★

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন!

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে।

আমাদের দেশে তা নেই।…নজরুলকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করবো। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করেছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন তিনি। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম,…অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো। আমাদের প্রাণ নেই, তাই তামরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়,—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

[১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৯]

বীণার ঝঙ্কারে

বিপিনচন্দ্র পাল

…তাঁহার (কাজী নজরুল ইসলামের) কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এ তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন।

…নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহাব সুর পাই। তাহাতে পালিশ নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।…মানুষে মানুষে একাত্মসাধন এ অতি অল্প লোকেই করিয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি।…হাততালি দিয়া নজরুলকে নষ্ট করিবেন না—তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিন।

সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা তাঁকে সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা নমস্কাব করুন।…

দেখিয়া দুঃখ হয়—শরৎবাবু ও নজরুল ইসলাম ছাড়া গত দশ বৎসরের মধ্যে কোন ভাবুক লেখকের উদয় হয় নাই।…

জাতির প্রাণে লাঙ্গল আসিয়াছে নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তাই পাই।

[১৯২৮]

বাঙালীর কবি নজরুল

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল।

নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।

আজ আমি এই ভেবে আনন্দ লাভ করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমান কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

[১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৯]

২৪শে শ্রাবণ

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

তোমার কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলতে পার। তার পরে ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাই পাগল,

…আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যাঁরা মেকী, তাঁদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক ; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যাঁরা সাচ্চা সোনা তাদের খাদ পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক ; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' বাঙালী মেয়ের মুখে জহরব্রতা রাজপুতানীর সতী স্ত্রী দেবী-গর্ব ফিরিয়ে আনুক ; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' জতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক্, স্থির মণি হয়ে বঙ্গমাতাব স্বর্ণহিংহাসন সাজিয়ে নিক্, ভগ্নধ্যান শিবের চক্ষু বেরিয়ে এসে এ কামুক জাতির কাম দেবতাকে পুড়িয়ে ফেলুক আর কামিনী উমাকে করুক শান্ত-জ্যোতি তাপসী।

ইতি—

বারীন ঘোষ

কাজী ভায়া,

…রুদ্ররূপ ধবে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছ—ভালই হয়েছে। আমি প্রাণ ভবে বলছি—স্বাগত।…

…সৃষ্টি যারা করবার তারা কোরবে ; তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙ্গ, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি এক সঙ্গে 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের খ্যাতিতে বাঙালী সমাজ একেবারে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল। তরুণ সমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভাব—'আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিস।'

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা আরও সরগরম হয়ে ওঠে। আমরা যারা আগে থেকে ছিলাম, তাদের সঙ্গে আরও এসে জুটল খান মঈনুদ্দীন, গোলাম মোস্তাফা, মঈনুদ্দীন হোসেন, তরুণ রেজাউল করিম। তা ছাড়া কত পরিচিত-অপরিচিত যুবক আসছে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

কে যে নজরুলের মাথায় ঢুকিয়ে দিল—পত্রিকা বার করতে হবে। মতলবটা নজরুলের মাথায় চেপে বসতেই তাতে তালিম দিয়ে উঠল আর সবাই।

নজরুল তখন মূর্ত বিদ্রোহ, আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাণী তার কণ্ঠে। গতানুগতিক ব্যবস্থায় যারা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে তাদের অকল্যাণ ঘোষণা করে তাই 'ধূমকেতু'র উদয় হল।

এক পয়সা দামে ফুলস্কেপ চারপাতা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুবে 'ধূমকেতু'। কিন্তু পয়সা কোথায়? সবারই পকেট ঢু-ঢু, তবু মনে সংশয় নেই; স্থির বিশ্বাস, কাগজ বেরুবেই। প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হল কবিগুরুর আশীর্বাণী চেয়ে তার করা।

কয় রীম কাগজ বাকীতে সংগ্রহ করা গেল, মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ 'ধূমকেতু' ছাপার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

কাগজ একপিঠ ছাপা হয়ে গেছে, এমন সময় এল কবিগুরুর আশীর্বাণী। পয়লা পৃষ্ঠায় তা বসিয়ে দেওয়া হল।

নজরুলের অগ্নিঝরা প্রবন্ধ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ওরফে ত্রিশূলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও মনুষ্যধর্মের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করে 'ধূমকেতু' যেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করল, সেদিন সারা শহর উদ্বেল হয়ে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায়ই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী :—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন!

ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে দু'হাজার কাগজ উবে গেল। হকারের দল এসে হাজির হল ছাপাখানায়, বত্রিশ নম্বরে—আরো কাগজ চাই। চার-পাঁচ হাজার ছেপে দিলেও তারা তখনই তা নিয়ে নিতে রাজী।

দে গরুর গা ধুইয়ে! সাপ্তাহিক পত্রিকার দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় না। সংখ্যার পর সংখ্যা বেরিয়ে যেতে লাগল। আফজলের আড্ডা থেকে কর্যালয় বদলি করা হল সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের লেনে। ম্যানেজারির ভার পড়ল তরুণ শ্রীমান শান্তিপদ সিংহের উপর। কবিগুরুর আশীর্বাণীটি প্রতি সংখ্যায় ছাপবার জন্য কবির হাতের লেখা ব্লক করে নেওয়া হল, তার স্থান হল মূল সম্পাদকীয়ের ঠিক উপরে। বিক্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি

কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হস্টেলে, রোয়াকে, বৈঠকখানায়, তারপর দিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে—'ধূমকেতু'। জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি এমন করে ধাক্কা মেরে চলে 'ধূমকেতু' যে, রাজশক্তি প্রমাদ গণে।

'ধূমকেতু'র আড্ডায় সারা দিন লোকের পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ-বা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাঁড়ে করে চা সবার জন্য তৈরী। একদিন এল সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি কিশোর। ফরিদপুর থেকে এসেছে, নাম হুমায়ুন কবীর।

অনেক প্রশ্নের মধ্যে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা মাটির ভাঁড়ে করে চা খান কেন ?'

জবাবে বললাম, 'একটু বসে থাকলে নিজেই এর জবাব পেয়ে যাবে।'

একটু পরেই নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল আধ-ভরতি চায়ের ভাঁড় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল—দে গরুর গা ধুইয়ে! চা ছিটকে পড়ল মেঝেতে মাদুরে বইয়ে-কাগজে—সবার গায়ে। ভাঁড়টা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কবীরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছ এখানে ভাঁড়ে চা খাওয়ার রেওয়াজ কেন ? গরুর গা ধুইয়ে দিতে প্রথম তিন দিনেই দু'ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কাপভাঙা মিঠে আওয়াজ শোনবার জন্য নিত্যি কাপ কেনা হবে, এমন কাপ্তেন আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

একদিন এল একটি অপরিচিত তরুণ, বয়স আঠার কি বিশ। মেঝের এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেওয়ায় বললে, 'চা

খাই না।' আত্মপরিচয়ে যুবকটি জানালে তার নাম গোপীনাথ সাহা। সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে চায়, পথের নির্দেশ ও প্রেরণা লাভের জন্যই সে 'ধূমকেতু'র আখড়ায় এসেছে।

পথ-নির্দেশ বা প্রেরণা লাভের আখড়া এটা নয়, প্রাণের প্রাচুর্যে ঘোষণা করার এবং অন্যায় অত্যাচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেওয়াই 'ধূমকেতু'র ব্রত। আর তার ব্রত ভাঙনের জয়গান গাওয়া।

প্রাণের প্রাচুর্য প্রকাশ ও ভাঙনের জয়গান সেখানে যে হৈ-হুল্লোড় পরিবেশ সৃষ্টি করে গোপীনাথ তার দিকে বিস্মৃত চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। তারপর এক সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আপনাদের মনে এত আনন্দ জাগে কোথা থেকে?'

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! সবাই তাজ্জব ব'নে যায়।

দে গরুর গা ধুইয়ে বলে নজরুল জবাব করে, 'আনন্দ কোত্থেকে জাগে তার উত্তর নেই, কিন্তু নিরানন্দ কেন হবে, তাই শুনতে চাই তোমার কাছে।'

মনে আছে, অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গীতেই গোপীনাথ জবাব করেছিল, 'দেশ পরাধীন, সায়েবদের অত্যাচার-জুলুম দিন দিন বেড়ে উঠছে। সেই জ্বালার মধ্যে আনন্দ জাগে কি করে? প্রত্যেকটি ইংরেজ আমাদের শত্রু। তারা বুক ফুলিয়ে আমাদের চারপাশে বিচরণ করবে, আর আমরা আনন্দে হাসব গাইব!'

'প্রত্যেকটি ইংরেজ নয়', বললে নজরুল, 'সমগ্র ইংরেজ-সমাজ আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্যা। তারই আবাদ করছি আমরা এখানে।'

এ প্রশ্নের কোন জবাব করেনি গোপীনাথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেছে।

কিছুদিন বাদেই সারা শহরে হকচকিয়ে খবর বেরুল, সকাল বেলা চৌরঙ্গীর মোড়ে বাঙালী যুবকের পিস্তলের ঘায়ে খুন হয়েছে ডে সাহেব। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামী। দেশ-শত্রু পুলিশ

কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করার ব্যর্থতায় আফসোস প্রকাশ করেছেন গোপীনাথ সাহা।

দিকে দিকে সন্ত্রাসবাদ বিভীষিকার কালো ছায়া বিস্তার করেছে। অসুরনাশিনী খড়্গধারিণী নৃমুণ্ড মালিনী সংহারকর্ত্রী মহাকালীকে বোধন করে 'ধূমকেতু' সেই সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা যোগাচ্ছে—এই অপরাধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ 'ধূমকেতু'কে দমন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল।

পূজা সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে কবিতা বেরুল :

'আর কতকাল থাকবি বেটী
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।'…

মাস দুই যেতে না যেতেই পুলিশ এসে হানা দিল 'ধূমকেতু' অফিসে, ছাপাখানাকেও রেহাই দিল না। সম্পাদক-মুদ্রাকর-প্রকাশক নজরুল ফেরার হয়ে গেল। শান্তিপদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল পুলিশ, ধাওয়া করল নজরুলের পিছনে। কুমিল্লা থেকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে এল নজরুলকে।

'ধূমকেতু'র মামলায় পুলিশ কোর্টে যে চাঞ্চল্য জাগল তা অবর্ণনীয়। বহু উকিল স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন বিনা পারিশ্রমিকে নজরুল তথা 'ধূমকেতু'র পক্ষ সমর্থনের জন্য। শ্রীযুক্ত মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকিল। সাক্ষী-সাবুদের শেষে নজরুল এক ধূমকেতুমার্কা লিখিত জবানবন্দী দাখিল করল। তাতে বলল :

'সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না…দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তাঁর—যিনি আমার কর্ণে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই।…আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারে বিশ্ব প্রলয়বাহিনীর লাল

সৈনিক। বাঙলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তাঁব আদেশ পালন করেছি।

'বিচারক জানে, আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়। ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেন না, সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।—'

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহো নজরুলকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

নজরুলের জেল হওয়ার পর দু'সপ্তাহ কাগজ বন্ধ থাকে, তারপর বীরেন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পাক্ষিক হিসাবে দুটো সংখ্যা বেরিয়ে 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যায়।

আদালত থেকে যখন ওকে কয়েদী গাড়ীতে তোলা হয় তখন বিমর্ষ বন্ধুবান্ধবদের সান্ত্বনা দিয়ে নজরুল বললে, 'দুঃখ করিসনে ভাই, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়তো এই কারাবাসের আমার দরকার ছিল। বিধাতার অমোঘ বিধান খণ্ডাবে কে! এর পিছনে আমি মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্তই দেখতে পাচ্ছি।'

কারাবাসের প্রথম কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করলে জেলে ওর কাছে বই পৌছে দেবার ভার আমার উপর পড়ল। একটা সাধারণ 'কনভিক্ট'কে 'পোয়েট টেগোর' বই 'ডেডি-কেট' করেছেন, একথা শুনে তাজ্জব ব'নে গেল জেলের সাহেব, ফিরিঙ্গি অফিসার ও পাহারাদার মহল। সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল: 'ঈজ হি রীয়েলী সো গ্রেট এ ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেন্স!'

আলিপুর থেকে নজরুলকে বদলি করা হল হুগলি জেলে। জেল থেকে নজরুলের খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়মিত আমাদের জানাবার

ভার নিল হামিদ আর সিরাজ, তাদের সঙ্গে হুগলির আরো অনেক তরুণ যোগ দিল।

কলকাতায় একদিন খবর পেলাম, জেলের বৈষম্যমূলক আচারণ এবং উৎপীড়ন নিপীড়নের প্রতিবাদে কাজী অনশন শুরু করেছে। খবর পেয়েই আমি চলে গেলাম হুগলিতে। ইতিপূর্বে জেলে একাধিকবার আমি দেখা করেছি কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ সাক্ষাতে বাধা দিল। আশ্বাস দিলাম, দেখা করতে পারলে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করিয়ে দিতে পারব, কিন্তু সে আশ্বাসও কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করলে না।

দিনের পর দিন যায়, খবর আসে নজরুল নাছোড়বান্দা, এসপার-ওসপার লড়ে দেখবে সে। জেল কর্তৃপক্ষ নানা শাস্তিব ব্যবস্থা করল: ডাণ্ডাবেড়ি, হ্যাণ্ডকাপ, নির্জন কুঠুরিতে কয়েদ—কিছুতেই কিছু হল না। তারপর শুরু করল ফর্‌স্‌ড্‌ ফীডিং। সেটা নাকি আরো যন্ত্রণাদায়ক। দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শুধু।

বে-পরোয়া হয়ে নলিনীদাকে সঙ্গে করে আবার গেলাম হুগলিতে। এবারও জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে, কোন আশ্বাস কোন প্রতিশ্রুতিই কানে তুলল না। প্রমাদ গণলাম আমরা। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম জেলের ফটক থেকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ধীরে ধীরে পথ হাঁটছি। জেল প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নলিনীদা বললেন, 'এই একটা পাঁচিল যা ফারাক, হয়তো ওপারের উঠোনেই কাজী ঘোরাফেরা করছে। একবার চোখের দেখা পেলেও কাজ হত।'

আমি বললাম, 'এই মাছি-পেছলানো বিরাট উঁচু পাঁচিল, এর উপরে উঠে যে নজরুলের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করব তাও সম্ভব নয়।'

এক মিনিট চোখ বুজে কি ভাবলেন নলিনীদা, তারপর বললেন, 'পাগলাকে সাঁকো নাড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছো পবিত্র, পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে হয় না কি ?'

'বলেন কি নলিনদা!' আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম, 'তারপর আমাদেরও শ্রীঘর বাস করতে হবে।'

'মন্দ কি, নলিনীদা জবাব করলেন 'আমি আর কাজী যে যার সেল থেকে গলা মিলিয়ে ডুয়েট গাইব, আর তোমার সেল থেকে তুমি দেবে তুড়ি। কাজীর অনশন কোথায় ভেসে যাবে।'

'কিন্তু উঠবেন কি করে? সেটাই তো সমস্যা।'

নলিনীদা প্রস্তাব করলেন, আমি উবু হয়ে বসলে তিনি আমার কাঁধে উঠবেন, তারপর আমি দেয়াল ধরে কোন মতে দাঁড়াতে পারলে তিনি উঠে পড়বেন পাঁচিলে। স্টেশনেব দিকের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু। আমায় বললেন, 'তোমার কাঁধ থেকে যে মুহূর্তে আমি পা তুলে নেবো, তুমি একেবারে চম্পট দেবে। স্টেশনের ভিড়ে মিশে থাকবে।'

যে কথা সে-ই কাজ। কাঁধের বোঝা যে মুহূর্তে হাল্কা হয়ে গেল, সোজা চলে এসে স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। বেশী দূর নয়, কয়েক গজ মাত্র ব্যবধান। পাঁচিলের উপর ঘোড়-সওয়ারের মত দু'পাশে দু'ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে নলিনীদা জেলখানার দিকে তাকিয়ে হাত-মুখ নাড়ছে। একটু পরেই একজন পাহরা-ওয়ালা সেখানে এসে হাজির হল। নলিনীদার মুখ কাচুমাচু। পাহারাওয়ালাই নলিনীদাকে নামালে পাঁচিল থেকে। দেখতে দেখতে বলা নেই কওয়া নেই হু হু করে এক জনতা জমে উঠল সেখানে। পুলিশ নলিনীদার শার্টের কলার ধরে আছে, আর নলিনীদা তাকে সানুনয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ভিড়ের সঙ্গে দেখলাম হামিদ, সিরাজ, মনোতোষ, শৈলেশ—আমাদের সকলেই প্রায় হাজির। তারাও বোঝাবার চেষ্টা করছে। আমিও ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। নলিনীদা বোঝান, 'আমরা সরকারের দুশমন নই—দোস্ত। আমাদেরই এক দোস্ত—বহুৎ বড়া আদমী, সে অনশন করছে। সে যাতে খাওয়া দাওয়া করে, জেলের নিয়ম মেনে চলে, —তাই বলতে এসেছিলাম তাকে।'

সব হৈ-হুল্লার মাঝে কি ভেবে সিপাই বললে, 'জল্‌দি ভাগো, বাবু, নেই ত হামারা নোকরি জায়েগা।'

গা ঝাড়া দিয়ে নলিনীদা বেরিয়ে এলেন। বললাম, 'হল তো!'

'আরে কে জানে ভাই, পাঁচিলের ওপাশে বার হাত লম্বা জল ভরা ডোবা, আর তুমি ত পাঁচিলে তুলে দিয়ে কাঁধ সরিয়ে নিয়ে পালিয়েছো। আমি না পারি এদিকে আসতে, না-পারি ওদিকে যেতে। তবু শেষ পর্যন্ত ছেলের দল এসে পড়েছিল, তাই রক্ষে, তাদের হৈ-হল্লায় ব্যাটা সেপাইকে ভালমানুষী করতে হল!'

'আসল যে কথা, কাজীকে পেলেন?'

'পেলাম, কিন্তু কাজ হল না? অমি যত মুখ হাত দিয়ে খাবার ইসারা করি, ও তত হাত-মুখ নেড়ে অস্বীকার জানায়! খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এ ক'দিনে। কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না!'

আমি বললাম, 'চলুন কলতাতায়, সেখানে গিয়ে শলাপরামর্শ করা যাবে।'

স্থির হল, শিলং-এ কবির কাছে চিঠি লেখা হবে, তিনি কাজীকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু কবি যা লিখলেন তাঁতে আমরা নিজেদের আরো অসহায় বোধ করলাম। তিনি লিখলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে।'

অনেক দিন পরে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় জেনেছিলাম যে, আমাদের ওই চিঠি লেখার পরও তিনি সেন্ট্রাল জেলে কাজীকে তার করেছিলেন—'গিব্ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক আওয়ার লিটারেচার ক্লেম্স্ ইউ।' তার ফিরে গিয়েছিল কবির কাছে—'য়্যাড্রেসী নট ফাউণ্ড' বলে।

কিন্তু কবির কাছ থেকেও যখন আমরা কোন আশ্বাস পেলাম না, তখন সবাই মিলে গিয়ে ধরলাম দেশবন্ধুকে—এর জন্য অবিলম্বে কি করা যেতে পারে। নজরুলের দাবি জেল কর্তৃপক্ষকে মেনে নেবার জন্য দেশবন্ধু জনসভা আহ্বান করলেন।

কিন্তু তার ফল তো সময় সাপেক্ষ, হু হু করে চলে যাচ্ছে দিন।

অনশনে ওর দেহ যাচ্ছে শুকিয়ে, আয়ু যাচ্ছে প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে।

আমরা স্থির করলাম বেসরকারী জেল পরিদর্শক স্যার অবদুল্লা সুরওয়ার্দিকে একবার হুগলি যেতে অনুরোধ করা হবে, যদি তাতে কিছু সুরাহা হয়! তিনি রাজীও হলেন সহজেই, সামান্য একটু দাবি জানালেন শুধু। তাঁর হুগলি যাওয়া আসার জন্য মোটরের ব্যবস্থা করতে হবে।

মোটর কোথায় পাব আমরা, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভাড়াই যাদের জোটে না। ধরপাকড় করে মোটর গাড়ী যোগাড় করা তাও সময় সাপেক্ষ। আমাদের অক্ষমতা সুরওয়ার্দিকে নিবেদন করাতে তিনি জানালেন, এমন অবস্থায় তিনি ট্যাক্সি করেই না হয় যাবেন, অবশ্য ভাড়ার টাকাটা যোগাড় করে দিতে হবে। যার পকেটে যা ছিল ঝেড়েপুছে ত্রিশটি টাকা দেওয়া হল সুরওয়ার্দি সাহেবকে। তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তা হাত পেতে গ্রহণ করলেন।

সুরওয়ার্দিও গেলেন হুগলি, সেই দিনই গোলদীঘিতে জনসভা। সভাপতি দেশবন্ধু: হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি সকলে দাবি জানালেন— নজরুলকে বাঁচানো বাঙলা দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।

সভাও শেষ হল বিরাট জয়ধ্বনি ও চাই চাইর মধ্যে, কিন্তু জনসভার দাবি আইনসভার সিদ্ধান্ত নয়, আর আইনসভার সিদ্ধান্তও লাল ফিতার দৈর্ঘ্য বেয়ে তামিল হতে অনেক সময় লাগে। ওদিকে আবদুল্লা সুরওয়ার্দিও ফিরে এসেছেন ব্যর্থ হয়ে। দারুণ অবসাদ ও অসহায় ভাব নিয়ে বসে আছি বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, এমন সময় বন্ধুবর বীরেন সেন জানালেন যে, নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী তার পাঠিয়েছেন, তিনি ঐদিনই চাটগাঁ মেলে কুমিল্লা থেকে আসছেন। বীরেন তখনই চলেছে স্টেশনে। আমিও তার

সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম এবং পরদিনই সকালে বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে হুগলি যাত্রা করলাম আমি ও বীরেন।

নজরুলের সঙ্গে বিরজাসুন্দরীর দেখা করার দরখাস্ত সহজেই মঞ্জুর হয়ে গেল। আমরা দু'জনে অনুমতি পেলাম না। উনি ভিতরে ঢুকে গেলেন, আমরা বাইরে ঘুর-ঘুর করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে হাসিমুখে ফিরে এলেন তিনি, বললেন, 'খাইয়েছি পাগলকে। কথা কি শোনে! মড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে শরীর, ওই গলা চিঁ চিঁ করছে। কিন্তু কথা কি তবু শোনে! বলে—না, অন্যায় আমি সইব না। শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম, আমি মা, মায়ের আদেশ সব ন্যায়-অন্যায় বোধের উপরে। চুপ করে গেল সে। তারপর বললে—দাও, কি খেতে দেবে। নিজের হাতে করে নেবুর রস খাইয়ে এসেছি।'

দেখতে পেলাম দু'জন জেলরক্ষীর কাঁধে ভর করে নজরুল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। ও এসে দাঁড়াল গরাদের ওপাশে। বললে—'তোদের সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। যা —আর ভাবনা করিস না, লক্ষ্মী ছেলের মত থাকব বাকী ক'টা দিন। আর কবিতা লিখব। বলিস সবাইকে—কাজী এবার থেকে অতিবাধ্য কয়েদী।'

কবি বিপ্লবী নজরুল

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

অশান্ত নজরুলের প্রথম যৌবনে সাধ জেগেছিল পৃথিবীর রণক্ষেত্রকে পরখ করার। কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। বিদ্রোহী বীর বিদ্রোহ করলেন বন্ধু-পরিজনদের নিষেধের বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের বাঙালী পল্টনের সৈনিক হলেন কবি নজরুল। হাতে তাঁর রণতূর্য।

যুদ্ধ-অন্তে ফিরে এলেন গৃহে। গানে-কাব্যে-আবৃত্তিতে দেশময় একটি বিদ্রোহী-আবহ সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখলেন কবি-সৈনিক। কিন্তু তাঁর জন্য চাই প্রচার। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রকাশ করলেন তিনি 'অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু'। শৌর্যের বার্তাবহ সে কাজ তরুণ-চিত্তে অপূর্ব আত্মদানের আহ্বান নতুন করে জাগাল। বাংলার বিপ্লবী-মন বিস্ময়ে 'ধূমকেতু'র প্রতিটি অক্ষরে প্রাণের কথা পাঠ করে উৎসাহিত হল।

'ধূমকেতু' বেশিদিন চলল না। এ-ধারার কাগজ চলতেও পারে না বেশিদিন। কারণ, শাসকের রুদ্রদৃষ্টি এদের বাঁচতে দেয় না। নজরুলের তাতে ক্ষতি নেই। আকাশের ধূমকেতুর মতই বঙ্গগগনে তাঁর হঠাৎ প্রকাশ তীব্র দীপ্তি ছড়িয়ে তরুণ-নয়নে চমক লাগিয়েছিল। বাংলার তরুণ তাঁর কণ্ঠের গান কেড়ে নিল। বাংলার তরুণ তাঁর দেওয়া 'মার্চিং সঙ' বা চলার সঙ্গীতের তালে তালে রুট-মার্চ শুরু করে দিল। বাংলা ভাষায় সামরিক পদ্ধতিতে 'চলার' সঙ্গীত ছিল না। নজরুল দিলেন সে সঙ্গীত। অভিযাত্রীর পদচ্ছন্দে :

> 'চল্ চল্ চল্!
> ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
> নিম্নে উতলা ধরণী-তল
> অরুণ প্রাতের তরুণ দল'—

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদের দুরন্ত আদর্শের উদ্গাতারূপে তাঁকে একান্ত আপন করে লাভ করলেন। নজরুলের যাত্রা শুরু হল বিপ্লবপন্থার পুরোভাগে, বিপ্লববাদের চারণ-কবির ভূমিকায়। কবির উপলব্ধির মূল তাঁরই অনুভূতির গভীরে। বলেছেন তিনি :

'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে।'

আরো বলছেন :

'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।'

তারও পরে বলছেন :

'প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

কত গভীর অনুভূতি, কত ব্যাপক ও নিবিড় বেদনা থেকে যে কবির অন্তরে বিপ্লব-সত্তার জন্ম, তার সন্ধান রয়েছে এসব উক্তির মধ্যে।

নজরুল মহাক্ষত্রিয়। নজরুল সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। অন্যায়ের শাসন-নাশনে তিনি পরমোৎসাহী। নজরুলের 'সত্য' মানবকে কেন্দ্র করে। তাঁর কাছেও—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

তাই তিনি বলছেন :

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুল সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতীয়। তিনি খাঁটি মুসলমান বলেই খাঁটি বিপ্লবধর্মা হতে পারলেন। তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখলেন না। কারণ তাঁর কাছে :

'নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশ সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

তাই কবি সাম্যের গান গাইতে পারলেন। ভগবান তাঁর কাছে

মিথ্যা, যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে খুঁজে বার না করা যায়। কাজেই হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে কায়েমী-স্বার্থের প্ররোচনায় বাঁচিয়ে রাখা এক ষড়যন্ত্র-প্রসূত গ্লানি। বিপ্লবী-কবির কণ্ঠে তাই শুনি :

'খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !'

বলছেন কবি বড় দুঃখে :

'মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি !'

নজরুলের ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে।

মহাবিপ্লবের পুরোহিত নজরুল। বিপুল তাঁর হৃদয়ের পরিসরে বিশ্বের নির্যাতিতদের বেদনার ছায়া পড়েছে। তাই তিনি বিপ্লবীর কম্বুকণ্ঠে সাম্যের গান গাইলেন সবার তরে। ধরার সকল পাপীর উদ্দেশে জানালেন :

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব মোর ভাই।'

বিপ্লবী নজরুল বিশ্বমানবের প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্যাতিত নরনারীর বেদনার গান আকুল কণ্ঠে গেয়ে গেছেন। বিদ্রোহী কবির উদ্বেল সঙ্গীতনির্ঝর সারা বঙ্গের বিপ্লবী-হৃদয়েই অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয়লিখা :

'আমরা সজীব নতুন গজৎ, আমরা গাহিব নতুন গান !'

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দেখি বিপ্লবী বাংলার তথা বিপ্লবী ভারতবর্ষের এক অত্যুগ্র গতি—যা ভয়ঙ্কর যা দুঃসাহসে সুন্দর।···চট্টগ্রাম রাইজিং, রাইটার্স প্রসাদে অলিন্দ যুদ্ধ, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, কলকাতা, দার্জিলিং তথা সারা বাংলায় দুর্জয়ীদের দুঃসহ অভিযান থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রচণ্ড বিপ্লব, বিয়াল্লিশের

রক্ত-ক্ষরা আন্দোলন, ছেচল্লিশের রোমাঞ্চকর নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিপ্লবের কবি নজরুল ইসলামেরও স্বপ্ন-রূপায়ণ। কবি যাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ

'আমি গাই তারই গান—দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরশান,
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে'—

সেই বিপ্লবী তরুণদলেরই বিপুল এ কর্মপ্রবাহ।

নজরুল কবি ও দ্রষ্টা। কবির বাণী এবং দ্রষ্টার উক্তি সে-যুগে সফল হয়েছিল। রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধ শহীদকুল - সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বসু, প্রদ্যোৎ, ভবানী, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা, উধম সিং, যতীন দাস, মাতঙ্গিনী, কনকলতা এবং সর্বোপরি নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া'র সংগ্রামী দল এই চারণ-কবির ছন্দোবদ্ধ গানে এই ভারতভূমিতে এবং বহির্ভারতে মহাভাঙনের তাণ্ডব রচনা করতে পেরেছিলেন। যার আঘাতে প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ-শাসনের বনিয়াদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ভারত রাষ্ট্রীক-স্বাধীনতা লাভ করল।
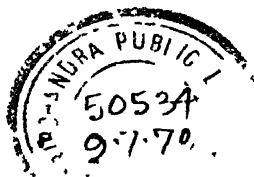
সাংবাদিক নজরুল

মুকুল সর্বাধিকারী

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কবি ও বিদ্রোহী।

কৈশোরের শেষ প্রান্তে তাঁকে ভাগ্যের সাথে লড়াই শুরু করতে হয়। তাঁর পিতা ফকীর আহ্‌মদ নিঃস্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। আর নজরুল বাল্য জীবনে ইস্কুলে না গিয়ে হলেন গার্ড সাহেবের বাড়ীর চাকর, আবার কখনো আসানসোলের রুটীর দোকানের বয়্‌। কখনো বা লেটোর দলে গান বেঁধে দিন কাটিয়েছেন।

নজরুলের বিশ্বাস ছিলো যে, যুদ্ধে যেতে পারলে এবং তলোয়ার ধরতে শিখলে মুক্তিযুদ্ধ করতে শেখা হবে। না'হলে যে পেলো ডবল প্রমোশন, আর যিনি স্কুলের উজ্জ্বলতম ছাত্র, সেই ছেলে অনায়াসে চলে গেল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈনিক হিসাবে। লড়াই শিখতে হবে লড়াই করার জন্য।

চুরুলিয়া গ্রামের ছেলে আরব সমুদ্র তীরে করাচীর তাঁবুর ভিতর সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যই তলোয়ারে শান দিয়েছিলেন। নাম গোত্র-হীন মুরার পুত্রের মতো অখ্যাত নজরুল ভেবেছিলেন অস্ত্রের ব্যবহার আর যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ব করে বাঁচবেন। কারণ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?' কিশোর নজরুল তাই বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানীতে যোগদান করাকে দেশ-প্রেমের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে ধরে নিয়ে নিজেকে যুক্ত করলেন তার সাথে।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের মহড়া শেষ, ও উনপঞ্চাশী বাঙালী পল্টন উনিশের পরই ভাঙল। নজরুল উঠলেন খাস কলকাতায় যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌবন টগ্‌বগ করে। তিনি রাজনীতির চরম ঘটনার সাথে পরিচিত হলেন, সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরলেন নিজের বক্তব্য। সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ শিরোনামা, সম্পাদকীয় প্রমাণ

করলো যে, কাজী নজরুল দাড়ী চাঁচার জন্য তলোয়ার ধরতে যাননি, আর কলম ধরেননি তথাকথিত ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জনের জন্য। তবে রাজরোষের অবশ্যম্ভাবী ফল পেতে দেরী হয়নি। আর যারা টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তারাই মুরুব্বি হলেন। তাঁদের দুজনকে শেষ পর্যন্ত কাগজ ছাড়তে হল। অপরজন হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে খ্যাতনামা ব্যক্তি মুজাফফ্‌র আহ্‌মদ। এঁদের সাথে আর একটি স্মরণীয় নাম—এ, কে, ফজলুল্‌ হক।

শুধু সংবাদপত্রের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাব্যে, পত্রে, গল্পে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বারে বারে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সবল লেখনীতে। ইস্কুলের ছাত্র, পড়েছিলেন বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের কাছে। সে প্রভাব যৌবনব্যাপী হয়।

'ধূমকেতু'তে সেই সময় কবি লিখলেন, 'সর্ব প্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। "স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার—সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।···আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে"···।'

নিশ্চয়ই নিবারণ ঘটকের ছাত্র এবং শিষ্যের রচনা বিপ্লবী দলকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছিল। ধূমকেতুর মাধ্যমে নজরুলের রচনা প্রভাবিত করেছিল বিপুলভাবে সন্ত্রাসবাদী দুইটি দলের সভ্যদের—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরের'। যুগান্তরের সভ্যরা তো মনে করতেন যে, ধূমকেতু তাঁদেরই কাগজ এবং সভ্য না হলেও নজরুল কম বিপ্লবী ন'ন। এই ধূমকেতুকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর কয়েক বছর পরে নজরুল আর একটি সাপ্তাহিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এই কাগজটির নাম 'লাঙল'। লাঙলের পাতায় বেরুলো 'কৃষকের গান', 'কুলি মজুর', 'মানুষ—পাপ',—যার অতি খ্যাত নাম 'সাম্যবাদী'। কী প্রলয়োচ্ছ্বাস এনেছিলো এ কাব্য! তার রেশ এ কয়েকটি দশকেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

৮।১ পানবাগান লেনের বাড়ীতে আসার পরে কাজী নজরুল ইসলামের সামনে একটি নূতন দিগন্ত খুলে গেল,—সুর ও সঙ্গীতের দিগন্ত। আমরা যতটা খবর জানতে পেরেছি, কিছুকাল হতেই সে ছিল গানের পাগল। সেই রকম একটি পরিবেশই সে পেয়েছিল। তাদের বাড়ীর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভিতরে গানের ও নাচের দল ছিল। সেই সকল দলের প্রভাবে সে পড়েছিল। সে নিজে এই রকম দলে যোগও দিয়েছিল। এইভাবে তার সঙ্গীত-চর্চার আরম্ভ। জীবনে কোনো সময়ে সে এই চর্চা ছেড়ে দেয়নি। এম আবদুর রহমান সংগৃহীত তথ্য হতে জানা যায় যে, শিয়ারশোল-রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল ইসলাম তার সঙ্গীতের জ্ঞানকে উন্নততর করার সুযোগ পেয়েছিল। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নজরুলের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতেও নজরুলকে এইজন্য ডেকে নিয়ে যেতেন। এই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হতে সে সঙ্গীত-বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিল।

জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমরা জানতে পারি যে, পল্টনের ব্যারাকেও নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা কোনোদিন থামেনি। সেখানেও ভালো ভালো বাদ্যযন্ত্র পেয়ে সে বাজানোটাও বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিল। সেখানেও সে সাহায্য করার লোক পেয়ে গিয়েছিল। যেমন, জমাদার শম্ভু রায় হুগলী শহরের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে'র নাম করেছেন। তিনি নজরুলকে অরগ্যান

বাজানো শিখিয়েছেন। সৈনিক ব্যারাকে গানের মজলিস আবার বসত নজরুলের ঘরের সামনে। তাতে সৈনিকেরা 'চালাও পানসী বেলঘরিয়া', 'ঘি চপ্‌চপ্‌ কাবলীমটর' ও 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি বুলি উচ্চারণ করে আনন্দে ফেটে পড়তেন।

পল্টন হতে ফিরে আসার পরেও নজরুল তার গানের চর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে যে জনসাধারণের ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপা হতো। আমি নজরুলের ফৌজ হতে ফিরে আসার দু'তিন মাসের ভিতরকার কথা বলছি। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেলো। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কাঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগে ভাগ করে গান রচনা করার কথা তিনি তাকে বলেন। এইভাবে গান রচনা করলে সেই গানের সুরারোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করায় সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা শুরু করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপদেশ সে মেনে চলেছিল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো বিদ্যা নেই।

৮।১ পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৯২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। বিশেষ করে, তার নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল

ইসলাম যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকটে সে ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। যে ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজনীতি মানেই তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে, তার জন্য জেল খেটেছে, তাব সঙ্গে কি করে একটা ব্রিটিশ কোম্পানী যোগস্থাপন করতে পারে?

কিন্তু দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চারদিক হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে, তাদের বেকর্ডে কাজী নজরুল ইসলামের গান নেই কেন? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁর গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁব গান গ্রামোফোন কোম্পানীব বেকর্ডে উঠবে না। এটা কেমন কথা? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, কাজী নজরুল ইসলামকে আরও এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা যোগাড় করতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে, তাঁদের রেকর্ডের দু'টি গান তার লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দুটি কবিতার অংশ বিশেষে সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেননি যে, এই দুটি গানের রচয়িতা কে। জানতে দিলে কোম্পানীব কর্তারা গান দুটি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেরে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার পাওয়া রয়ালটির হিসাব করে দেখা গেল যে, নজরুলের কয়েক শ' টাকা (কত টাকা আমার মনে নেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁরা লোক মারফতে সোজসুজি নজরুলের নিকটে তার পানবাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সে আমন্ত্রিতও হলো যে, তার গান যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এইভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে

স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম সম্পর্ক। আর সেই সঙ্গে খুলে গেল তার চোখের সামনে একটি নূতন দিগন্ত। নজরুল বরাবর গান গেয়েছে। গান সে লিখেও যাচ্ছিল। যতটা মনে করতে পারছি— তার গানের পুস্তক 'বুলবুল' তখন ছাপা হয়েছিল। বই হতে কম হোক, বেশী হোক, টাকা সে পাচ্ছিল, কিন্তু গান হতে সে টাকা পেল এই প্রথম। তার সামনে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল বই কি!

ক্রমশ একান্তভাবে সুরের রাজ্যে নজরুল তো প্রবেশ করছিলই, গ্রামোফোন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে তার প্রেরণা আরও বেড়ে গেল। তখনই তার মনে এসেছিল যে, উস্তাদী গানের বিদ্যাটা সে আরও ঝালিয়ে নেবে। এই সময়েই উস্তাদ জমিরুদ্দীন খানকে তার বাড়ীতে দেখা গেল। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও নজরুল করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নামে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ১লা আশ্বিন (খ্রিঃ ১৬ই কিংবা ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) তারিখে গানের পুস্তক 'বনগীতি' উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছে:

> 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ আমার গানের
> ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে।'

এর সঙ্গে সে যে কবিতাটি লিখেছে তার শেষ দু'ছত্রও আমি এখানে তুলে দিলাম:

> 'সুর শা' জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি
> মোর 'বনগীতি' নজরানা দিয়া দস্ত্ চুমি।'

'মোবারক' আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ। 'দস্ত' পারসী ভাষার কথা মানে হাত। নজরুল যখন ১৯২৯ সালের শুরুতে উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের নিকট হতে গানের শিক্ষা নিচ্ছিল তখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে সঙ্গীতের 'ট্রেনার'ও ছিলেন।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ধরা পড়ে আমি যখন আবার জেলে গেলাম তখন দেখে গেলাম যে, কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্পূর্ণরূপে সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নজরুল ইসলাম এক সঙ্গে গায়ক, সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই। নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, নজরুল ইসলাম রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা তিন হাজার। ১৯৬৪ সালে একজন বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হতে শুনে এসে আমায় বলেছিলেন যে, নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজার নয়, চার হাজার। আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল নিজেও একদিন তার গানের সংখ্যা আমায় তিন হাজার বলেছিল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯৩৭ সালের শুরুতে নজরুল আর আমি তার বাড়ীতে একদিন এক সঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বহু বৎসর কলকাতা হতে আমায় অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল বলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। যেই জন্য খেতে বসে আমি নজরুলকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার লেখা গানের সংখ্যা কত, এক হাজার দেড় হাজার হবে?' নজরুল উত্তরে বলেছিল, 'প্রায় তিন হাজার।' শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বলছ কি তুমি? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী?' সে জওয়াব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ'। আমি কোথাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলাম যে, তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আড়াই হাজার। যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তবে এই সময়ে নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের 'ট্রেনার ও হেড্ কম্পজার' ছিল। উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের মৃত্যু হওয়ার পরে সে-ই এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

নজরুল

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, 'তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা কইতে।'

নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকালবেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁকে [illegible] বলে কবি বিন্দু-মাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না।...

নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছেন সব সময়, তাই ধর্ম-নির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাধেনি।

কতদিন আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছি আমরা একসঙ্গে, গোঁড়া বামুনের ঘরের বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন—নিজের হাতে বাসন মেজে ঘর তুলেছেন, বলেছেন, 'ও ত আমারই ছেলে--ছেলে বড় না আচার বড়?'

এই যে নজরুল আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের প্রাবল্যে, হৃদয়ের মাধুর্যে—এই তো মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম, বড় আদর্শের কথা।

একটি স্মরণীয় দিন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মন সেদিন একটি বিশেষ কারণে খুব স্বাভাবিক ছিল না। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর—ঠিক পূজার পরেই। সেদিন বেলা বারটা-একটার সময়ে আমার একটি শিশু সন্তান মারা গেল। কয়েক মাসের সন্তান। বেলা দুটো নাগাদ তার সৎকারের ব্যবস্থা করে শবটিকে শ্মশানে পাঠানো হল। বেলা তখন চারটে, একটি টেলিগ্রাম পেলাম —'আমি এবং নজরুল আজ তোমার ওখানে পৌঁছুচ্ছি। নলিনী।'

বলা প্রয়োজন, আমার সঙ্গে কাজীসাহেবের পরিচয় ছিল নাম-মাত্র। বোধকরি ১৯৩৩।৩৪ সালে তাঁর সঙ্গে আমদপুর রেলস্টেশনে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের ও অঞ্চলের একটি বর্ধিষ্ণু এবং উঁচু সরকারী চাকুরে মিঞা সাহেবের সঙ্গে তাঁদের বাড়ী যাচ্ছিলেন। কয়েকটি মাত্র কথা হয়েছিল। ১৯৩৩।৩৪-এ আমি আমার পরিচয় গড়ে তুলতে পারিনি।· নলিনীদার সঙ্গে পরে পরিচয় হয়েছে শনিবারের চিঠির আপিসে। সেই হেতু টেলিগ্রাম তিনিই করেছিলেন। ওঁদের ওখানে যাবার বিশেষ একটি প্রয়োজন ছিল। কাজী সাহেবের স্ত্রী বাতে পঙ্গু ছিলেন। বহু স্থানে বহু চিকিৎসা করিয়ে কিছু হয়নি। তখন দৈব ওষুধের সন্ধানে 'বেলে'র কথা মনে পড়ে। বেলে গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন। বেলের ধর্মঠাকুরের স্থানের মাটি এবং এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও তেলের খ্যাতি বাতের ওষুধ হিসেবে বহুকাল থেকে বাংলা দেশে ছড়িয়ে আছে। দূর চট্টগ্রাম থেকেও লোক আসতে দেখেছি আমি। পাটনার একজন I. M. S. ডাক্তারকেও এই মাটি-তেল ব্যবহার করতে দেখেছি। আমিই পাঠিয়েছি। কাজীসাহেব বর্ধমানের লোক। তাঁর নিশ্চয় জানা ছিল।

যাক, টেলিগ্রামখানি পেয়ে আমি বিব্রত হলাম। কারণ মেয়েরা

এই সময় এই আসা কেমন ভাবে নেবেন ঠিক বুঝলাম না। তবুও এসে কথাটা বললাম। এবং ওদের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থাদি করলাম।

ওঁরা এলেন। লাভপুরে নামলেন রাত্রি ন'টায়। সেদিন বারে শনিবার ছিল। কারণ রবিবার হল ধর্মঠাকুরের বিশেষ-বার।

ওঁরা নেমেই আমাকে আমার ছেলে কেমন আছে প্রশ্ন করলেন। ছেলেটির অসুখের সংবাদ নলিনীদা জানতেন। কারণ সজনী (সজনীকান্ত দাস) তাঁকে কথাটা বলেছিল। যাই হোক, কথাটা শুনে কাজীসাহেব বললেন, আমাদের ডাকবাংলোয় একটু ব্যবস্থা করে দাও। কিম্বা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। আমার আগ্রহে ও অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমার ওখানেই এলেন। রাত্রে থাকলেন। সকালে ট্যাক্সি করে বেলে গিয়ে দুপুরে ফিরে এসে আহারাদির পর বললেন, রাত্রে আসর পাতো। গান গাইব।

বিকেলে আমাদের ওখানে ফুল্লরা মহাপীঠে গিয়ে দেবীর মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে পদ্মাসন হয়ে বসে কাজীসাহেব প্রাণায়াম যোগে জপ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে মনে হল মানুষটা নিস্পন্দ বা সমাধিস্থ হয়ে গেছে। কুম্ভকে এতক্ষণ অবস্থান খুব বড় যোগী ভিন্ন সম্ভবপর নয়। সমস্ত শরীরে ঘামের বন্যা বয়ে গেল। যখন জপ সেরে উঠলেন তখন চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। এবং তখনও ঠিক জাগ্রত চেতনায় যেন ফেরেন নি। সেই অবস্থাতেই একখানি গান রচনা করে সুর দিয়ে গেয়ে দেবতাকে এবং সমবেত লোকেদের শুনিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

তারপর সন্ধ্যা থেকে গানের আসর বসল। রাত্রি দুটো পর্যন্ত। একনাগাড়ে গেয়ে গেলেন। মধ্যে একবার আধঘণ্টার জন্য নলিনীদা দুই বা তিনখানি হাসির গান গেয়েছিলেন। লোকে লোকারণ্যের সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় মুসলমানেরা এসেছিলেন দলে-দলে। তাঁরা ইসলামী সঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন। রাত্রির মধ্যখানে গেয়েছিলেন শ্যামাসঙ্গীত। সে সময় আশ্চর্য ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি

করেছিলেন। এবং তাঁর মধ্যে কবি ও ভক্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের সাধক বা মহাজনকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আমাদের হৃদয়ের সন্তান-বিয়োগ-বেদনার নিঃশেষে উপশম হ্‌য়েছিল এমন কথা বলব না, তবে তার উপর যে তিনি আনন্দ শ্বেতচন্দনের একটি স্নিগ্ধ-শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন এ শতবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলব।

আমার কাছে ঘটনাটা স্মরণীয় হয়ে আছে দুটো কারণে। এক এবং প্রথম—আমার সন্তান-বিয়োগের ঘণ্টা কয়েক পরেই এই বরণীয় অতিথিকে সংবর্ধনা করা। দ্বিতীয়—কাজীসাহেবের মত ব্যক্তির আগমন।

উদার নজরুল

মন্মথ রায়

দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায়, যে একজন আর একজনকে টেনে তুলছে ওপরে। এবং সে টেনে তোলা আরও মহত্তর হয়, যখন যিনি টেনে তুলছেন, তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে সমাসীন—যাকে টেনে তুলছেন, সে রয়েছে অখ্যাত, অবহেলিত। এমনি একটি কাহিনী দিয়েই আজ আমি নজরুল ইসলামের স্মৃতি-চারণ করছি।

১৯২১ সাল। দেশে তখন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনে ভাসিয়ে দিলাম আমার আসন্ন বি. এ. পরীক্ষা। স্কটিশ হস্টেল ছেড়ে দিয়ে, বাসা বাঁধলাম নন্দকুমার চৌধুরী লেনের একটি মেসে। সারাদিন অসহযোগ আন্দোলনেব কাজ করি, সময় পেলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রাজনীতি আর সাহিত্য করি। এই মেসেই তখন থাকতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সব নামকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয়, আর সেটা যেন আমাদেরই একটি গর্ব।

'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। একদিন তার কথা উঠতেই পবিত্র বললেন, 'ও, কাজীটার কথা বলছিস? তা ওটাকে আনবো একদিন।'

আমি তো হাঁ! বড় বেশী কথা বলতেন পবিত্র। কিন্তু সত্যি সত্যিই তিনি অবাক করে দিলেন কবি কাজী নজরুলকে একদিন আমাদের মেসে এনে। একটা শিহরণ খেলে গেলো আমার মনে। এই সেই কাজী নজরুল? আর পবিত্র তাঁর এতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু? পূজারীর মনোভাব নিয়ে সেদিন তাঁদের সামনে অর্ঘ্য রেখেছিলাম চায়ের বাটি, জলখাবারের থালা।

আমি তখন 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক লিখে নিজেই রোমাঞ্চিত। খুব ভয়ে ভয়ে কথাটা পেড়ে,

পাণ্ডুলিপি থেকে কবিকে তার দু'এক পাতা পড়ে শোনাবার একটা দুর্দম আকাঙ্খায় ভুগছি। শুরুও করেছিলাম, কিন্তু তেমন একটা সাড়া পেলাম না। আর একদল অনুরাগী এসে কবিকে বগলদাবা করে তুলে নিয়ে গেলেন আমাদের আসর থেকে।

১৯২৩ সাল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. আর 'ল' পড়ি। তখনই লিখি আমার প্রথম একাঙ্ক নাটক—'মুক্তির ডাক'। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এলো। কলকাতার ষ্টার থিয়েটার ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই নাটকটি এখনকার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক-একাঙ্ক-নাটক-রূপে নাটকটি ঐতিহাসিক মর্যাদা পেলো বটে, কিন্তু তদানীন্তন চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটকের যুগে এই সল্প-দৈর্ঘ্য দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকটি মোটেই জনপ্রিয় হলো না। তবু সৌভাগ্যই বলবো, কারণ তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক 'বীরবল' নামে খ্যাত স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী স্বতপ্রণোদিত হয়ে আমাকে লিখলেন, 'আপনি শুনে খুশি হবেন যে, 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, এখানি যথার্থ ই Drama।'

কিন্তু তখনও আমি অখ্যাতই বলতে হবে। কারণ, ষ্টার থিয়েটাব তাঁদের প্রচার পত্রে নাট্যকাররূপে আমার নাম ঘোষণা করেন নি, 'মুক্তির ডাক' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো, তখনই আমার নামটা প্রকাশ পেলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় জগন্নাথ হলেম সাহিত্য মুখপত্র 'বাসন্তিকা'য় আমি 'সেমিরেমিস' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, কল্লোল, বিচিত্রা প্রভৃতি সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় আমার কিছু একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হলো বটে কিন্তু তখনও খ্যাতিমান হইনি আমি।

এম. এ. এবং 'ল' পাশ করে আমি চলে এলাম আমার তদানীন্তন বাসভূমি বালুরঘাট মহকুমা শহরে। শুরু করলাম ওকালতি।

সাহিত্যের হাটে হারিয়েই গেলাম বলা চলে। হঠাৎ সেখানে পেলাম অযাচিত একখানি চিঠি। বিস্ময়ে হলাম অভিভূত। বহু কষ্টে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠিটি লিখেছেন কবি নজরুল ইসলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসুক তিনি, কলকাতায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেন না ভুলি। সঙ্গে সঙ্গে দিলাম উত্তর। লিখলাম, 'ঐ লগ্নটির অপেক্ষায় আমিও রইলাম।' সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁর আর একখানি চিঠি। এই চিঠিটির তারিখ ৪. ৭. ২৭।

লিখলেন তিনি—

নওরোজ
সচিত্র মাসিক পত্র

কার্যালয়
৪৫বি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪-৭-২৭

জয়যুক্তেষু—

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতো না বিস্মিত করেছে তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশী।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি যে, আমার প্রশংসা আপনার ললাটের প্রদীপ্ত প্রতিভা-শিখাকে উজ্জ্বলতর করবে—বা সোজা কথায় আমার প্রশংসায় আপনার মতো অসীম শক্তিশালী দুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু 'এসে যায়'।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশী। দেখ্‌লে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি—শুনলে তাকে পথান্তরে চিনতেও বেগ পেতে হয়। কাজেই নন্দকুমার চৌধুরী লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দন-কাননের রাজপথে দেখেও চিন্‌তে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম—তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি—পূজারী করে তুলেছে। এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি

পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বল্‌লে আপনি কী মনে করবেন জানি না তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে আপনার 'লোমহর্ষণ' নাটকটা শুনেছিলাম কিনা মনে নেই, যখন মনে নেই—তখন ওটাতে হয়ত 'লোমহর্ষণই' হয়েছিল 'প্রাণ হর্ষণ' হয়নি ; হলে নিশ্চয় মনে থাক্‌তো। তার জন্য দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখ্‌ছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—মুক্তির ডাক। পড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখ্‌তে বলেছিলেন। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করাব শক্তি আমার নেই।

আপনার 'মুক্তির ডাক'-এর পর আমি 'অজগব মণি' ও 'কাজল লেখা' পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি, যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালী যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধহয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমাব তিনখানা 'বাসন্তিকা' দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি 'সেমিরেমিস', 'ইলা' ও 'স্মৃতির ছায়া কি'ছাপ' পড়ি। 'সেমিরেমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি—তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হ'য়ে উঠতো। এ ঈর্ষা এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও—দুঃখিত যতই হই।

ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি!—তুঃসাহসের দিক থেকে বল্‌ছিনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বল্‌ছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এতো বিচলিত করেনি।···আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায় আপনার শেষ চিঠিতে কিন্তু তার সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে তুর্ভাগ্য মনে করছি।

আমার ভয় হয়, উকিল মন্মথ সেমিরেমিসের মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে। 'ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।···

আমি ইঙ্গিত দিতে কী পারবো আপনার মতো শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয় 'তাজমহল' সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা সত্যিকার—তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেমিরেমিসের স্রষ্টাকে এ লিখ্‌তে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মতো জান্‌লে খুশি হব।

'নওরোজ' বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—তবে তিনি 'নাজিরুল', নজরুল নন,—আকার ইকারের দণ্ড ধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভালো লেখা পড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন। সত্যিই অনেক বক্‌লাম—আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেলো। তবে বকাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হলো—তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

'নবনাটিকা' দর্শনাকাঙ্ক্ষী
নজরুল ইস্‌লাম

P. S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা কর্‌তে আসার জন্য। দেরী করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

এই যে সাহিত্যিক উদারতা—একজন অজ্ঞাত অখ্যাত লেখকের

রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহিত্য সমাজে এমন করে বরণ করে নেওয়া, নিজের প্রাণামৃতে এমন করে অভিষিক্ত করা—সাহিত্যের শিখরদেশ থেকে চলমান পৃথিবীর এক অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীকে বুকে টেনে তোলা—এই ঔদার্য,—এই মহিমা, বিশেষ করে সাহিত্য-সমাজে এতই বিরল যে আমি চিরদিন অবাক হয়েছি, আজও অবাক হই।

শুধু তাই নয়, এরপর ওই ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন মনোমোহন থিয়েটারে আমার পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হয়, তখন তা দেখে সঙ্গীত রচনায় অক্ষম এই নাট্যকারের হাত দু'খানি ধরে তদানীন্তন জনপ্রিয়তম ঐ কবি নজরুল একদিন আমায় বললেন, 'আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়ে গান না লিখিয়ে নিলে আমার অভিমান হবে'।

এই আন্তরিক স্নেহেই তিনি আমার 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়েছিলেন। আমার 'কারাগার'এর জন্য শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরমোল্লাসে তাতে স্বয়ং সুর যোজনাও করেছেন। আবার 'সতী' ও 'সাবিত্রী' নাটকের গীত-সম্ভারও তাঁরই মহাদান।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে নজরুলের অমৃত-নির্ঝর অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে কবির আরোগ্যের জন্য দেশবাসীর সকল কামনা, সকল প্রার্থনা, সকল প্রয়াস ব্যর্থ হলো। তাঁর কোনো ঋণই শোধ করবার কোনো সুযোগ পেলাম না। অক্ষম আমি। তবু ঋণ শোধের একটি ক্ষীণ চেষ্টা আমি না করে পারলাম না। বাংলার এই কবি দুলালের মহিমময় পুণ্য জীবনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারই হলো আমার জীবনের মহাব্রত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজকরূপে আমার রচিত ও পরিচালিত তথ্যচিত্র 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' কবির উদ্দেশ্যে আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের সেই শ্রদ্ধার্ঘ।

দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে ঊর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের একান্ত আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হলো। অনেকগুলি গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিলো।

নজরুল তক্ষুনি বসলেন গান লিখতে। তাদের 'জাগো পিয়া' গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হচ্ছে।

এই গানের সুর অবলম্বন করে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—'নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরাণ পিয়া' গানটি।

তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্য কয়েকজন উগ্রপন্থী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। নজরুল এ জন্য কয়েকজন চরমপন্থী রাজনীতিকের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন।

* * *

স্বার্থ বিমুখ নজরুল কোনদিনই পরার্থপরতায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মাত্র একটি ঘটনার কথা বলি।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি দুঃস্থা কন্যার বিবাহ। কোনরূপে দায় নির্বাহ করবার আয়োজন চলেছে।

কন্যাপক্ষ নজরুলের পরিচিত।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নজরুল তাঁর গাড়ী নিয়ে আমার কাছে

উপস্থিত। এসে বললেন, 'তোমার এখন কোনো কাজ আছে ? একটু এসো না আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছো ?'

নজরুল প্রথমে কিছুই ভাঙলেন না।

গাড়ী সটান চৌরঙ্গী অভিমুখে চলে থামলো 'বেঙ্গল-স্টোরস'এর সামনে। 'বেঙ্গল-স্টোরস'এ নেমে তখন তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করলেন আমার কাছে।

হিন্দু-বিবাহের লৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ পরিচয় ছিলো না, সেইজন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা।

'বেঙ্গল-স্টোরস' থেকে নজরুল ফুলশয্যার তত্ত্বের বহু জিনিস কিনলেন। গাড়ী বোঝাই সেই-সকল সামগ্রী কন্যার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

তাকে [নজরুলকে] 'বিজলী'তে একটি কবিতা বা প্রবন্ধ লেখার জন্য বলি। সে একটি কবিতা লিখে দু-চারদিনের মধ্যে আনবে বলে। তিন-চারদিন পরে টুকরো-টুকরো এক গোছা কাগজে নম্বর দিয়ে, পেন্সিলে লেখা একটা কবিতা নিয়ে এসে বললে, 'অবিদা, শোনো।'

অঙ্গভঙ্গি করে সে কবিতাটি পড়লো।

'ও রকম টুকরো কাগজে লেখা হারিয়ে যেতে পারে, পেন্সিলে লেখা নষ্টও হয়ে যেতে পারে, তুমি বলে যাও, আমি কালি দিয়ে ভালো করে লিখে নিই।'

খুশি হয়ে কাজী বললে, 'সেই ভালো, তুমি লিখে নাও, অবিদা।'

লেখা শেষ হয়ে গেলে নামকরণ করা হলো, 'বিদ্রোহী'।

আমাদের প্রেসের প্রিন্টারকে ডেকে, কাগজগুলি তার হাতে দিয়ে বললুম, 'কালকের বিজলীতে এই কবিতাটি বার করতে হবে, যত সত্বর সম্ভব এর একটা প্রুফ পাঠিয়ে দিন।'

আমার কাণ্ড দেখে কবি হো হো করে হেসে উঠেছে—'না অবিদা, ওটা মুসলিম মাসিকের জন্য লিখেছি, আসছে সপ্তাহে বিজলীর জন্য আর একটা লিখে দেবো।'

'সে হবে না, তুমি আর একটা তাঁদের লিখে দিও।'

'আজ-কালের মধ্যে তাঁদের দেবো কথা দিয়েছি যে। আমার প্রথম কবিতা তাঁরা চেয়েছিলেন!'

'আচ্ছা, সে মাসিক বের হবে কবে?'

'এখনও দিন-পনেরো দেরী আছে।'

'আচ্ছা, আমি এর সমাধান করে দিচ্ছি। একটা পাদটীকায়

কিংবা মস্তিষ্কটীকায় লিখে দিচ্ছি—এই কবিতাটি মাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত, যদিও ঐ পত্রিকাটি আরও পনেরো দিন পরে বাহির হইবে। কবির অনুমতি লইয়া বিজলীতে অগ্রিম প্রকাশিত হইল।'

'তোমার হাতে যখন পড়েছি অগত্যা তাই হোক।'

পরের দিন সকালে এসে কবি চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেলো, বললে, 'গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ, ফিরে এসে বোলো, তিনি দেখে কি বললেন।'

বিকেল এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলে নজরুল।

তাঁর বাড়ীতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচাতে থাকে। উপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন, কী হয়েছে?'

'আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।'

'হত্যা করবো, হত্যা করবো কি? এসে, ওপরে এসো বসো!'

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন।'

কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে, 'বিজলী' হাতে নিয়ে উচ্চৈস্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো!

তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ কাজী, তুমি আমায় সত্যই হত্যা কববে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কবিতায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।'

আমার কাছে কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক বড়ো। একই দেশে আমাদের বাড়ী, একই জল-হাওয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু। তাকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম, অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা যখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তখন আমরা কেউ সাহিত্যের ধারও ধারতাম না।

আমি সেই নজরুলকে চিনি যে-নজরুল ইকড়া গ্রামের বাবুদের বাড়ী বাসন্তীপূজোর সময় ভাঙা প্রাচীরের উপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে-নজরুল 'লেটো'র দলে বসে ঢোলক্ বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়ছে।

যেখানে সাধু-সন্ন্যাসী নাঙ্গা ফকির—সেইখানেই নজরুল! শুনেছে সিয়ারশোলের শিশু-বাগানের কাছে একটা গাছের তলায় একদল ফকির বসে আছে। আমাকে ডাকতে এলো।—চল দেখে আসি!

গিয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই।

ওদিকে তখন পশ্চিম-আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠলো। দু'জনে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছি। ওদিকটা ছিল তখন জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কাঁকর পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া ছড়ে গেলো, খানিকটা রক্তও পড়লো। নজরুল তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরলো জায়গাটা। তার কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলো। বললাম, 'এ কি করলে?'

'—ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাবে।'

সেদিক দিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আমাকে তক্ষুনি সুস্থ করে তুলতে চায়। বললে, 'হাঁটতে পারবে?'

'—নিশ্চয় পারবো, চলো।'

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়োতে হচ্ছে না।

নজরুল বললে, 'আমি একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একবার—এই দেখো, সাইকেল চড়া অভ্যেস করতে গিয়ে সাইকেলের চেনে কেটে গিয়েছিলো অনেকখানি।'

এ-সব কথার অবতারণা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া! তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি।

রাণীগঞ্জে তখন ওষুধের দোকান বলে কিছু ছিলো না। ডাক্তারের কাছেই ওষুধ পাওয়া যেতো। সাধনের দাদা সবে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। রাস্তার ধারেই সাধনের বাড়ী। নজরুল দাঁড়োলো সেইখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি হবে?'

সামনের ঘরেই বসেছিলো সাধনের দাদা। সে তখন আমাদের দেখতে পেয়েছে।—'এই যে মাণিকজোড়! বাঃ, বেশ মানিয়েছে ছুটিকে। একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। আর-একটি কোথায়? সেই ক্রিশ্চেন ছেলেটি? শৈলেন!'

নজরুলকে কথা বলার অবসরই দিচ্ছে না। ডাক্তার ভেবেছিলো আমরা সাধনকে খুঁজছি। বললে, 'সাধন বাজারে গেছে।'

নজরুল বললে, 'একটু টিন্‌চার আইডিন দেবে?'

'—কি হবে?'

নজরুল আমার পা'টা দেখিয়ে দিলে।

ডাক্তার রসিকতা আরম্ভ করলে—'গাছে উঠেছিলে বুঝি? তা বেশ হয়েছে। হাত পা ভেঙে গেলেই ভালো হতো। টিন্‌চার আইডিন লাগাতে হবে না। রাস্তার ধুলো খানিকটা ঘষে ঘষে ওখানে লাগিয়ে দাও—ভালো হয়ে যাবে।'

আমি তখন নজরুলের হাত ধরে টানছি।

ডাক্তার বললে, 'না ভাই টিন্‌চার আইডিন নেই আমার কাছে।

এই তো সবে ডাক্তারী পাশ করলাম। ডাক্তার হয়ে বসি, তখন ওষুধপত্র সবই পাবে।'

নজরুলকে রাস্তায় টেনে এনে বললাম, 'টিনচার আইডিন আছে আমাদের বাড়ীতে।'

নজরুল বললে, 'গিয়েই লাগিয়ে নাওগে। আর-একটা খুব ভালো ওষুধ আমি জানি। কাল দেবো।'

'—তাই দিও। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেরি হলে বকাবকি করবে। আমি পালাই।'

দু'জনে খুব কাছাকাছি থাকি। নজরুল গেল তার সিয়ারশোল স্কুলের মোহমেডান বোর্ডিংএ। খড়ে-ছাওড়া মাটির একখানি ছোটো ঘর। পাঁচজন মুসলমান ছাত্রের খাবার-থাকবার জায়গা। আর আমি গেলাম আমার আস্তানায়। রায়-সাহেবের প্রকাণ্ড লাল-কুঠির নীচের তলার একখানা ঘরে।

পায়ে টিন্চার আইডিন লাগালে ভালো হতো। কিন্তু দোতলায় বাড়ীর গিন্নির কাছে গিয়ে চাইতে হবে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েও নেমে এলাম। এই মেয়েটির ভয়ে আমাকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এইটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। টিন্চার আইডিন কেন চাইছি বলতে হবে। হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটা দেখাতে হবে। আছাড় খেয়েছি বললে সে বিশ্বাস করবে না। বিশ্রী একটা অপবাদ রটিয়ে সারা বাড়ীতে একটা হৈ চৈ না বাধিয়ে ছাড়বে না। যার একটা বন্ধু মুসলমান আর একটা ক্রিশ্চান, সে কখনও ভালো ছেলে হতে পারে না।

তার চেয়ে কাজ নেই টিন্চার আইডিন লাগিয়ে।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসলাম।

খানিক পরেই দেখি নজরুল এসে দাঁড়ালো। তার দু'হাত ভর্তি অনেকগুলো নিমের পাতা। বললে, 'এইগুলো বেশ করে বেঁটে ওইখানে লাগিয়ে নাও। ব্যথা-বেদনা কিছু থাকবে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে নিমপাতা কোথায় পেলে ?'

'—নিমগাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে গেল। শেষে মনে পড়লো ক্রিশ্চানদের কবরখানার মুখে সেই বড় নিমগাছটার কথা।'

দিনের বেলাও সে নির্জন জায়গাটার কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না, ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে।

বললাম, 'এই অন্ধকারে তুমি এই গাছটায় উঠতে গেলে কেন ? গাছটায় ভূত আছে।'

নজরুল বললে, 'তোমার মুণ্ডু আছে।'

এই বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেলো। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলো আমি আইডিন লাগিয়েছি কি না।

ভালই হলো, আমি বেঁচে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না।

আবার না ফিরে আসে, তাই দোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এলো না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে।

এই নজরুল !

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ। মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না।—এই যা দুঃখ। আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন করে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি চুল আমি সখ করে রেখেছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটাবার পয়সা পাই না, এমন কি আঁচড়াবার একটা চিরুণী পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে, 'তোমার অমনি চুল কেমন করে হলো তাই বলো।'

আমরা তখন পনেরো,-ষোলো বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে

নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই। আর-কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। বলে, 'ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে, 'ওই জন্যেই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না।'

নজরুলকে বলে, 'তুমি গদ্য লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি বলে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল লিখছে কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদ্য পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগন্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি বলে নজরুলের আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবাই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখনও ভালো রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্রাণখুলে কথা বলে আর হো হো করে হাসে।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্ এতদিন পরে আমার কথাটা আমি withdraw করে নিলাম। তবে withdraw করবার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখা ছুটো তোমরা পাল্‌টা-পাল্‌টি করে নিতে । তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা দুজনেই মরতে।'

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায় ? সবাই হৈ হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে—গান গাও, কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিলো তার কপিরাইট বেচার জন্যে বসে আছে। তাও তো আফজল্ বল্‌ছে একশো টাকার বেশি দেবে না।'

এই কথাগুলো কেউ শোনে নজরুল তা পছন্দ করে না। হে হে করে হাসে আর অর্গ্যানের সুর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে।—'হে হে করে হাসছে দেখো। যারা দু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না?'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো!'

'—তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে।'

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবেই হয়েছে। টাকার কথা ও কখ্‌খনো কাউকে বলতে পারবে না। মাথার চুলের দুঃখু ছিলো ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, ব্যাস, ওইতেই খুশি।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশি। বললে, 'শৈলজার মতো হয়েছে

আমি বললাম, 'আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি।—'না না, কাটবে না।'

শৈলেন বলেছিলো, 'তা না হয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা করে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরী করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা কোরো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন করে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।'

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো হো করে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না হবো না হবো না তাপস, যদি না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হবো কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাবো?'

শৈলেন বলতো, 'বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনো সম্পদ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম!'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে; তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকৃসিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল বলে উঠলো,—'কেন, হোটেলে খাবে কেন?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!'

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, 'ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

'—তাই বুঝি, তাকে খাইয়ে বিদায় করলে?'

নজরুল বললে, 'না না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, 'তাকেও তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিলো না যে! টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

'—সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?'

নজরুল বললে, 'হুঁ। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনী ছোক্‌রাটি দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি দেবে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালে আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোক্‌রাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, 'টাকা আছে আমার কাছে।'

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।—'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না!'

ছোক্‌রাটি বললে, 'হোটেলে আমাকে খেতে হতো না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।'

নজরুল ধমক দিলে।—'ধেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারার খুব খিদে পেয়েছিলো। খেয়েছে বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতুয়ার উপর বাসন্তী রঙের চাদরটি

গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিলো নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বলালাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাবো পূবে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো! মোটরকার।'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই। যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারো।

গাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল—এই মোটরে চড়ার শখটা তার গেলো না কিছুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহন্নমে নিয়ে যায় তো ও তক্ষুনি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেনদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো। আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে ছিলো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আমি আদায় করবো।'

তার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে অর্গ্যানের সামনে। বললে, 'তুমি তো খৃষ্টান ছিলে, হিঁদু হলে কবে?'

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার জন্যে।'

'—তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'দু'পেয়ালা কেন?'

নজরুল বললে, 'লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।'

শৈলেন বলেছিলো, 'লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না, কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নিঘ্‌ঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য, শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ। সারাজীবনে সে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জনে হতে পারে ?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায় ?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

একদিকে জীবন-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমাণ যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, এমন অজাতশত্রু, হৃদয়বান এবং আনন্দময় পুরুষ এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিলো, 'তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম্ বোম্ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটা মনে পড়ছে। বলেছিলো সমুদ্র মন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে তুমি নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো চুপ করে বসে আছে।

তখন আমি আই. এ. ক্লাসের ছাত্র, ঢাকা কলেজে পড়ি। সাহিত্যের নেশায় পাঠ্যপুস্তকের চাইতেও অপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নেই মনোযোগটা বেশী। 'আল-এসলাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও আরও দু'একটি পত্রিকায় দু'একটা প্রবন্ধ তখন আমার বেরিয়েছে। মোট কথা, সাহিত্যিক হবার মক্‌শ প্রাণপণেই চলেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন এক পত্রিকায় একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়লো। লেখাটার নাম: 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'—লেখক: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটা এত সুন্দর লাগলো যে, এই হাবিলদার নজরুল ইসলাম কে, তা জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। প্রথম লেখাই যাঁর এত সুন্দর, পরবর্তীকালে তাঁর লেখা যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে এ-ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে রইলো।

আমার এক নিকট-আত্মীয় বললো: 'আমাদের বাড়ীতে থেকে দরিরামপুর স্কুলে পড়ত এক কাজী নজরুল ইসলাম—সে নয়তো? কিন্তু সে তো 'হাবিলদার' ছিলো না! তবে তার বাতিক ছিলো গান করা, কবিতা লেখা আর অট্টহাস্য করা। পাঠ্য বই কেনবার তার পয়সা ছিলো না, সহপাঠীদের নিকট থেকে একদিন-দু'দিনের জন্য বই ধার নিয়ে যেতো এবং সারা রাত জেগে পড়তো। তবু পরীক্ষায় কিন্তু সে বরাবর হতো ফার্ষ্ট। কিন্তু হাবিলদার সে হবে কেমন করে?'

আমি বললাম: 'তুমিও যেমন! দরিরামপুর স্কুলের পড়ুয়া হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, এ কি একটা কথা হলো?'

কিছুদিন পরে ঢাকা থেকে কলকাতা গিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম এবং ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-

সমিতি'র অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলাম। সাহিত্য-সমিতির সহ-সম্পাদক মোজাফ্ফর আহ্মদের সাথে এবং কলকাতার আরো অনেক সাহিত্যিকের সাথে ক্রমে আলাপ-পরিচয় হলো। মোজাফ্ফর আহ্মদকে একদিন নজরুল ইসলামের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: 'আরে, নজরুল ইসলাম আজই করাচী থেকে এখানে আসছেন যে! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তিনি এখানে এসে পৌঁছবেন।'

অধীর আগ্রহে নজরুল ইসলামের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে প্রতীক্ষার শেষ হলো—নজরুল এলেন। সৈনিক বেশ, কাঠখোট্টা চেহারা, দাড়ি-গোঁফ গজায়নি, এক কিশোর খন্‌খনে অট্টহাসিতে ঘর মুখরিত করে আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। অপেক্ষমান সকলের সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয় করিয়ে দিলেন মোজাফ্ফর আহ্মদ। আমার পরিচয় জেনে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন এবং বললেন: 'আরে আপনি! 'মহাশ্মশানে'র নিন্দাকারীর প্রতিবাদ আপনিই করেছিলেন? আমি ভেবেছিলুম, ইয়া লম্বা-দাড়ি কোনো প্রবীণ লোক আপনি হবেন! এখন দেখছি, হয়ত আপনি এখনো কলেজের ছাত্র।'

আমি বললাম: 'হ্যাঁ, আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ি।'

তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হলো। সাহিত্য ছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোনো কথা ছিলো না। কথায় কথায় বললেন যে, কলকাতায় থেকে তিনি একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চা করবেন।

সাহিত্য-সমিতি অফিসেই তিনি আস্তানা গাড়লেন। তাই প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে দেখা হতো। ক্রমে সাহিত্য-সমিতির নজরুলের বাস-কক্ষটি সাহিত্যিকদের একটা আড্ডা হয়ে উঠলো। মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কাজী আবদুল ওদুদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে প্রতিদিন সেখানে সাহিত্যের নেশায় সমবেত হতেন। নানা আলোচনায়, গল্পে, গানে আসর গুলজার হয়ে উঠতো।

তারপর কিছুদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম। হঠাৎ একদিন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর আহ্বানে কলকাতায় গিয়ে হাজির হলাম এবং দৈনিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তখন দৈনিক 'মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। সম্পাদকীয় দফতরে তখন আরো লোকের প্রয়োজন। একদিন ওয়াজেদ আলী বললেন: 'নজরুল আবার কলকাতায় এসেছে। তাকে আমাদের এখানে আনলে কেমন হয়?'

আমি বললাম: 'খুব ভালো হয়। এক্ষুনি তাঁকে নিয়ে আসুন।'

নজরুল এলেন। তাঁর অট্টহাসিতে, গল্পে, গানে, আবৃত্তিতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতর গুলজার হয়ে উঠলো। দুপুরের খাওয়াটা অফিসঘরেই সবদিন চলতো। নজরুলও তাতে শামিল হতেন। চাপাতি-কাবাব ছিলো আমাদের প্রধান খাদ্য। তা-ই আমরা সকলে মিলে গোগ্রাসে গিলতাম। একদিন চাপাতি-কাবাবের সদ্ব্যবহার করতে করতে নজরুল হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন: 'আপনার বাড়ী কোথায়?'

আমি বললাম: 'ময়মনসিংহে।'

'কিন্তু ময়মনসিংহে কোথায়?'

'পাড়াগাঁয়ে। বর্ধমানের লোক আপনি, সে তো চিনতে পারবেন না।'

'চিনতে পারবো না মানে? আমি যে বহুদিন ময়মনসিংহের পাড়াগাঁয়ে ছিলাম।'

'কোথায় ছিলেন? আমার বাড়ী ধানীখোলা। চিনতে পারবেন?'

'চিনবো না কি রকম? আমি ওগাঁয়ে কতদিন গিয়েছি। কাজীর-শিমলার কাজী বাড়ীতে থেকে আমি যে দরিরামপুর স্কুলে পড়েছি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সেই আত্মীয়ের কথা মনে পড়ে গেলো। বললাম: 'আপনি কি পরের কাছে বই ধার করে নিয়ে, রাত জেগে পড়ে, পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে যেতেন?'

তিনি অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন: 'সে কথা জানলেন কি করে?'

আমি বললাম যে, তিনি কাজীর-শিমলায় যে বাড়ীতে থাকতেন, তারা আমার নিকট-আত্মীয়। তাদের কারুর মুখে শুনেছি।

তিনি বললেন: 'ঠিকই শুনেছেন। আপনার আত্মীয়টি ছিলেন তখন আসানসোলের দারোগা। আমার মেধা ও দারিদ্র্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক রুটীর দোকান থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে যান এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। আপনাদের দেশে ছিলাম মাত্র এক বৎসর। তারপরেই সেখান থেকে চলে এসে আমি পল্টনে নাম লেখাই।'

আমি বললাম: 'এত কাছে ছিলেন, অথচ আপনার সাথে আমার দেখাই হলো না—আশ্চর্য! আচ্ছা, আপনি ধানীখোলার কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন?'

'ধানীখোলায় গিয়েছিলাম এক ছাত্র-সভায়। শুনেছিলাম, একটি স্কুলের ছেলে নাকি এক নাটক লিখেছে এবং তা-ই সেখানে অভিনীত হচ্ছে। ভারী কৌতূহল হলো। দরিরামপুর স্কুলের সহপাঠীদের সাথে তাই দেখতে গিয়েছিলাম। ছাত্র-নাট্যকারটির সাথে পরিচিত হওয়ারও ইচ্ছা জেগেছিল।'

'পরিচিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, আমার সহপাঠী রুস্তম আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।'

'অথচ এখন তাকে চিনতেই পারছেন না!'

'মানে? আপনিই তবে সেই ক্ষুদে নাট্যকার?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনিও অট্টহাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন। আমরা পরস্পর প্রীতিভরে করমর্দন করলাম।

নজরুল-সঙ্গলাভে দৈনিক 'মোহাম্মদী'তে আমাদের সময় বেশ আনন্দেই কাটছিলো; কিন্তু নিয়ম-কানুনের বাধা-নিষেধ মেনে চলা নজরুলের প্রকৃতিই নয়। অফিস-ডিসিপ্লিনকে তিনি বারবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দেখাতে লাগলেন। অফিসে একদিন আসেন তো তিনদিন আসেন না। কাজের খুব ক্ষতি হতে লাগলো। এমনি সময়ে একদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হলো! নজরুল ঝড়ের বেগে অফিসে এসে বললেন: 'সত্যেন সম্পর্কে আজকের আর্টিক্‌ল্ আমি লিখব কিন্তু।' আমরা খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম: 'নিশ্চয়ই আপনি লিখবেন। আপনি ছাড়া এ আর্টিক্‌ল্ আবার কে লিখবে?'

আর্টিক্‌ল্ তিনি লিখলেন এবং সকলকে পড়ে শোনালেন। খুবই সুন্দর লেখা। কিন্তু ওয়াজেদ মিয়া গোপনে আমাকে বললেন: 'এ লেখা কি করে আমাদের কাগজে প্রকাশ করা যায়!'

আমি বললাম: 'দু'চারটে শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করে প্রকাশ করলে কেমন হয়?'

ওয়াজেদমিয়া বললেন: 'তা হয় বটে, কিন্তু নজরুল রাগ করে আবার চলে না যায়!'

সে আশঙ্কা খুবই ছিলো। তবু রাতে প্রুফ দেখতে গিয়ে লেখাটার কিছু কিছু পরিবর্তন আমাদের করতে হলো। পরদিন আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। সেই যে নজরুল ডুব দিলেন, আর আমাদের অফিস-মুখো কখনো হলেন না!

নজরুল-সাহিত্যে নূতন ভাবধারা

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠে। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে নূতন ভাবধারা আনয়ন করেন। তাঁহার সাহিত্যের তিনটি যুগ আছে: প্রথমটি জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য : দ্বিতীয়, সাম্যবাদীয় সাহিত্য ; তৃতীয়, তৎপরবর্তীকালের সাহিত্য, যাহা গজল প্রভৃতি গান প্রধান সাহিত্য।

তিনি বলিয়াছেন, 'অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, 'ধূমকেতু'র পথ কি?···নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথনির্দেশ করছি।···সর্ব প্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না। কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে।' এই স্থলে কবির জাতীয়তাবাদীর রূপের পার্শ্বে সামাজিক-বিপ্লববাদীর রূপ প্রকাশ পায়।

সাধারণভাবে যাহাকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে তাহা তাঁহার লক্ষ্য নয়। তাঁহার এই আদর্শ 'ভারত ভারতবাসীর জন্য' এই বুলিতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। এই জন্য তিনি কেবল রাজনীতিক পরিবর্তন চান নাই, সমাজকেও সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছেন।

এক সময় বোধ হয় তিনি কোনো কোনো ভূতপূর্ব বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহাদের অতীত কার্যের কাহিনী শ্রবণ করেন। এই সময়েই ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'

প্রকাশিত হয়। এই সময়েরই পুস্তক হইতেছে কবির 'কুহেলিকা'। এই পুস্তক অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য। এই নভেলে লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমজনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'প্রমত্-দা'র নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদার-পুত্র জাহাঙ্গীর প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিতে দৃঢ় কঙ্কল্প ও শেষে দীপান্তর গমন, এই বর্ণনা গঙ্গা ও যমুনার মিলনের ন্যায় সুমহান হইয়াছে।

এই পুস্তকে কবি ভারতবর্ষ ও জাতীয়তাবাদের প্রচলিত অর্থের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন। তাই তিনি বৈপ্লবিক নেতা প্রমথের মুখ দিয়া বলিতেছেন, 'আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ,—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদ-দলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ; ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামানুষের মহা-ভারত।'

নিরন্ন পদ-দলিত, শোষিত লোকদেরই নিয়া যে ভারতবর্ষ, তাহা পরের যুগের কবির সাহিত্যে আরও পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে কবিকে শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার বীণায় নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই তিনি বলিতেছেন:

'সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'

পুনঃ, এইরূপে তিনি 'কৃষাণের গান', 'ধীবরের গান', 'শ্রমিকের গান', 'সাম্যবাদের গান', 'মানুষের গান' প্রভৃতি গান তখনকার নব প্রতিষ্ঠিত 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সব গানে তিনি গণ-শ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাহাদের উপর উচ্চ-শ্রেণীদের শোষণের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব গানগুলি আজ সারা বাংলার সম্পত্তি হইয়াছে। এতৎব্যতীত,

তিনি বুর্জোয়া সমাজের মাপকাঠি দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার করাকে ঘৃণা করিয়াই বলিয়াছেন :

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো।'

এই তর্ক ধারিয়াই তিনি আবার চোর ডাকাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

'কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, দাগাবাজ,
তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।'

এই সময়ে সাম্যের গান গাহিবার কালে তিনি গাহিয়াছেন :

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষেরে মেরে পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।
মূর্খরা সব শোনো মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।'

এই স্থলে সর্ব প্রথম বাংলা ভাষার বড় কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী 'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। চণ্ডীদাসের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে বাংলা সাহিত্যে আবার সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। আর, আশ্চর্যের কথা, উভয় কবিই বীরভূমের মাটিতে উৎপন্ন! চণ্ডীদাসের সময়ের পর, বাংলা সাহিত্যের কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; কত ভাব-বন্যার স্রোত তাহাতে আসিয়াছে, কিন্তু বর্তমানের গণসমূহের কবি নজরুল ইসলাম যে নূতন রূপ সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কবি নজরুল ইসলাম একজন আশাবাদী। ভবিষ্যতের প্রতি

তিনি আশান্বিত। এই আশার বাণী তিনি স্পষ্ট রূপে ছাত্রদের উল্লেখ করিয়া 'ছাত্রদল' নামক কবিতায় বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছেন :

'কবে সে খোয়ালী পাতসাহি
সেই অতীতে আজও চাহি…

ফেলিস অশ্রুজল
আমরা ধূলায় গড়িব তাজমহল।'

আমরা পুনরায় গৌরবের সৌধ নির্মাণ করিব, পূর্বের গরিমার কথা স্মরণ করিয়া আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না, ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে আছে, তাহা আরও উজ্জ্বলতর হইবে ; এই কথাই তরুণ ছাত্রদের তিনি সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন।

কবি নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, জানি না কয়জন তাহার মর্ম বুঝিয়াছেন। তিনি 'হিন্দু কি মুসলমান' এ-কথা কে জিজ্ঞাসা করে? তিনি নিজেই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন :

'হিন্দু না ওরা মুসলমান?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!'

কবি নজরুল ইসলাম নব বাংলার তথা সমগ্র নব ভারতের আশাপ্রদানকারী কবি। তিনি অনাগতকালের কবি।

কাজী নজরুল ইসলাম মায়ের দামাল ছেলে। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে বাংলা মায়ের কোলে আবির্ভূত হয়ে তিনি এইটিই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যথার্থই শাক্ত, মায়ের শক্তিতে শক্তিমান সন্তান। তাঁর এই উদ্দাম প্রাণের, অপরিমিত সৃজনী শক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা গানে—যার ভঙ্গীও বহু বিচিত্র: কখনো গজলের চটুল আবেশের ছোঁয়ায় মাতাল, কখনো দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় বিভোর, কখনো নানা রাগ-রাগিণীর তন্ময়তায় আনন্দ-বিহ্বল। আজকের বাংলা দেশ তাঁকে জানে এক অদ্বিতীয় সুরকার ও গীতিকার হিসাবেই এবং একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক কবিরূপে, যাঁকে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একদিন অভিনন্দিত করে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু নজরুলের আসল পরিচয় আমাদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মর্ম-কেন্দ্রটি আমাদের কাছে আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। যিনি আজ স্তব্ধ, মূক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহামৌনের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝঙ্কার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত। প্রথম জীবনে দেশমাতৃকারূপে এই জননীই তাঁর ধ্যান জ্ঞান আরাধনার বিষয় ছিলেন এবং শেষের দিকে বিশ্বমাতৃকা বা জগজ্জননীরূপে তিনিই তাঁর আরাধ্যা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর্জীবনের এ পরিণতির খবর হয়তো অনেকে রাখেন না, গীতিসুরকার বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের কথা অনেকেই জানেন না।

তিনি শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃস্বরূপের নব ভাষ্যকার। চমকে যেতে হয় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশ দেখে।...

এই নিখিলের আরাধ্যা মহাশক্তিকে তাঁর নানা বিভাবে বন্দনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'দেবীস্তুতি'তে। মূলে যিনি আদ্যাশক্তি পরমা কুমারী তাঁর মুখ্য তিনটি বিভূতি বা বিভাব : মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। মহাকালীরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব মধুকৈটভনাশের জন্য বিষ্ণুকে উদ্বোধিত করতে। কাজী নজরুল মধু ও কৈটভকে চিনেছেন অধৈর্য ও অবিশ্বাস রূপে। তাঁর এ ব্যাখ্যা যেমন অভিনব তেমনি আকর্ষণীও। তেমনি মহিষাসুরকে তিনি দেখেছেন ক্রোধের প্রতীকরূপে, যার বিনাশ সাধন করেন মহালক্ষ্মী এবং জগতে এনে দেন শান্তিসুষমা, সুখসমৃদ্ধি। আর শেষে কাম ও লোভরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন সরস্বতী তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল খড়্গ দিয়ে। তখন—

'মা যে আমার কেবল জ্যোতি'

এবং

'সেই পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।'

এই পরম অনুভবে কবি আত্মহারা! আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের এই তিন মূল বিভাবের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মধুকৈটভাদি দৈত্য বা অসুরের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলো এবং আধুনিক যুগেও 'সাধন-সমর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।···

বাংলা দেশের এই মহা দুর্দিনে কবির এই অভিনব শাক্তপদাবলী এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে।···

কাজী সাহেবের কবিতা

মোহিতলাল মজুমদার

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কাব্যভারতীয় ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকূতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইঁদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে।

কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।

অভিযান

— · —

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান।
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান।"

— · —

চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।।

— · —

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়।
আজ বিপদের পরশ নেবে
নাঙ্গা মাদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা করে,
সেই আশায় রইলি সবে ?

রাত পোহাবে প্রভাত হবে—
গাইবে পাখী গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

— . —

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।

অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান।"

নজরুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জ, ২-৭-২৬

একদিনের ঘটনা — বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

একদিন সন্ধ্যাবেলা বসে আছি তাঁর [নজরুলের] ঘরে। একদল ছেলে এলো—আমার চেয়ে বয়সে বড়।

ছেলেরা একে একে নজরুলকে প্রণাম করলো, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

আমি বিস্মিত! কেননা এমন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে আমি। কাজেই পায়ের ধুলো সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে।

পরিচয়ে জানলাম, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদল শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নজরুলকে।

হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলেরা মুসলমানকে প্রণাম করে গেল। বললে কবিদের কোন জাত নেই।

'আমার কাননের বুলবুলি—উড়ে গেছে। যে দেশে গেছ তুমি সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?'

পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছে নজরুল। সে কী, মৃত্যু কেন? মৃত্যু তো অকাল মৃত্যু কেন? চারদিকে এতো উৎসব-উজ্জ্বল জীবন সমারোহ, তার মাঝে কেন এই অকাল-নির্বাপণ? এই শীতল সমাপ্তি? এই প্রাণোচ্ছল সদানন্দ শিশু কি মরবে বলে এসেছিলো? কিন্তু তার চোখে-মুখে দেহে-মনে তার তো কোনো সঙ্কেত, কোনো আভাস ছিলো না। প্রদীপটি স্থির শিখায় জ্বলতে-না-জ্বলতে কে তাতে নিশ্বাস ফেললো? কে সমস্ত কিছু নিবিয়ে দিলে এক ফুঁয়ে? কে সে? কোথায় সে? তার দেখা পেলে একবার জিজ্ঞেস করতাম। কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাওয়া যায়? আমাকে সে পথের সন্ধান কে বলে দেবে?

'সহসা একদিন তাকে দেখলাম।' 'পথহারার পথ' নামে বইটির ভূমিকায় লিখছে নজরুল: 'নিমতিতা গ্রামে বিবাহ সভায় সকলে বর দেখছে, আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখছে আমার প্রলয়-সুন্দর সাবথিকে। সেই বিবাহ সভায় আমাব বধূরূপিণী আত্মা তার চির জীবনের সাথীকে বরণ করে নিলো। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি হচ্ছে। শ্বেতচন্দনের শুচি সুরভি ভেসে আসছে, নহবতে সানাই বাজছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দবাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পেলাম, তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদগাতা শ্রীশ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথ প্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতিটি পথিক আজ তাঁকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেদিন থেকে আমার বহির্মুখী চিত্র অন্তরে কার যেন অভাব বোধ করতে লাগলো। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠেছে—অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রুকুটিভঙ্গে ভয় দেখাচ্ছে, আমি ধূমকেতুরূপে সেই রুদ্র ভৈরবদের মশাল জ্বেলে চলেছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখিয়ে আমার হাত পিছলে মৃত্যুর সাগরে হারিয়ে গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমার কাছে ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ফিরতে লাগলো। ধর্মরাজ আমার হাত ধরে তাঁরই কাছে নিয়ে গেলেন, যাঁকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ সভায় দেখেছিলাম। ধ্যানে বসে আবিষ্টের মতো তাঁকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে—বুলবুলকে—শেষবার দেখিয়ে হেসে চলে গেলেন।'

'পথ হারার পথ' শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের লেখা। পথহারার পথ অর্থ যোগসাধনার পথ। কালক্রমে নজরুল আবার সেই পথের পর্যটক। নজরুল তাই শুধু যোদ্ধা নয়, সে আবার যোগী। তার যোগ আর যুদ্ধ একসঙ্গে। সে যুদ্ধযোগী, যোগীযোদ্ধা।

শ্রীঅরবিন্দ তাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাই। নজরুলও তাঁদের অনুগামী। অরবিন্দের মতো নজরুল আবার কবি।

লিখছে নজরুল: 'আমি আমার আনন্দ-রস-ঘন স্বরূপকে দেখেছি। কি দেখেছি, কি পেয়েছি আজও তা বলবার আদেশ পাইনি। হয়তো আজ তা গুছিয়ে বলতেও পারবো না, তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আমি ধন্য হলাম, আমি বেঁচে গেলাম। আমি অসত্য হতে সত্যে এলাম, তিমির হতে জ্যোতিতে এলাম, মৃত্যু হতে অমৃতে এলাম।'

ব্ল্যাক-আউটের রাতে নিবিড় অন্ধকারে একা-একা হেঁটে গিয়ে

দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে বসছে নজরুল, আবার বিরজাসুন্দরীর অন্তিম শয্যার পাশে বসে ভক্ত হরিদাসের মত নাম কীর্তন করছে। আর তার মুখে নাম শুনে গৌরার্পিতচিত্ত বিরজাসুন্দরী বলছেন, 'অদ্যাপিও সংকীর্তন করে গোরা রায়। কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।' বিরজাসুন্দরী সেই ভাগ্যবতী।

নজরুল আজ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়, স্তব্ধতার সঙ্গীত। বিদ্রোহের প্রণাম নয়, প্রণামের বিদ্রোহ।

প্রথম আলাপে

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেলো। সে কাবতা পড়লো। 'গান শোনালো। আমিও তাকে গান শোনালুম।

কি ভালই লেগেছিলো নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে। সবল শরীর; ঝাঁকড়া চুল, চোখ তুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই। প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের মতো পাতলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিলো ভারী, গলায় যে সুর খেলতো তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিলো যাহু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়তো শ্রোতার বুকে।

অনেক চিকণ গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগলো।···

প্রবল হতে সে ভয় পেতো না, নিজেকে মিঠে দেখবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করতো না।

রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাংলা দেশে। এমন সহজ গতি, আবেগের আগুন ভরা কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বাইরের জগতে মাঝে মাঝে যেমন ঝড় ওঠে, মানুষের মনের জগতেও তেমনি। এবং ওঠে একই কারণে।

কোথাও কোনো উত্তাপ যখন অস্বাভাবিক ও অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ঝটিকার প্রচণ্ডতার ভিতর দিয়েই অন্তর ও বহিপ্রর্কৃতি তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে পাবার প্রয়াস পায়।

বাংলা দেশের বর্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনি অস্বাভাবিক উত্তাপই রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক কারণে জমে উঠেছিলো। সেই উত্তাপ থেকে যে দুরন্ত বাষ্পাবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো তার একদিকের প্রকাশ নজরুল ইসলালের মধ্যে মূর্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ। ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান। উচ্ছৃঙ্খল বাত্যার মতই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে, আর যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্ঠরোধ করে, সেখানে আঘাতের পর আঘাতে মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে। পূর্বের কিছু কিছু রচনা রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ-কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হলেও শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের ঊর্ধ্বে তুষারশিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পিছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপ্রান্তে যখন জগৎজোড়া অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বাংলার হোমরুল আন্দোলন যখন প্রবলতর হতে থাকে সেই কালে বাংলার কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে তরুণ কাব্য-সাধকের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের পূর্ব পরিচয় কারও জানা ছিলো না—তখন শুধু জানা গিয়েছিলো তিনি সৈনিকবৃত্তি ছেড়ে বাংলা সাহিত্যের সেবায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পরে জানা গিয়েছিলো বর্ধমান জেলার বিশেষ একটি গ্রামের ইস্কুলে তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সতীর্থ ছিলেন। নজরুল যখন তাঁর অনুরাগরঞ্জিত কবি জীবন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কলকাতার রাজপথে, তখন তাঁর একদল লক্ষ্মীছাড়া বন্ধু ভিন্ন অপর সহায় সম্বল বিশেষ কিছু ছিলো না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিলো এমন একটি প্রবল উজ্জ্বল প্রাণ, এমন একটি সরস, উজ্জ্বল এবং হাস্যোদ্দীপ্ত জীবন,—যেটি সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে রাখতো তাঁর পরিপার্শ্বিক বন্ধু সমাজকে। তাঁর স্বভাবের দীপ্ত, তাঁর প্রাণবন্যা এবং তাঁর হাস্যমুখরতা—এদের আকর্ষণে কলকাতার রাজপথে একদা ভিড় জমে যেতো। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদল থেকে নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির,—তাঁর গোত্র মেলেনি কারও সঙ্গে,—তিনি আগাগোড়া অনন্য। তিনি জাতি-গোত্র-গোষ্ঠি-বর্ণের অতীত এক বিস্ময়কর ও দৈব প্রেরিত ব্যক্তিত্ব—যাঁর জুড়ি এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নজরুলের সাহিত্য-জীবনের আয়ুষ্কাল হয়তো মাত্র পঁচিশ বছরের বেশি নয়, এই কালের মধ্যে তিনি একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী বাঙালীর জীবনে প্রবল উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন,

অন্যদিকে তেমন সাহিত্যকর্মী ও রসিক সমাজে শ্রেষ্ঠ সমাদরও লাভ করেছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিলো অসি, অন্য হাতে ছিল বাঁশী। কাব্য-রচনাকালে তিনি সর্ব প্রকার অভ্যস্ত নীতি ও নিয়ম, ছন্দ ও মিল, রীতি ও গঠন—এগুলিকে অতিক্রম করে যে অবিমিশ্র নবীনতার স্বাদ এনেছিলেন তাঁর কবিতায়, যে নবতম শব্দ সম্ভারে তিনি প্রাণময় করে তুলতেন তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা ও গান,—তার পরিচয় আজও আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীত, তাঁর লিরিক গান, শ্যামাসঙ্গীত এবং তার বিবিধ তেজস্বী রচনা—আপন আপন প্রাণময়তায় আজও সতেজ। সেদিনের সেই উজ্জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক আজও নিষ্প্রভ হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সকলের অলক্ষ্যে একটি যোগাসন গ্রহণ করেন,—এই সংবাদটি শুনে তার সমকালীন লেখক-গোষ্ঠী সচকিত হন্। তাঁরা এ-কথা জানতেন, তাঁর প্রথম পুত্র-সন্তানের মৃত্যুর পর থেকে নজরুলের উদ্দাম ও বাধাবন্ধহীন কবি-জীবনে একটি ভাবান্তর আসে, এবং তিনি ধীরে ধীরে এক অধ্যাত্ম জীবনের দিকে আসক্ত হতে থাকেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষপ্রান্ত অবধি এইভাবেই তাঁর চলে, এবং সেই সময় থেকেই তাঁর রচনা-স্রোত স্তিমিত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হাওড়ায় যে বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়, নজরুল তাঁর জীবনের শেষবারের মতো সেই সভায় যোগদান করেছিলেন।

নজরুল আজও সুস্থ দেহে বিরাজ করছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বর্তমান যে আত্মসমাহিত স্তব্ধতা, এটিকে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি বলতে আমার মন প্রস্তুত নয়। এদেশ ও ওদেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্‌রাও তাঁর এই রহস্যজনক ব্যাধিকে নিরাময় করতে সমর্থ হন নি। তাঁর চেহারা ও চাহনি, ভাব ও ভঙ্গী—এমন একটি মর্মার্থ বহন করছে, যেটি লৌকিক বিচারে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা বোধ হয় সাধ্যাতীত। তাঁর বাহ্য-চৈতন্য অসাড়,—কিন্তু তাঁর

অন্তশ্চৈতন্য হয়তো কোনও এক নিবিড় ও গভীরতর ধ্যানে আত্ম-নিমজ্জিত। কে জানে, তিনি হয়তো তাঁর আয়ুষ্কালের শেষপ্রান্তে হঠাৎ আবার একদিন ফিরে আসবেন আমাদের এই লৌকিক জগতে!

কিন্তু এ-কথা নির্ভুলভাবেই সত্য, কাজী নজরুল ইসলামের সম্মাননা ও সংবর্ধনা যতো বেশি বৃদ্ধি পায়, তাঁর সমকালীন লেখক ও লেখিকারা ততো বেশি গৌরব-গর্বিত বোধ করেন। বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুল অজাতশত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

'আমার বাল্যকাল কেটেছে অজ্ঞ মফস্বলে। দেশের বৃহৎ জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না—যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরি করে এবং অনেক ক্ষীণ হয়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হয়ে বালক মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম ; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফস্বলও থরথর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হয়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশসুদ্ধ লোক যেন সব-খোয়াবার মন্ত্রে ক্ষেপে গেলো।

সে-সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না হয়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহলে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারী গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোটো ছিলুম যে, পিকেটিং করে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিলো না আমার। যা-হোক কিছু একটা করে উত্তেজনার ধারটাকে ক্ষইয়ে দেবার কোনো পথ আমার খোলা ছিলো না বলেই মনে-মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের

সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে—কী ভাগ্য! কী বিস্ময়!—একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কন্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে গাগলো, আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হন নি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র খবর পাওয়া গেলো যে, তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম-প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজী' এই জোড়া খেতাব বসানো হতো—তার মধ্যে প্রথমটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টি বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরোলো মাসিকপত্রে—ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে-সব ভাগ্যবান কবিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম যে, তিনি বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়,

পুরানা পল্টনে, 'কল্লোল'-'প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের স্রোত—যেন তা কখনো ক্ষান্ত হবে না, যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুষমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে, তারা শেষ পর্যন্ত তার উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি করে ঢাকার ইতিহাসে একেবারেই অনেকখানি কালিমা লেপন করে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো-বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো-করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম চা, পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন-খোলা, সময়ের হিসেব-ভোলা—নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার-কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতি বারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের

মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনেরময়লা খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরি এনগেজমেণ্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে পড়ে, দলে পড়ে, সবই করতে পারেন। একবার কলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হলো, না কি এমন আশ্চর্য কিছু ঘটলো, ফুর্তির ঝোঁকে 'কল্লোল' দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন—নজরুলকে ধ'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু-দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে যে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সে-কালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন—মনে মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তাফা একবার ছড়া কেটেছিলেন—

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত,
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়;
ধরায় পর তার কেউ নয়।

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিক সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময়

কই। নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশী তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশী তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ সাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়।—গানে তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ মনে প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে, আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন্ কুলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ-বাসি বাসরে আসিলে কে গো / ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া / পরান পিয়া', এ-সব গান ঢাকায় লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে। এইমাত্র-শেষ-করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে-শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধরে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম—ঢাকায় না 'কল্লোলে'র আড্ডায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশিদিন ধরে দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি, কলকাতায় এসে এখানে সেখানে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণ-শক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে আমাকে। সত্যিই তিনি যেন 'চির শিশু, চির কিশোর।' সম্প্রতি তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত হচ্ছিলাম—এইজন্যে ব্যথিত যে, প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে ফলেনি, তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন

নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো বছর চারেক আগে—সেবার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টিমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো—দেখলাম তাঁর চোখ মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'I am the greatest yogi in India.' যোগসাধনা আরম্ভ করে তাঁর গায়ের রং তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধ ঘণ্টা ব'সেছিলেন—এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজরবন্দী হয়েছেন।

তার পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন—তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর জীবনে পরিণত বয়সের শান্ত সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর যদি তা না হয়, যদি এখানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার সমাপন ঘটে, তাহলেও, গেলো পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সঙ্গীত বাঙালীর মনে তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা যারা তাঁর সমকালীন, আমরা তাঁর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

একবার কলিকাতা গিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসায় যাই। তখন বিবাহ করিয়া সদ্য সংসার পাতিয়াছেন। হাস্য-রসিক নলিনীকান্ত সরকারের বাসায় তিনি ছিলেন। কবি আমার সঙ্গে ভাবীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভাবীর সেই রাঙা টুকটুকে মুখের হাসিটি আজও মনে আছে। এরপর যখনই কবিগৃহে গমন করিয়াছি, কবি পত্নীর ব্যবহারে তাঁহাদের গৃহখানি আমার আপন বলিয়া মনে হইয়াছে। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ি।

ভাবীর মতন এমন সর্বংসহা মেয়ে বাংলাদেশে খুব কমই পাওয়া যায়। কবির ছন্নছাড়া নোঙরহীন জীবন। এই জীবনের অন্তঃপুরে স্নেহ-মমতায় মধুর হইয়া চিরকাল তিনি কবির কাব্য সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। কোনো সময় তাঁহাকে কবির সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করিতে দেখি নাই।

কবির প্রথম ছেলেটির নাম ছিল বুলবুল। অতটুকু ছেলে কী সুন্দর গান করিতে পারিত! কেমন মিষ্টিস্বুরে কথা বলিত! কবির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া আমরা তার মুখের মিষ্টিকথা শুনিতাম। কবি হারমোনিয়ামে যখন যে কোনো সুর বাজাইতেন, বুলবুল শুনিয়াই বলিয়া দিতে পারিত কবি কোন্ সুর বাজাইতেছেন। ওস্তাদী গানের নানা সুর-বিভাগের সঙ্গে সে ঐটুকু বয়সেই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলো। বড়ো বড়ো মজলিসে কবি খোকাকে লইয়া যাইতেন। এই শিশুটিকে পাইয়া কবির ছন্নছাড়া জীবন কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলো। কবিকে আর কবি-পত্নীকে অনন্ত কান্নার সাগরে ডুবাইয়া সেই বেহেস্তের বুলবুল পাখী বেহেস্তে পলাইয়া গেলো। কবির গৃহে শোকের তুফান উঠিলো।

বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম না। কলিকাতায় আসিয়া শোকাতুর কবিকে ডি. এম. লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাইলাম। দোকানের বেচা-কেনার হট্টগোলের মধ্যে এককোণে বসিয়া তিনি হাস্যরস-প্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' নামক বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। পুত্রশোক ভুলিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত অঙ্গে বিষাদের ছায়া। চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিয়া গিয়াছে। আমি এই সময় প্রায়ই কবির কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। ঐ সময় একদিন জেল হইতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মোজাফ্‌ফর আমেদের চিঠি পাইয়া তিনি অজস্রভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বুলবুলের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমেদ সাহেব কবিকে সমবেদনা জানাইয়া ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন।

বুলবুলের যতো খেলনা, তাহার বেড়াইবার গাড়ী, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি কবি বাড়ীতে একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। বুলবুলের মৃত্যুর পব তাহার শতচিহ্ন-জড়িত গৃহে কবির মন টিকিতেছিলো না। খোকার অসুখে অজস্র খরচ করিয়া এই সময়ে কবি ভীষণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ কবিকে আমাদের দেশ প্রকৃত সম্মান দেয় নাই।···

একবার পরলোকগত সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কবি আর হেমন্ত সরকার আমাদের ফরিদপুরে আসিলেন। সরোজিনী নাইডু একদিন পরেই চলিয়া গেলেন। কবিকে আমরা কয়েকদিন রাখিয়া দিলাম।

এক সভায় কবি তাঁহার বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। সে কী আবৃত্তি! কবির কণ্ঠ হইতে যেন অগ্নি-বর্ষণ হইতেছিলো—সেই আগুনে যাহা কিছু ন্যায়ের বিরোধী, সমস্ত পুড়িয়া যেন ধ্বংস হইতে লাগিলো। ইহার পর আরও একবার কবি আমার পদ্মাতীরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ফরিদপুরের তরুণ জমিদার বন্ধুবর লাল মিয়া সাহেব মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া আমার কাছ হইতে কবিকে ছিনাইয়া লইয়া শহরে চলিয়া গেলেন। বাঁশবনের

যে স্থানটিতে কবির বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছিলাম, সেই স্থান শূন্য পড়িয়া রহিলো। চরের বাতাস আছাড়ি বিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিলো। আমার নদীতীরের কুটীরে কবির এই শেষ আগমন।

কবিকে কতভাবে কতো জায়গায় দেখিয়াছি। যখন যেখানে তাঁহাকে দেখিয়াছি, স্ব-মহিমায় তিনি সমুজ্জ্বল। বড়ো প্রদীপের কাছে আসিয়া ছোটো প্রদীপের যে অবস্থা হয় আমার তাহাই হইত। অথচ, পরের গুণপণাকে এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে নজরুলের মতো আর কাহাকেও দেখি নাই। নজরুলের ছিলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নজরুলের জীবন লইয়া অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। এই লোকটি আশ্চর্য লোকরঞ্জনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে গিয়াছেন যশ সম্মান আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে।—গ্রামোফোন কোম্পানীতে আজ যে এতো কথাকার আর সুরকার গুঞ্জরণ করিতেছেন, এ শুধু নজরুলের জন্যই। নজরুল প্রমাণ করিলেন যে, গানের রেকর্ড বেশী বিক্রী হয় —সে শুধু গায়কদের সুকণ্ঠের জন্যই নয়, সুন্দর রচনার সহিত সুন্দর সুন্দর সমাবেশ রেকর্ড বিক্রয় বাড়াইয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি গ্রামোফোন কোম্পানীতে নানান ধরনের গানের হট্টগোলের মধ্যে কবি বসিয়া আছেন—সামনে হারমোনিয়াম—পাশে অনেকগুলি পান, আর গরম চা। ছ'সাতজন নামকরা গায়ক বসিয়া আছেন কবির রচনার প্রতীক্ষায়—একজনের চাই শ্যামাসঙ্গীত, অপরজনের কীর্তন, একজনের ইসলামী সঙ্গীত, অন্যজনের ভাটিয়ালি গান—আরেকজনের চাই আধুনিক প্রেমের গান। এঁরা যেন অঞ্জলি পাতিয়া বসিয়া আছেন। কবি তাঁহার মানস-লোক হইতে সুধা আহরণ করিয়া আনিয়া তাহাদের করপুট ভরিয়া দিলেন। কবি ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন, আর গুনগুন করিয়া গানের কথাগুলি গাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া কথাগুলি লিখিয়া লইতেছেন। এইভাবে একই অধিবেশনে সাত-আটটি গান শুধু

রচিত হইতেছে না—তাহারা সুর সংযোজিত হইয়া উপযুক্ত শিল্পের কণ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

কবিকে আমি শেষবার সুস্থ অবস্থায় দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুনিলাম, মুসলিম-হলে কবির অনুষ্ঠান আছে। আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে দেখিয়া কবি কতো খুশী হইলেন—আমার কানে কানে বলিলেন—'মায়েরা ছেলেদের প্রতি যে স্নেহ-মমতা ধারণ করে, তোমার চোখে মুখে সমস্ত অবয়বে সেই স্নেহ-মমতার ছাপ দেখতে পেলাম।'

কিছুদিন পরেই শুনিলাম কবি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। ব্যথিত হৃদয়ে অসুস্থ কবিকে দেখিবার জন্য বহুবার কবি-গৃহে গমন করিয়াছি। আগে তিনি দেখিলে আমায় চিনিতে পারিতেন—এখন আর পারেন না। কবির শাশুড়ী খালা-আম্মার বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিব।

একদিন বেলা একটার সময় কবি-গৃহে গমন করিয়া দেখি, খালা-আম্মা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে খালা-আম্মা বলিলেন—'জসীম, তোমরা জানো, লোকে আমার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। নুরুর নামে যেখান থেকে যতো টাকা পয়সা আসে, আমি নাকি সব বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নুরুকে ভালোমতো খাওয়াই না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জানো, আমার ছেলে নেই, নুরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর, আমিই বা কে? নুরুর দু'টি ছেলে আছে—তারা বড়ো হয়ে উঠছে। আমি যদি টাকা লুকিয়ে রাখি তারা সহ্য করবে কেন?—নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরের দরদ বেশী? আমি তোমায় বলে দিলাম জসীম—এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাবো। এই নিন্দা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' এই বলিয়া খালা-আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—'খালা-আম্মা, কাঁদবেন না। একদিন সত্য উদঘাটিত হবেই।' খালা-আম্মা আমার হাত

ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম মল-মূত্রের মধ্যে কাপড় জামা সমস্ত অপরিস্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালা-আম্মা বলিলেন—'এই সব পরিস্কার করে স্নান করে আমি বিধবা মেয়েছেলে তবে রান্না করতে বসবো। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এইভাবে তিন-চারবার পরিস্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বোলো, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চোখ যায়, আমি চলে যাবো।' তখন বুঝিতে পারি নাই, সত্য সত্যই খালা-আম্মা ইহা করিবেন। ইহার কিছুদিন পরে খালা-আম্মা সেই যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কিছুতেই তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কবির দুই পুত্র সানি, নিনি কতো স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছে—সেই মহীয়সী মহিলাকে আর পাওয়া যায় নাই। রক্ষণশীল হিন্দু ঘরের এই বিধবা মহিলা নিজের মেয়েটির হাত ধরিয়া একদিন এই প্রতিভাধর বাঁধনহারা কবির সঙ্গে অকূলে ভাসিয়া ছিলেন।

নিজের সমাজের হাতে, আত্মীয় স্বজনের হাতে সেদিন তাঁর গঞ্জনার সীমা ছিলো না। সেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে তিনি তৃণের মতো পদতলে দলিত করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নিন্দা অন্য ধরনের—অত্যন্ত কুৎসিৎ, কদর্য। এই নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না।

খালা-আম্মা আজ বাঁচিয়া আছেন কি না জানি না। ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই থাকুন, তিনি যেন তাঁর এই পাতানো বোনপো'টির একফোঁটা অশ্রুজলের সমবেদনা গ্রহণ করেন। মুহূর্তের জন্যও যেন একবার স্মরণ করেন ভালো কাজ করলে তাহা বৃথা যায় না।

খালা-আম্মা গিরিবালা দেবীর সেই নীরব আত্মত্যাগ অন্ততঃ পক্ষে একজনের অন্তরের বীণায় আজও মধুর সুর-লহরে প্রকাশ পাইতেছে!

নজরুল যৌবনের কবি। তাঁর বিদ্রোহ, পৌরুষ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তি এই যৌবনাবেগ থেকেই উৎসারিত। নজরুলের যৌবনের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টি-সুখের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত নিয়ম-কানুন রীতিবন্ধন ভাঙার দুর্জয় আহ্বান। তিনি বলেছেন, 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস।' তাঁর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।' যৌবনের মূর্ত প্রতীক নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি 'অগ্নিবীণা'য় 'প্রলয়োল্লাসে' শুনিয়েছেন,—

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!'

নজরুলের যৌবনের মধ্যে এক প্রচণ্ড অহমিকা, প্রবল প্রাণময়তা ও দুর্মর পৌরুষ ছিলো যার জন্য তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন,—

'বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া।
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর!'

নজরুল যৌবনের কবি বলে তিনি যৌবনের সর্ববাধাজয়ী শক্তি ও অপ্রতিহত গতিতে অস্থাশীল। তাঁর উদ্দীপ্ত কণ্ঠের প্রশ্ন, 'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?' নজরুল জানেন যে, গর্বোদ্ধত যৌবনই বৃদ্ধত্ব ও স্থবিরত্বের শাসন ও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নূতন জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যৌবনের পূজারী বলে যৌবনের প্রতীক পৃথিবীর শ্রমশক্তির বিজয়-সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই শ্রমশক্তিই জরা মৃত্যু বিভীষিকাময় পৃথিবীকে সুন্দর ও মনোহর করে তোলে। শ্রমজীবীদের বিষয়ে তাঁর ঘোষণা—

'গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে।'

নজরুলের আন্তরিক কামনা, 'যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক, প্রতি নিঃশ্বাসে 'পাব' নিঃশ্বাস বেঁচে থাক!' তাঁর নৌজোয়ান 'নিত্য অভেদ উদার প্রাণ।' তিনি বলেন, 'মৃত্যুকে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান! তাহারা বুদ্ধি বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!' তিনি পৃথিবীতে যৌবনসম্পন্নদের মৃত্যুহীন লীলাবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করে দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,—

'ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া
ভোগ-বিলাসীর তখ্‌ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া!
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর অঙ্গিনাতে!
এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্‌নাহেনা।'

এইজন্য যৌবনের কবি নজরুল ভারতের যুবশক্তির লাঞ্ছনা,

অপমান ও দীনতা দেখে হতাশা ও গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন। 'যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দল' আজ জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ্‌দের প্রলোভনের শিকার হয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁচেছে। তাই তাঁর সুতীব্র বেদনাজনিত খেদোক্তি, 'যৌবনের এ লাঞ্ছনা দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?' কিন্তু তিনি তরুণদের বিষয়ে আস্থা হারান নি, কেননা তিনি তাদের মধ্যে ভয়হীন, দ্বিধাহীন ও মৃত্যুহীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। তরুণদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনে তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'চাহ আঁখি খুলি আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ! অতীত-দাসত্ব ভোলো। বৃদ্ধ সাবধানী হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা!' তিনি কঠোর দুঃখের তরুণ তাপসদলকে আহ্বান করেছেন এক শ্রম-মহান্ বীর্যবান ও প্রাণবন্ত জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য। তরুণদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বলে উঠেছেন,—

'কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজ্‌রে সাজ্!
আর বিলম্ব সাজে না চালাও কুচ্‌কাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ।—
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্রপথিক রে যুবাদল,
জোর কদম চল্‌রে চল্॥'

নজরুলের তরুণেরা দেশমাতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরবে। কঠোর বর্তমানের দারুন দৈন্যতার মধ্যেও তিনি তাদের শুনিয়েছেন মাভৈঃ বাণী। তাঁর ভাষায় 'ভয় কি আয়! ঐ মা অভয়-হাত হাত দেখায় রামধনুর লাল শাঁখায়!' তারুণ্যের উদ্দেশ্যে নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,—

'নাকের বদলে নরুণ চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।

হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা-শিকারী নহে যে যুবা
তারি জয় গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।'

যৌবনের কবি বলে নজরুল 'বিদ্রোহী' 'বাঁধনহারা' 'অগ্নিবীণা'-বাদক। তিনি একদিকে 'দোলন-চাঁপা'র গন্ধে বিভোর, অন্যদিকে 'ফণি মনসা'র প্রতি আগ্রহশীল। তিনি 'ভাঙার গান' শোনান, 'প্রলয়-শিখা' জ্বালান। তিনি কঠোর ও কোমল, সুন্দর ও ভীষণ, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, সাম্য ও বৈষম্যে বিচিত্র, দুর্দমনীয় ও গতিশীল। যৌবনের প্রাবল্য ও উদ্দীপনায় কখনো তিনি দৃপ্ত, মহৎ ও অম্লান, আবার কখনো স্খলন পতন ত্রুটিতে অসম, ভারসাম্যহীন ও দীপ্তিহীন। বলা বাহুল্য এ সবই যৌবনের ধর্ম এবং তাই জীবনের সমগ্র সাধনায় বিধৃত, আর নজরুল এই যৌবনের কবি বলে তাঁর আবেদন এতো দুর্বার, প্রাণবন্ত এবং অনেক ত্রুটি ও তর্কসাপেক্ষ গুণ সত্ত্বেও অব্যর্থ।

গ্রামোফোন ক্লাবে বাংলা ডিপার্টমেণ্টের বড়ো-কর্তা ছিলেন ভগবতী-চরণ ভট্টাচার্য। সবাই তাঁকে ডাকতো বড়োবাবু বলে। একদিন নলিনী সরকার নামে এক ভদ্রলোক এসে বড়োবাবুর হাতে একখানা গানের খাতা দিয়ে বললো, 'দেখুন তো এই বাংলা গজল গানগুলি রেকর্ড করা যায় কিনা ?'

বড়োবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কে লিখেছে ?'

'কাজী নজরুল ইসলাম।'

বড়োবাবু কে. মল্লিককে ডাকলেন : 'দেখুন তো এই খাতাখানা। আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন।'

কে. মল্লিক খাতা পড়ে দেখলো গজল ছাড়া অন্য গানও আছে। ওর মধ্য থেকে দু'খানা গান সে লিখে নিলো। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।' আর 'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।' খাতাটা নলিনী সরকারের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, 'এ দু'খানার বাজার দেখে তারপর অন্য গান নেওয়া যাবে।'

এই গান দু'খানার রেকর্ড যখন বাজারে বেরুলো তখন প্রায় এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। বড়োবাবু কে. মল্লিককে ডেকে বললেন, 'যাক, একটা নতুন লাইন পাওয়া গেলো। এ্যাদ্দিন কেবল তুমি দেহতত্ত্ব, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত গেয়েই কাল কাটালে। এবার দেখা যাক কি হয়।'

'আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

'কাজী সাহেবকে আনিয়ে আরো গান নাও না।'

কে. মল্লিক কাজী নজরুলকে গ্রামোফোন ক্লাবে নিয়ে এলো।

সেখানে কোম্পানীর পরামর্শ অনুযায়ী সুরু হলো তাঁর গান লেখা। বিদ্রোহের রণ-দামামা এখানে বাজানো যাবে না। ঝাঁঝালো স্বদেশী গান এখানে চলবে না। বৃটিশ কোম্পানীর আওতায় এ-সব বাদ দিয়ে লিখতে হবে গান, যাতে শুধু পয়সা আসে। ধর্মীয় গানে একদম কারো আপত্তি নেই। আর মানুষ তো দেশে ধর্ম-প্রবণ। অন্যান্য গানের সঙ্গে তাই একই লেখনী দিয়ে বেরুতে লাগলো দেব-দেবীর উপাসনা, নমাজ, পীর-পয়গম্বরের গান। এতদিন হিন্দু-সঙ্গীত দিয়ে মুনাফা হচ্ছিলো। এখন ইসলামী সঙ্গীত দিয়ে আরো একটি বড়ো বাজার দখল করার চেষ্টা করলো বৃটিশ কোম্পানী। কাজী নজরুল দু'য়েরই যোগান দিয়ে চললেন অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে! এখন তিনি দু'বেলা আসতে লাগলেন গ্রামোফোন ক্লাবে। কে. মল্লিকের কণ্ঠে বেজে উঠলো কাজী নজরুলের প্রথম যুগের অনেক জনপ্রিয় গান। ফলে কে. মল্লিকের জনপ্রিয়তা যেন দেখা দিলো নতুন করে।

এমন সময় তাকে একদিন এসে ধরলো তার এক দেশের লোক! বললো, 'আপনার তো নাম ডাক খুব, আমাকে একটু উঠতে দেবেন?'

'তার মানে?'

'দেখুন মল্লিকবাবু, আপনি কালনার লোক আমার বাড়ী কাটোয়ায়। এক দেশের লোক বললেই হয়—উঠতে দেবেন আমাকে?

কে. মল্লিক হাসি চেপে বললো, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনি উপরে উঠলে তো খুশির কথা। কী নাম আপনার?'

'প্রোফেসার জি. দাস। দেখুন দেশের লোকই দেশের লোককে উঠতে দেয় না কিনা!'

মল্লিক বললো, 'কিন্তু দেখুন, আমাদের গান নেওয়ার আগে একটু পরীক্ষা করতে হয়।'

উত্তর এলো, 'বেশ, দেবো পরীক্ষা।'

প্রোফেসর জি. দাসের পরীক্ষা নেওয়া হলো। একবারেই অচল।

কথাটা শুনে প্রোফেসার জি. দাস ঠিক হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কে. মল্লিক যতই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—'একদিন হবেই।' ততই সে দ্বিগুণ কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠে বলতে লাগলো, 'আমি আঙুরবালাকে মা বলেছি, ইন্দুবালাকে মাসি বলেছি আর আমাকে কিনা—'

কথাটা শেষ না করেই প্রফেসর জি. দাস আবার কাঁদতে লাগলেন। তখন বড়োবাবু এসে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

প্রোফেসর জি. দাস চোখ মুছে বললেন, 'রেকর্ডে নাকি আমার গান নেওয়া হবে না?'

বড়োবাবু জবাব দিলেন, 'এখনও তোমার গান ভালো হচ্ছে না, সুর তাল ঠিক থাকছে না।'

হঠাৎ প্রোফেসর জি. দাস প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আমার সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়ানো ব্যর্থ হলো!'

বড়োবাবু অবাক হয়ে শুধোলেন, 'কে তোমার মিষ্টি খেয়েছে?'

উত্তর এলো—'বীরেনবাবু আর কমলবাবু। কে. মল্লিক আমাকে হিংসে করে গান গাইতে দিচ্ছে না, ওরা আমাকে বলেছে।'

বড়োবাবু হেসে ফেললেন! এই বোকা লোকটাকে ঠকিয়ে ওরা মিষ্টি খেয়ে কে. মল্লিকের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে মজা দেখার জন্যে!

এমন সময় কাজী নজরুল এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রোফেসর বলেই যাচ্ছে—'ওরা আমাকে কথা দিয়েছিলো একখানা রেকর্ড অন্তত হবেই, আজ কিনা বলে কিছু হবে না!'

কাজী নজরুল সব শুনে বললেন, 'দেখুন মল্লিক, এঁকে যখন একখানা রেকর্ড নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে তখন সে কথা রাখতেই হবে।'

মল্লিক বললো, 'বলেন কি, লোকটা পাগল দেখছেন না।'

'কিন্তু বাংলা দেশটাও কম হুজুগে নয় মল্লিক', বললেন কাজী

নজরুল। তারপর প্রোফেসরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আজ যাও, কাল এসো—আমি তোমাকে শিখিয়ে রেকর্ড করাবো।'

জি. দাস একগাল হেসে চলে গেলো। পরদিন কাজী নজরুল দেখেন অনেক আগেই প্রোফেসর হাজির। তাকে বললেন, 'মল্লিককে ডেকে আনো।'

প্রোফেসর জবাব দিলো, 'কাজী সাহেব, মল্লিক আমার শত্রু। আমার গান খারাপ করে দেবে।'

কাজী নজরুল আশ্বাস দিলেন, 'জানো না, কে. মল্লিক খুব ভালো লোক। তোমার সঙ্গে কেমন সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাবে দেখো।'

কে. মল্লিক ঘরে ঢুকতেই কাজী নজরুল বললেন, 'আসুন মল্লিক সাহেব। আর জি. দাস তুমি কপাটে খিল এঁটে দাও। তার আগে তবলাওয়ালাকে ডাকো।'

ঘরে রইলো তখন চারজন।

কাজী নজরুল বললেন, 'শোনো জি. দাস, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে —কী গাইবে, কিছুতেই বলবে না। খুব সাবধান। বাজারে রেকর্ড বের হলে তখন শুনবে।'

জি. দাস সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, কাউকে আগে শোনাবো না।'

কাজী নজরুল বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে ধরো এইবার গান—

'কল গাড়ী যায় ভষড় ভষড়,
ছ্যাকরা গাড়ী যায় খচাং খচ্,
ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
কুলকুচি দেয় করে ফচ্।'

পরের দিন কাজী নজরুল এই গানের জোড়া লিখে আনলেন :

'মরি হায় হায় হায়
কুব্জার কী রূপের বাহার দেখো।
তারে চিৎ করলে হয় যে ঢোঙা
উপুড় করলে হয় সাঁকো।

হরিঘোষের চার নম্বর খুঁটো
মরি হায় হায় হায়।'

প্রোফেসরকে চতুষ্পদ বানানো হচ্ছে তাও সে বুঝলো না। খুব উৎসাহে চালাতে লাগলো রিহার্সেল। রেকডিং ম্যানেজারকেও বলা হলো না কী গান রেকর্ড করা হচ্ছে। আর সে সাহেবটা বাংলা প্রায় বোঝেই না। কাজেই কেউ হঠাৎ টের পেয়ে বাধাও দিতে পারলো না। খুব গোপনেই গান দু'খানা রেকর্ড হলো। কয়েকদিন পর বেরুলো বাজারে।

কাজী এসে বললেন, 'মল্লিক, দেখুন তো একবার বাজারে খোঁজ নিয়ে।'

'খোঁজ নিয়েছি! খুব বিক্রি! খদ্দেররা কিনছে আর বলছে, রেলগাড়ী যায় ভষড় ভষড়।'

হিগিন্‌স তো ভীষণ খুশি। বড়বাবুকে ডেকে বললো, 'ভটচায! তুমি বলো লোকটা ক্ষ্যাপা। বেশ তো সেল হচ্ছে! আরো গান নাও।'

শুনে কাজী নজরুল বললেন, 'মল্লিক সাহেব। এবার কিন্তু গালাগাল খেতে হবে। হুজুগে দেশে ওরকম একবারই চলে!'

ক্রমে ক্রমে কাজী নজরুলের সঙ্গে কে. মল্লিকের সম্পর্কটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক রবিবারের সকাল-বেলা আমি কবির বাড়ীতে গেলাম। তখন কবির বাড়ীতে নেপালী দারোয়ান, গ্যারেজে দামী মোটর।, বেশ শান-শওকতের সঙ্গেই তিনি ছিলেন। এ সময় তিনি ৩৯, সীতানাথ রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করতেন।

বেলা তখন ৯টা। আমি সোজা দোতলায় চলে গেলাম। বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জের আসাদউদ্‌দৌলা শিরাজী বসে আছেন। আমিও আসন গ্রহণ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই কবি এলেন। সদ্যস্নাত এবং পরিচ্ছন্ন ধুতি-গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় সেদিন সকাল বেলায় কবিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তিনি আমাদের সাথে ঢালা বিছানায় আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন—'এই যে, তোমরা কতক্ষণ থেকে বসে আছো?'

আসাদউদ্‌দৌলা শিরাজী অবশ্যি পূর্ব থেকেই কবির বৈঠকখানায় বসেছিলেন। আমি বললাম—'এই কিছুক্ষণ হলো।'

শিরাজী সাহেব সিরাজগঞ্জে নিখিলবঙ্গ মুসলিম যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে কবির দরবারে হাজির হয়েছিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। সেই আসন্ন সম্মেলনে কবিকে সভাপতিত্ব করতে হবে। কবি শুনেই তার স্বভাবসুলভ হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন: 'তুমি আর লোক পেলে না? আমাকে দিয়ে এ-সব হবে-টবে না! কি বলতে কি বলে ফেলবো। শেষটায় হয়তো কাফের ফতোয়ায় আমাকে অভিষিক্ত করবে। নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলন করতে চাও—বেশ, করো। কিন্তু সভাপতিত্ব করার জন্য অন্য কাউকে গিয়ে ধরো—আমাকে নয়।

শুনছো আসাদ, যুব-সম্মেলনে বলবার কথা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু তোমার দেশ তো তা চায় না।'

কবির কথাবার্তার মধ্যে বেদনামিশ্রিত অভিমানের সুর সুস্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। কিন্তু শিরাজী সাহেব নাছোড়বান্দা। তিনি বার বার একান্তভাবে কবিকে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কবি রাজী হলেন।

সিরাজগঞ্জে নিখিলবঙ্গ যুব সম্মেলনেব তারিখ নির্ধারিত হয়েছিলো ঠিক এই দিনের দিন দশেক পরে। সময়টা যতদূর মনে পড়ছে উনিশশো বত্রিশ সালের ৫ই এবং ৬ই নভেম্বর। কবির ওখানেই স্থির হয়েছিলো তাঁর সাথে কলকাতা থেকে কে কে সিরাজগঞ্জে যাবেন। তাদের মধ্যে আমিও একজন।

যথা নিধারিত দিনে আমি আমার পার্ক সার্কাসের বাসভবন থেকে গাড়ী ছাড়বার মিনিট পনেরো পূবে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে পৌছাই। সাথে সাথে কবিকে নিয়ে শিরাজী সাহেবও এসে হাজির হন। তাঁদের সাথে রয়েছেন বন্ধুবর আব্বাসউদ্দীন। এবং মোমেনশাহীর প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব গিয়াসউদ্দীন সাহেব। তিনি তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

গাড়ী যথাসময় স্টেশন ছেড়ে ছুটে চললো। এই সুদীর্ঘ রাস্তায় কবির অপূর্ব রসালাপের মধ্যে কি করে যে সময় কেটে গেলো, টেরও পেলাম না। অবশ্য মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য কবি শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

যথাসময়ে ট্রেন সিরাজগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌঁছলো। আগে থেকেই কয়েক সহস্র জনতা, বিশেষ করে ছাত্র এবং যুবকেরা কবিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলো। গাড়ীর গতি স্টেশনে এসে স্তিমিত হয়ে আসতেই হাজার কণ্ঠে 'কবি নজরুল ইসলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। কবি নামলেন। আমরাও সাথে সাথে নেমে পড়লাম। কবিকে মালা

পরানো হলো। এই অপূর্ব সংবর্ধনার দৃশ্য দেখে আমার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়লো।

মিছিল করে জনতা কবিকে নিয়ে চললো নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে। মুহুর্মুহু 'বিদ্রোহী কবি জিন্দাবাদ' আওয়াজ ধ্বনিত হতে লাগলো, আর সহস্র কণ্ঠের সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আশেপাশের দূরদূরান্তের আলো-বাতাস সব কিছুকেই যেন উজ্জীবিত করে তুললো।

মিছিল গিয়ে শেষ হলো একেবারে যমুনা নদীর তীরে—সুন্দর এক বাংলোর সামনে। আমরা সেখানে উন্মুক্ত চত্বরে আসন গ্রহণ করলাম।

মিনিট দশেক পরে শিরাজী সাহেব সমাগত জনতাকে সম্বোধন করে অনুরোধ জানালেন—'এখন কবি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। রেল ভ্রমণের পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনারা দয়া করে এখন চলে যান। কবি যা বলবেন তা শুনবার জন্যই প্রকাশ্য অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই সেই অধিবেশনে কবির বাণী শুনবার সুযোগ লাভ করবেন।'

যমুনার তীরে অবস্থিত বাংলোয় আমাদের থাকার ব্যবস্থা সত্যিই চমৎকার হয়েছিলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সুব্যবস্থাই করেছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিলো। কবির অভিভাষন সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলো। দ্বিতীয় দিবসে কবির কণ্ঠে তাঁর 'নারী' কবিতার আবৃত্তি সমবেত সকলকে অভিভূত করে রেখেছিলো।

সেই সম্মেলনে কবির নিজের গান এবং আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত সিরাজগঞ্জ শহরকে যেন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলো।

বেশ মনে পড়ছে সম্মেলনশেষে জনাব আফজল মোক্তার সাহেবের

পরপৃষ্ঠায় লেখকের সহধর্মিণীকে লিখে দেওয়া কবির একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র।

পরম কল্যাণীয়া বধূ মাতা
রাবেয়া হায়দর—
চিরায়ুষ্মতীষু

যেমনি মনের ঝরোকা হইতে বোরকা ফেলিলে টানি
ফিরদৌসের লালা-ফুল-কুসুম হ'লে তুমি, কল্যাণী!
ঐ মুক্ত মনের উদার আকাশে
কত তারা ফোটে, কত চাঁদ হাসে
তোমার কথার আবরুগুলি চঞ্চল আলো হানি'
দিগ্‌দিগন্তে উড়ে চলে সব শুনায়ে আশার বাণী।

হেরেমের নহ, তুমি এরেমের বাগিচার মঞ্জরি,
পল্লব-গুণ্ঠনে ঢাকা ছিলে শুভ্র শাপলা-কলি।
উঠায়ি' সহসা মুখের নেকাব
হেরিলে, ঈদের চাঁদের রেকাবে
উছলি' উঠিতে আনন্দ-ধারা অমৃত পড়ে গলি'
ফোরাতের দরিয়া নেমে এল মরু-কারবালা আন্দোলি'

জুলফেকারের পাশে ঐ কালো জুলফের ছায়া দোলে
কওসর-সাকী হায়দরের, কি দিয়ানা তোমার কোলে
জৈতুন-রাঙা রওশন নিয়ে
হেরেমে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে
এস তাপসিনী রাবেয়া! ওঠ শুকতারা সম জ্বলে,
কোহ্-ই-তুর হ'তে নূর আনো এই আঁধার [illegible]!

নিত্য শুভার্থী—
কাজী নজরুল

কলিকাতা

বাড়ীতে কবি ও তাঁর দলবলের জন্য এক সংবর্ধনা-ভোজের আয়োজন করা হয়েছিলো। ভোজন পর্বের পর কবি ও আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ী সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে এমন সময় আফজল সাহেব বেশ জোরে চিৎকার করেই গাড়োয়ানকে বললেন—'থামাও, থামাও।'

আমরা রীতিমতো বিস্মিত হলাম। ব্যাপার কী! তিনি গাড়ীর দরজার কাছে এসে হেসে বললেন, 'কবিকে দেখার জন্য বাড়ীর মেয়েদের একান্ত ইচ্ছা। কবি একটু কষ্ট করে গাড়ীতে উঠে দাঁড়ালেই—খোলা গাড়ী ছিলো—তাদের মনের আশা মিটে যায়।'

কবি হো-হো করে হেসেই আকুল। বললেন, 'কি মুশকিল।'

কবি অবশ্য উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েরা আধ-আড়াল থেকে কবিকে এক নজর দেখে নিলেন।

সেখান থেকে মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমাধি জিয়ারত করার জন্য কবি এবং আমরা আসাদ্‌উদ্‌দৌলা শিবাজী সাহেবের বাড়ী বাণীকুঞ্জে গেলাম। মুসলিম বাংলার অগ্নিপুরুষ 'অনল-প্রবাহের' প্রখ্যাত লেখক, অনন্যসাধারণ বাগ্মী ও জনপ্রিয় দেশনেতা মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কবি অশ্রু-সজল নয়নে দু'হাত তুলে আল্লার দরগায় তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন।

অতঃপর তিনি বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'কবি হিসাবে আমাকে অনল-প্রবাহের লেখক যে আদর দেখিয়েছেন, তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাওয়া। এমন আদর সারা বাংলায় আর কেউ আমাকে করেছে বলে আমি জানি না। তিনি এই সিরাজগঞ্জ থেকে মনি-অর্ডার করে দশটি টাকা আমাকে পাঠিয়েছিলেন এবং কুপন লিখে দিয়েছিলেন—'এই সামান্য দশটি টাকা আমার আন্তরিক স্নেহের প্রতীকস্বরূপ পাঠালাম। এই টাকাটা দিয়ে তুমি একটা কলম কিনে নিও। আমার কাছে এর বেশী এখন নেই। যদি বেশী থাকতো

আমি তোমাকে আরো বেশী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তা হলো না।'

কবির কণ্ঠ সেই মহান, পরম পুরুষের স্নেহ-স্মৃতি স্মরণে কেমন যেন বেদনা বিধুর হয়ে উঠলো। বহু স্মৃতি-বিজড়িত শ্রদ্ধা সিক্ত-গ্রন্থির উন্মোচনে আমাদের চোখও তখন অশ্রু-সজল। স্মৃতির মণিকোঠায় কবির সেই গদগদ স্বগতোক্তি আজো আমার মনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ সম্মেলন শেষ হলো। তৃতীয় দিনে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। আসবার সময় কবি অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটালেন। খুব সম্ভবতঃ কর্মব্যস্ততার দরুন তিনি অতি মাত্রায় ক্লান্তিবোধ করছিলেন। সিরাজগঞ্জে কবির সঙ্গে একটানা তিন দিন কাটিয়ে আমি অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—বিশেষ করে কবির চটুল রসজ্ঞান সম্পর্কে। এখানে তাই কয়েকটি ছোটো ঘটনার উল্লেখ করছি।

যমুনার তীরে সেই বাংলোয় আমরা খেতে বসেছি। আসাদউদ্-দৌলা সাহেব ও গিয়াসউদ্দীন সাহেব পরিবেশন করছিলেন। তাঁরা পাতে পাতে ইলিশ মাছ-ভাজা দিয়ে চলেছেন। কবির পাতেও তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কবি বেশ বড়ো দু'টুক্রো মাছ-ভাজা খেয়েছেন। এমন সময় একজন পরিবেশক যেই কবির পাতে আরও কিছু ইল্‌শে-ভাজা দিতে যাচ্ছিলেন অমনি কবি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'আরে করছো কি! শেষকালে আমাকে বিড়ালে কামড়াবে যে!'

সকলে কথাটা ধরতে পারেনি। গিয়াসউদ্দীন সাহেব তখন বললেন—'মানে!'

কবি হো হো করে হেসে বললেন—'ও, বুঝতে পাচ্ছেন না। ইল্‌শে মাছ—যে মাছের গন্ধ মুখে লালা ঝরায়, বিড়ালকে মাতাল করে তোলে। বেশী খেলে কি আর রক্ষে আছে! সারা দেহ থেকে গন্ধ ছুটবে আর সেই গন্ধ পেয়ে বিড়াল তেড়ে আসবে!'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন !

ভোজনপর্ব প্রায় শেষ। এবার শিরাজী সাহেব কবির পাতে দই ঢেলে দিলেন। একটুখানি দই মুখে দিয়েই কবি অদ্ভুত ভঙ্গী করে শিরাজীর দিকে চাইলেন এবং ডাগর দুই চোখ তুলে বললেন—'কি হে ! তুমি কি এই দই তেতুল গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এলে নাকি !'

আবার সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। বলা বাহুল্য, দই টক ছিলো !

খাওয়া-দাওয়ার পর কবি পান-জরদা মুখে পুরে উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে কবির সামনে দাঁড়ালেন। কবি পরম বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন—'আরে, দুর্গাদাসবাবুর মুখে আস্‌সালামু আলাইকুম যে ! উপস্থিত সকলেই তখন আর এক পশলা হেসে নিলেন—ছাদ-ফাটানো সে হাসি !

সত্যিই, সেই আগন্তুক ভদ্রলোক বাংলা নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই সুদর্শন ছিলেন। তিনি বিনীতভাবে বললেন, 'আমি বন্দ্যোপাধ্যায় নই, আমি সৈয়দ। এই তো রায়পুরে আমার বাড়ী।'

আবার সেই হাসি !

কবির সংশ্রবে যারা কিছু সময় কাটাবার সুযোগ লাভ করেছেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন—কবির সৌন্দর্যবোধ, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী কতো সুন্দর ছিলো। তিনি শুধু মাত্র বিপ্লবী এ-কথাটাই অনেকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বিনয় নম্রতায়, কোমল প্রাণের পেলবতায়, বন্ধু-বাৎসল্যের মাধুর্যে—এক কথায় জীবনের সর্বদিক দিয়ে এক অসাধারণ শক্তি ও গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিলো।

নজরুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে কতটা মধুর ঘনিষ্ঠ, কোনো রকম বর্ণনা করেই সেটা আমি বোঝাতে পারবো না। আমাকে তিনি খালি মুখেই দাদা বলে ডাকতেন না, সত্যই বড়ো ভাইয়ের মতো দেখতেন। যখন তখন ছুটে আসতেন আমার কাছে। প্রায়ই আমার বাড়ীতে কাটিয়ে দিতেন একটানা চার, পাঁচ, ছয় দিন। আমরা একসঙ্গে আহার ও শয়ন করতুম। বাকি সব সময়টা কোথা দিয়ে চলে যেতো তাঁর কণ্ঠে গান আর গান আর গান শুনে। তখন তিনি সংসারী, তাঁর বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব উঠেছে, কিন্তু এটা বুঝেও তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, নিশ্চিন্তভাবে চায়ের পেয়ালা খালি করছেন, পান মুখে পুরছেন আর গাইছেন।

আমার বড় মেয়ের বিয়েতে নজরুলকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করি নি। হিন্দুর বাড়ী, আত্মীয়স্বজনের অধিকাংশই ছুঁতমার্গ মেনে চলেন। কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলায় অনাহূত নজরুল নিজেই এসে হাজির অম্লান বদনে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অসন্তোষের সাড়া জাগতেও বিলম্ব হলো না। কিন্তু আমি দুই কূল বজায় রেখেছিলুম, বন্ধুদের ও আত্মীয়দের পৃথক স্থানে আহারের ব্যবস্থা করে।

গঙ্গার ধারে আমার নূতন বাড়ী। পূর্ণিমার রাত্রি। অকস্মাৎ নজরুলের আবির্ভাব! চীৎকার করে উঠলেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে। বাঃ, কি জায়গায় বাড়ী করেছো দাদা? আজ আমার এইখানেই আহার ও শয়ন।'

তারপরেই হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চন্দ্রকর পুলকিত গাঙ্গার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে বসলেন।

স্মৃতির গ্রামোফোনে সেই সব গান রেকর্ড করে রেখেছি, আজও তা শুনতে পাই যখন আবার আসে পূর্ণিমার রাত, গঙ্গাজলে সাঁতার কাটে চাঁদের আলো।

কিন্তু নজরুল আজ থেকেও নেই।

নিষ্ঠুর সত্য!

কাজী সাহেবের সঙ্গে প্রথম দেখা আমার হুগলীতে, কিন্তু তাব বহু আগেই তাঁকে মেনে নিয়েছি জীবন পথের অগ্রদূত হিসেবে। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর মঈনুদ্দীনের সঙ্গে হুগলীতে রেলের লাইনের ধারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনলাম, তিনি উত্তর-পাড়ায় এক সভায় গেছেন। রাত্রি ন'টার সময় তিনি ফুলের মালা গলায় পরে বাড়ী ফিরে এলেন। বিশেষ পরিচয় করে দিতে হলো না। দেখেই তিনি হেসে উঠলেন, যেন যুগ যুগের চেনা। উপস্থিত কেউ বুঝতেও পারলো না, সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

কাজী সাহেব চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছেন কয়েকবার। যে ক'দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হতো বাড়ীখানি যেন ভেঙে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্কে ভরে চা, বাটা ভরা পান, কালিভরা ফাউন্টেন পেন আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘবের দরজা বন্ধ করে দিতাম।

সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতা। এক-এক করে 'সিন্ধু', 'তিন তরঙ্গ', 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'কর্ণফুলি', 'মিলন মোহানায়', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'নবীনচন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'শিশু যাত্নকর,' 'সাত-ভাই চম্পা'—আরও কতো কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আমাদের বাড়ীর সুপারী গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে।

সারারাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। ত্নপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন পামিষ্ট্রীর চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবা খেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে, সমুদ্রে। সাম্পানওয়ালারা এসে জুটতো, সুর

করে চলতো সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম—'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাংগা আমার তরী',···'ওগো গহীন জলের নদী'···এক-এক সময় চট্টগ্রামী সাম্পানওয়ালারা গাইতো—'বঁধুর আমার চাটি গাঁ বাড়ী—বঁধুর আমার নন্দীর কূলে ঘর'।

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে। কখনো পরতেন তিনি আরবী পোশাক, কখনো বা ব্রিচেস। কাজী সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত, খালবিল, নদী-চরে বেড়িয়েছি। সঙ্গে ছেলের দল। এতবড়ো বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি বড়ো ভয় করতেন। একবার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোঁকের ভয়ে আর তিনি নামতে চান না। কয়েকজনে মিলে কাঁধে করে তাঁকে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আমার জীবনের মজার ঘটনা কাজী সাহেবকে নিয়ে। আমার আত্মীয়েরা সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। সবাই ধরে বসলেন—আমাকে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ হলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেলো। শুধু Secretary of stateএর মঞ্জুরী বাকী। কাজী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, নিযুক্তি-পত্র এলে কলকাতা কংগ্রেসের সময় মঞ্চের উপর উঠে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে হবে। কাজীদা'র ভক্ত-শিষ্য পুলিশের চাকরি করবে, তিনি সইতে পারতেন না। পদত্যাগ আমাকে আর করতে হয়নি, কথাটি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলো। টেগার্ট সাহেবের দৌলতে ইংরেজের চাকরির খাতা থেকে আমার নাম কেটে যায় চিরদিনের জন্য। আমি তখন কাজী সাহেবকে নিয়ে সভা করে বেড়াচ্ছি। কাজী সাহেব বক্তৃতা করছেন—'গান্ধীজীর দল কাটছে চরকা—আমরা কাটবো মাথা।' কাজী সাহেবের মনে কারুর প্রতি বিদ্বেষ দেখিনি কোনদিন। তিনি ছিলেন সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন—

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

বাংলার "আজীজ" *

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বাংলা-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি, গাইলে জাগার গান!
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-'পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহ্‌আকবর!"
কোরান শুধু পড়ল সবাই, বুঝলে তুমি একা
লেখার যত ইসলামী-জোশ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি যখন ঘাঁটছিল সব মসি,
আলোয় তোমার উঠল ঝলসি দু-ধারী তলোয়ার!
চমকে সবাই উঠল জেগে, কচলে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল —
যাদের প্রতাপ-দাপে একদিন বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশমন্ দর্পহর,
লায়লা চিরে আনলে বাহার — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটছে বাহার-ফুল,
গুলশানে ফুল ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি-এ সাহেবের স্মরণে —

'চট্টগ্রামে লেখকের বাড়ীতে থাকাকালীন লেখা, কবির 'বাংলার আজিজ' কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র।

গরুর গায়ে পানি ঢেলে দিলে সে যেমন করে আনন্দে লাফাতে থাকে, তার মধ্যে তখন থাকে না বিদ্বেষ-বিষ, সে-রকম অনাবিল আনন্দের ধ্বনি এই—

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

নজরুলকে 'জাতিয় কবি' বললেই সবটুকু বলা হলো না। আমাদের জীবনে নজরুল ইসলাম কতখানি জায়গা জুড়ে আছেন, পরিমাপ করা সহজ নয়। এক কথায় বলতে গেলে কাজীদাকে বাদ দিয়ে আমরা নিজের কথা ভাবতেই পারিনে। আমাদের রাজনীতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানস ও মনন—এক কথায় আমাদের জীবনের অনেকখানি তো তাঁরই হাতে গড়া।

নজরুল ধাপের পর ধাপ পরিশ্রম করে সাহিত্যের যশের মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়নি···যেদিন সে এলো, সে দিনই সে বিজয়ীর মতো এলো···কালবৈশাখীর অকস্মাৎ ঝড় যেমন হঠাৎ আসে অরণ্য উতলা করে পথঘুর্ণি তুলে, পথিকদের সন্ত্রস্ত সচকিত ক'রে গৃহস্থের টিনের চাল উড়িয়ে দিয়ে, ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাজিয়ে।

প্রচণ্ড মহীরুহ ভেঙে দুমড়ে ফেলে আনন্দের অট্টহাস্যে ঘোষণা করে, আমি এসেছি···তুমি যাও বা না-যাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না···বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে নজরুল ঠিক সেইভাবেই প্রবেশ করে, একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের মতন, বিজয়ীর মতন। তাকে খুঁজে নিতে হয়নি তার আসন, সে এসে মহা-অভ্যাগতের মতন যেখানে বসে, সেখানেই তার আসন রচিত হয়েছে। সাহিত্য-জগতে তার এই প্রবেশের সঙ্গে তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনই এক সুর ও এক ছন্দে গাথা।

কালবৈশাখী যেমন কোথা থেকে এলো, কি করে এলো, আসতে না আসতেই কোথা থেকে নিয়ে এলো এই প্রচণ্ড কালো মেঘের প্রমত্ত ছুটে চলা, তা যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করবার সময় পায় না, কালবৈশাখী তার অস্তিত্বের প্রচণ্ড উল্লাসে কাউকে তা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশই দেয় না, নজরুল সম্বন্ধেও সেদিন কেউ জিজ্ঞাসা করলো না, কোথা থেকে এলে, কি করে এলে, কোথায় কখন সংগ্রহ করলে এই প্রচণ্ড গতির সংবেদন···নজরুলও কাউকে সে অবকাশ দিলো না।

শুধু এইটুকু জানা গেলো, সে হাবিলদার···যুদ্ধ ফেরত···নজরুল নিজে তার নামের মাঝে হাবিলদার কথাটিকে সংযুক্ত রাখতে ভালবাসতো। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে যে সব বাঙালী তরুণ যোদ্ধা হিসেবে

যোগদান করেছিলো, নজরুল তাদেরই একজন···পল্টন ভেঙে দেওয়াতে তারা ফিরে এসেছে—পল্টন-জীবনের স্মৃতি নজরুল তখন নিজের অঙ্গে বহন করে বেড়াতো। তার বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে পায়ে থাকতো মিলিটারি বুট···সে এক অদ্ভুত পোশাক···গেরুয়া রঙের চাদর···পায়ে মিলিটারি বুট···হাতে একখানা হাত-পাখা···একরাশ এলো চুল···কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে দুলছে।···

আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয় হলো, তখন আমাদের কাছেও নজরুল তার পূর্ব জীবনের কথা উল্লেখ করতো না···আমরাও পীড়াপীড়ি করিনি···তার বালক কালের বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী শৈলজানন্দের কাছে যা শুনতাম, তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম, নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

আমরা সবাই তখন জীবনের অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত স্তর থেকে এসেছি···তাই আমাদেরই সগোত্র একজন বলে ধরে নিয়েছিলাম··· পিছনের কথা জানবার কোনো প্রয়োজনই হতো না···কারণ সামনে যাকে পেয়েছি, তার নতুনত্বের বৈচিত্র্যই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো···নজরুল নিজেও নিজের সম্বন্ধে সেই কথাই বলতো, এই আমি···। এই আমার পরিচয়···এর বেশী জেনে কি লাভ ?

নজরুল ইসলাম — কাজী আবদুল ওদুদ

বাঙালী পল্টন ভেঙে যাবার পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল যখন কলকাতায় এলেন তার কিছুদিন আগে থাকতেই 'সওগাত' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা'য় ছোটো গল্পের ধরনের কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিলো। (লেখাগুলো পরে 'ব্যথার দান' ও তাঁর 'রিক্তের বেদন'এ সংগৃহীত হয়)। সেই লেখাগুলো তখন বেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কেননা ঐসব পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না. কিন্তু যাঁদের চোখে পড়েছিলো তাঁদের বেশ একটু চমক লেগেছিলো। লেখাগুলো যে খুব পাকা নয় সে-সম্বন্ধে তাঁদের বুঝিয়ে বলার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না, তাঁদের চমক লেগেছিলো এই বড়ো কারণে যে, লেখাগুলোয় বিজ্ঞতার অভাব যতটা ছিলো প্রায় সেই অনুপাতেই তাতে ছিলো লালিত্য আর প্রাণসম্পদ।

কলকাতায় যখন নজরুল এলেন তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর। গড়নে নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুঠাম, ললিতশ্যাম, চোখ দুটি কিছু বেশী চঞ্চল ও উজ্জ্বল—স্নেহ মমতা কাড়বার অপূর্ব যাদু তাতে, কণ্ঠে অশ্রান্ত গান বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমের গান আর কারণে অকারণে প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। সবাই জানেন নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন অতি অল্প দিনে—তার মূলে ছিলো তাঁর এই প্রাণপ্রাচুর্যভরা মোহন নবীনতা।

অচিরে কবিতা রচনায়ও তিনি মন দিলেন। তখন জানা ছিলো না, কবিতা রচনায়, বিশেষ করে উর্দু ও বাংলা পদ মিশানো কবিতা রচনায় বালক বয়সেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। করাচী সেনানিবাসে এক পাঞ্জাবী হাফিজ-ভক্তের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে

হাফিজের ও ব্যাপকভাবে ফারসী সাহিত্যের চর্চা করেন ; হাফিজের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ এ সময়ে তিনি করেন। দেশে এই সময়ে শুরু হয় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। সে-আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে চললো, নজরুলের রচনা-শক্তিরও উৎকর্ষ লাভ হতে লাগলো। তাঁর প্রথম যে কবিতাটি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করলো, সেটির নাম 'সাত্ ইল্-আরব'—১৩২৭ সালে জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। বিনয় সরকার মশায় (তিনি বোধ হয় তখন ইউরোপে ছিলেন) এর উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করলেন। কবিতাটির একটি স্তবক এই :—

'দুষ্ মন্-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌মিল্।
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পায়ে নীল খুন পিণ্ডারীর !
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর হায়দারী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর
সাতিল্-আরব ! সাতিল্-আরব !! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।'

প্রবলভাবে ভালবাসার বা ঘৃণা করবার কাল যৌবন। অত্যাচারীর প্রতি নবীন কবির সেই প্রবল সহজ ঘৃণা অদ্ভুত রূপ পেয়েছে এর ক'টি ছত্রে। এর পরে তাঁর যে কবিতাটি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করলো সেটি 'খেয়া-পারের তরণী'—শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রেরই ভাদ্রের সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদার মশায় তাঁর উচ্চ প্রসংসা করেন। 'মোসলেম ভারতে'র ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত 'কোরবানী' কবিতাটিও জনপ্রিয় হলো ; কিন্তু উক্ত পত্রের আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'মোহররম' কবিতাটি বেদনায় গভীরতায় আর ছন্দ ও মিলনের অপূর্ব চাতুর্যে বাংলার রসিক-সমাজের চিত্ত একেবারে জয় করে নিলো। এর প্রথম দুটি স্তবক এই :—

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
'আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া'
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কার্‌বালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !
রুদ্র মাতন ওঠে দুনিয়া—দামেশ্‌কে,—
'জয়নালে পরালে এ খুনিয়ারা বেশ কে ?'
'হায় হায় হোসেনা' ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়।
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদের পাঞ্জায় ?'

লক্ষ্য করবার আছে 'খেয়াপারের তরণী'র ও 'মোহররম'এর রূপ কল্পনায় মুসলমান সমাজের প্রচলিত ধারণার রদবদল করতে তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি, শুধু তাঁর ভাবাবেগের গাঢ়তা ও অপূর্ব শব্দ-যোজনা-সামর্থ্য তাঁকে এমন অভাবনীয় সাফল্য দান করেছে। 'মোহররম' কবিতাটি এক অতিশয় শক্তিশালী মর্মিয়াগীতি, তার সঙ্গে তাতে প্রকাশ পেয়েছে সেই খেলাফত আন্দোলনের যুগের মুসলমানের দিগ্‌ভ্রান্ত মানসিকতা। এই অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ লক্ষণীয় :—

'দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম।
লোহু লাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম ॥'

এই তিনটি কবিতা পেয়ে বাংলার রসিক সমাজ সেদিন যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগে নজরুলের শিরে কবি-যশের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশী নেই। কিন্তু এমন সমঝদারির পরিচয় দিয়ে বাংলার রসিক-সমাজ সেদিন অবিবেচনার পরিচয় দেন নি। এই তিনটি কবিতায় বাস্তবিকই রয়েছে নজরুল-প্রতিভার এক বিশিষ্ট পরিচয়—অপূর্ব বীর্যবন্ত তরুণ কবির শিল্প-প্রতিভার পর্যাপ্ত পরিচয় যা পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার মহত্তর পরিচয়ের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে বিরলভাবেই। গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর এই শিল্প-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করেছে তাঁর এই যুগের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা'।

'প্রভাতী' কবি নজরুল

সুখলতা রাও

নজরুলের ছোটদের কবিতার কথা কিছু লিখতে বলেছেন ! ছোটদের কবিতা নজরুল খুব বেশী লেখেন নি। তবে যে ক'টি লিখেছেন, তার মধ্যে বিশেষ করে একটি কবিতার কথা আমি বলবো। সেটি হলো তাঁর 'প্রভাতী' কবিতা। এই কবিতাটিকে আমি ছোটদের মনে সুন্দরভাবে ছাপ ফেলতে দেখেছি। ছোটদের কবিতা আবৃত্তি শেখানো আর ছন্দের গান তৈরী করতে এমন কবিতা বাংলা শিশু সাহিত্যে খুব বেশী নেই, এ-কথা আমি বলতে পারি।

মানুষের জীবনে প্রত্যেক দিনই প্রভাত আসে। ভোর হয়। সুন্দর একটি সকাল দিয়ে প্রতিটি দিনের কাজ হয় শুরু। তা নজরুল তাঁর এই 'প্রভাতী' কবিতা দিয়ে সব শিশুদের চোখের সুমুখে যেন এক চির-চেনা প্রভাতকে নতুন সাজে এনে মেলে ধরেছেন। তাঁর এই কবিতায় নানা রঙে রাঙা প্রভাতের ছবিটি কী মনোমুগ্ধকর ! পাহাড়ী ঝর্নার মতো শীর্ণ, অথচ চঞ্চল গতিতে চলছে এগিয়ে—

ভোর হলো
দোর খোলো
  খুকুমণি ওঠো রে !
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
  ফুল খুকি ছোটো রে !
  খুকুমণি ওঠো রে !
রবি মামা
দেয় হামা
  গায়ে রাঙা জামা ঐ,

দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ, রামা হৈ।

আকাশে রবি মামা রাঙা জামা গায় দিয়ে দেখা দিয়েছেন, জুঁই-ডালে ছোটো ফুল খুকির ডাক, ওদিকে সাত-সকালে ইয়া চওড়া গোঁফো দারোয়ান 'রামা হৈ রামা হৈ' করে গান জুড়েছে—এ সবই ছোটদের চিত্ত আকর্ষণ করার মতো টুকরো রঙিন ছবির মেলা।

এই শুধু নয়, খুকু জেগে উঠলে পরে কবি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রভাতিক কর্তব্য।

নাই রাত
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে
ভগবানে
তুষি' বর মাগো রে!

আগেকার দিনে, যুগে যুগে ছোটরা কবিতা-পাঠ শিখতো 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' দিয়ে। এখন সে জায়গা নিয়েছে নজরুলের এই 'ভোর হলো দোর খোলো' কবিতা।

ছোটদের খেলার রাজ্যে তাদের মন জয় করার এমন কবিতা আমাদের শিশু সাহিত্যে আজকাল আর লেখা হয় না বললেই হয়।

অনেকদিন আগে উড়িষ্যার এক বাঙালী শিশু অনুষ্ঠানে নজরুলের এই 'প্রভাতী' কবিতা দিয়ে তৈরী একটি নৃত্যানুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই দিনই বুঝেছিলাম, ছোটদের মনে এই কবিতা কতখানি ছাপ ফেলতে পেরেছে। সে নাচের অনুষ্ঠানে ছোটো ছোটো অনেকগুলি চরিত্র তারা তৈরী করেছিলো—ফুল খুকি, রবিমামা, গান গাওয়া দারোয়ান, আর বিছানায় শোয়া খুকুমণি তো ছিলই।

শুধু এই 'প্রভাতী' নয়, নজরুল আরো কয়েকটি খুব ভালো

ছোটদের কবিতা লিখেছেন—ঝিঙেফুল, খুকু ও কাঠবেড়ালী, খাঁদু দাদু, লিচু চোর—এই সব। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয়েছে—তাঁর অন্য সব কবিতা পড়ে ছোটরা আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু তাদের মনে সত্যিকারের সাড়া জাগাবার মতো কবিতা ঐ একটিই—ঐ 'প্রভাতী'। আর এমন কবিতা অন্য কেউ লিখতেও পারলেন না। তাই এ জায়গায় নজরুল ইসলাম সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নজরুল-জীবনের প্রথম পর্ব আবদুল কাদির

কবিশ্রেষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুলের পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ্। মাতার নাম জাহেদা খাতুন এবং মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সময় পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় আগমন করেন। তাঁদের বাড়ীর পূর্বপার্শ্বে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পীর-পুকুর। এরূপ প্রবাদ আছে যে, হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক জবরদস্ত ফকির ঐ পুকুরটি খনন করিয়েছিলেন; তাই তার নাম 'পীর-পুকুর'। পীর-পুকুরের পূর্ব পাড়ে হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। কবির পিতা পিতামহ আজীবন ঐ মাজার শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। কবির পিতা স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন, সাধব বৃত্তি তাঁর স্বভাবগত ছিলো,—প্রত্যহ মাজার শরীফে সাঁঝবাতি দেওয়া এবং মসজিদে বসে এশা'র নামাজ পর্যন্ত তসবিহ্ তেলাওৎ করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো।

কাজী ফকীর আহমদের সাত পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজানের পর চার পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। অতঃপর নজরুলের জন্ম হলে তাঁর ডাক-নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'। নজরুলকে তাঁর পড়শী ও পরিজনেরা এই নামেই ডাকতেন। অপরিসীম দুঃখের মধ্যেই নজরুলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে; তাঁর অন্তিম জীবনেও দেখছি অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভ্রূকুটি। তাঁর 'দুখু মিয়া' নাম এমনভাবে সার্থক হবে, কে জানত?

কবি বাল্যকালে পিতৃহীন হন। ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র কবির পিতা দেহত্যাগ করেন। ফলে দরিদ্রের সংসারে বিষম বিপর্যয় দেখা দেয়,—কবির পড়াশোনায় অতিশয় ব্যাঘাত ঘটে। ১৩১৬ সালে দশ বৎসর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর এক বৎসর কাল সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। সে-সময় আশে-পাশের পল্লীতে মোল্লাগিরি করে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টাও তিনি দেখছিলেন এবং মাঝে মাঝে মাজার শরীফের খাদেমগিরি ও মসজিদের এমামতিও করতেন।

নজরুলের পিতৃব্য কাজী বজলে করিম ফারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কবিতার চর্চা করতেন। এই পিতৃব্যের কাছেই নজরুলের ফারসী শিক্ষার হাতে-খড়ি হয় এবং তাঁর প্রভাবে নজরুল বাল্য বয়সেই উর্দু-ফারসী মিশ্রিত 'মুসলমানী বাংলা'য় পদ্য রচনা শুরু করেন। তৎকালে সেই অঞ্চলে 'লেটো-নাচ' নামে এক ধরনের যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিলো; কাজী বজলে করিম, কাজী ফজলে আহমদ প্রভৃতি ছিলেন স্থানীয় লেটো-দলের উস্তাদ। নজরুল এগারো-বারো বৎসর বয়সেই সেই নট-দলের জন্য 'শকুনি-বধ', 'মেঘনাদ-বধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সং' প্রভৃতি গীতি-নাট্য ও প্রহসন এবং বহু মারফতী, পাঁচালী ও কবি-গান রচনা করে 'ছোটো উস্তাদজী' খ্যাতি অর্জন করেন। নজরুলের কবি-প্রতিভা জীবন-প্রভাতেই এমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিলো যে, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পল্লীর লেটো-দল তাঁর কাছে পালা লেখাতে আসতো। তাতে তাঁর দু'পয়সা রোজগারও হতো। তাঁর তৎকালীন রচনায় উর্দু-ফারসী-মিশেল্ ঘরোয়া বাংলা জবানের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় যে, মুসলমানী পুঁথি ও মারফতী গানের সংস্পর্শ লাভ তাঁর ঘটেছিলো। রাঢ়-বঙ্গের পাঁচালীকার, কবিয়াল ও যাত্রাওয়ালাদের ঢঙে তিনি অনেক হাসির গানে প্রচুর ইংরেজী পদ প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেই বাল্য-রচনাতেও রয়েছে কবির স্বকীয়তার ছাপ।

সেই কিশোর বয়সে লোকশিল্পী-দলের সংস্পর্শে এসে তাঁর বাল্যের আচারনিষ্ঠা ভাবরসে বিধৌত হয়ে তাঁর মনোজীবন হলো যেমন অন্তর্মুখী, তেমনি সাংসারিকতার বন্ধন বিস্মৃত হয়ে বহির্মুখী জীবন হলো উদ্দাম, সংগ্রামশীল। একদিকে ঔদাসীন্য ও অন্যদিকে চাঞ্চল্য নজরুলের প্রকৃতিতে প্রথম বয়সেই দেখা গিয়েছিলো। তাঁর পদ্য-রচনার বাতিক দেখে পড়শীরা তাঁকে ডাকতো 'ক্ষ্যাপা'। এই ক্ষ্যাপা পথে-প্রান্তরে পরশ-পাথর খুঁজে খুঁজে একদা শেষে হলো গৃহছাড়া। ১৩১৮ সালে দেখা গেলো নজরুল মাথরুন হাই-স্কুলের ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নজরুলের নম্র প্রকৃতি ও সম্ভ্রমবোধ সহজেই কুমুদরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্লাশ সিক্স্ পর্যন্ত পড়েই নজরুলকে অর্থাভাব বশতঃ সেই স্কুল ত্যাগ করতে হলো।

অতঃপর নজরুল রানীগঞ্জে রেলওয়ের এক গার্ড সাহেবের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন তার বাবুর্চীগিরি করলেন। সেখানে এক ফ্যাসাদ পাকিয়ে উঠতেই তিনি হলেন অদৃশ্য। আসানসোলে এসে আবদুল ওয়াহেদের বেকারীর দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে রুটির ময়দা মাখার চাকুরী নিলেন। লেটো-দলের সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে নজরুল ইতিপূর্বেই যন্ত্রসঙ্গীতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ; সেই সুবাদেই আসানসোলের তৎকালীন পুলিশ-ইন্সপেক্টার কাজী রফিজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো। তীক্ষ্ণধী নজরুল সহজেই দারোগা সাহেবের স্নেহ আকর্ষণ করলেন। দারোগা সাহেবের স্বগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলা ; নজরুলের পড়াশোনার একটা উপায় করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন এবং ত্রিশাল-বাজারের সন্নিকটবর্তী দরিরামপুর হাই-স্কুলে ক্লাশ্ সেভেনে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মেধাবী নজরুল সেই স্কুলে 'ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ্' পেয়েছিলেন। শ্রীমহিমচন্দ্র খাসনবীশ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সদ্য বি. এ. পাশ করে

সেই স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন ; তিনি নজরুলের ক্লাশে ইংরেজী ট্রান্সলেশন শিক্ষা দিতেন। নজরুলকে ক্লাশে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রথমে হক্‌চকিয়ে যেতেন, তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখা যেতো ; কিন্তু প্রশ্নটি পুনরায় বলা হলেই নজরুল তার সঠিক জবাব দিতেন। সে-বছর স্কুলে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়, তার মহড়ার ভার পড়েছিলো মহিমবাবুর উপর। নজরুল কোনো মহড়া ব্যতিরেকেই সে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' চমৎকাররূপে আবৃত্তি করেন। কাজীর-সিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুল প্রায় পাঁচ মাইলের পথ ; সেই দূর পথ প্রত্যহ পায়ে হেঁটে নজরুল স্কুলে যেতেন। সেই প্রবাসে পলাশ-শিমূল-শোভিত পথের সবুজ সৌন্দর্য কিশোর-কবির মনে দিতো নিবিড় আনন্দ। তিনি কারো সাথে বড়ো মিশতেন না। গ্রামের বখাটে বালকেরা তাঁকে দেখলে বিরক্ত করতো। ক্লাশে তিনি অন্যমনস্ক থাকতেন ; কিন্তু দুষ্কর্মের পাণ্ডাগিরি ছিলো তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। স্কুলের অদূরে ঠুনিভাঙা বিল, নজরুলকে মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিয়ে প্রায়ই তার তীরে উদাস দৃষ্টিতে একা বসে থাকতে অথবা বাঁশী বাজাতে দেখা যেতো। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিলো অদম্য, কিন্তু স্কুলের নিয়মের বাঁধন তাঁর শিল্পী-মন মেনে নিতে পারেনি ; ফলে বার বার তিনি হয়েছেন পলাতক। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার পরই তিনি হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। স্কুলের পড়া নিয়মিত অভ্যাস করা তাঁর ধাতে ছিলো না ; কিন্তু আশ্চর্য মেধা-গুণে তিনি পরীক্ষায় প্রথম কি দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রানীগঞ্জে সিয়ারসোল-রাজ হাই-স্কুলে ক্লাশ এইটে ভর্তি হন। সেই বছরই হাফিজ নূরুন্নবী সেই স্কুলে ফারসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যান ; তাঁরই আগ্রহে নজরুল সংস্কৃত ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে

ফারসী নেন এবং যথেষ্ট যত্ন করে ফারসী শেখেন। সে সময় নজরুল রায়-সাহেব এম. চ্যাটার্জির পুষ্পোত্থানের পাশে মাটির দেয়াল ঘেরা একটি ছোটো ঘরে আর চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে বাস করতেন। নজরুল ক্লাশের 'ফার্ষ্ট বয়্' ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এর আহার ছিলো ফ্রি, তদুপরি রাজবাড়ী থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। এই সাত টাকায় তাঁর চা-নাস্তা ও কাপড়-জামা হতো, এবং কোনো কোনো মাসে তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে তিনি তাঁর ছোটো ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

এই স্কুলে এসে নজরুল অনেকটা স্থির হলেন ; তাঁর বিদ্যানুশীলন ও কাব্যচর্চা দুই-ই চললো অনেকটা অব্যাহতভাবে ও অভিনিবেশ সহকারে। এই সময় রায়সাহেবের দৌহিত্র স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পড়তেন রানীগঞ্জ হাই-স্কুলে। নজরুলের উচ্ছল-প্রাণতা, উন্নত রুচি ও সহিষ্ণু-স্বভাব এতই আকর্ষণীয় ছিলো যে, সমবয়সী শৈলজানন্দ অচিরেই হয়ে উঠলেন নজরুলের একনিষ্ঠ সহচর। সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়েই উভয়ের সৌহার্দ্য গাঢ়তর হতে থাকে। নজরুলের তৎকালীন রচনা 'করুণ গাথা', 'বেদন বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখীর ছানা' যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন। সেই সুকুমার বয়সেই নজরুল বাংলার এই তিনটি মূল ছন্দ আয়ত্ত করে ফেলেছেন, এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) নজরুল ক্লাশ টেনের ছাত্র ; ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রাক্কালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, শহরের দেয়ালে দেয়ালে রকমারি প্রাচীর-পত্র এঁটে দিয়ে বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়েছে। নজরুল ও শৈলজানন্দ নাম লেখালেন ৪৯নং বাঙালী পল্টনে। বাৎসরিক পরীক্ষার পরই তাঁদের যাত্রা করতে হলো কলকাতায়। কিন্তু রিক্রুটিং-কালে দেখা গেলো, শৈলজানন্দের যুদ্ধ-গমনে পড়েছে

বাধা। এতে নজরুল মোটেই নিরুৎসাহ হলেন না, হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে লাহোর হয়ে গেলেন নৌশেরা। ট্রেনিং উপলক্ষে তিন মাস নৌশেরায় অবস্থান করলেন। অতঃপর গেলেন করাচী। করাচী বন্দরের পূর্ব-উপকণ্ঠে গানজা লাইনে (বর্তমান আবিসিনিয়া লাইনে) ছিলো সৈন্যদের ব্যারাক। তিনি সৈন্যদলে প্রভূত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে স্বল্পকাল-মধ্যেই 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সৈন্যদলের রসদ-ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছিলেন।

যুদ্ধে গিয়েও নজরুল কাব্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। নৌশেরা ও করাচীতে অবস্থান করে তাঁর কল্পনার সম্মুখে উদঘাটিত হয় বিশ্বের বিরাট দিগন্ত।

আপন ভোলা নজরুল

অখিল নিয়োগী

আমার সহপাঠী বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একদিন সিটি কলেজের ক্লাশরুমে ঢুকে উত্তেজিত কণ্ঠে কইলে, বাংলাদেশে এমন এক কবির আবির্ভাব ঘটছে, যাঁর কাব্য-প্রতিভা আর সব কবিকে ম্লান করে দেবে !

আমরা কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে পিছনের বেঞ্চে বসে সাহিত্য-চর্চা করি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কথা শুনে আমরা অনেকেই তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্য গগনে দীপ্যমান। কবি দু'একজন উঠ্‌ছেন বটে, কিন্তু এমন কাব্য-প্রতিভা কোথায় লুকিয়ে আছে, আমরা কেউ যার সন্ধান রাখি না ?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সেই অনাগত কবির একটি কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করে আমাদের শোনালো।

চমৎকার কণ্ঠ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই কবিতা-পাঠ শুনলাম।

কবির নাম—কাজি নজরুল ইসলাম। আর কবিতাটির নাম—বিদ্রোহী।

সত্যি, সেদিন মনে শিহরণ জেগেছিলো। মাঝে মাঝে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সেই নজরুল-কবির অপ্রকাশিত রচনা নকল করে নিয়ে এসে আমাদের শোনাতো। কবিতা এবং তার আবৃত্তি—দুই-ই আমাদের ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করে রেখে দিতো।

বেশ কিছুদিন পর এই নজরুল-কবির দর্শন মিল্‌লো পটুয়াটোলা লেনের 'কল্লোল' কার্যালয়ে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণই আমাদের পথটা বাত্‌লে দিয়েছিলো। ছোট্ট ঘর, কিন্তু দিলদরিয়া বিরাট-বিরাট প্রাণের আবির্ভাব ঘটে এখানে প্রতি সন্ধ্যায়।

গৃহস্বামী দীনেশরঞ্জন দাস। কিন্তু বন্ধুরা ডাকে D. R. বলে। আসলে সবাই বলে 'Dear'।

এইখানে দর্শন পাওয়া গেলো—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, ভূপতি চৌধুরী, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির।

ঝাঁকড়া-চুল নজরুল একদিন ঝঞ্ঝার মতো এসে উপস্থিত। আমি আর সুনির্মল বসু দুই বন্ধুতে একটু সকাল সকাল সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

কবি নজরুল হুঙ্কার দিয়ে হাঁক ছাড়লেন—'দে গরুর গা ধুইয়ে—'

আমরা তো কবিকে দেখে অবাক। ছোট্ট তক্তপোশের তলায় ছিলো একটি ভাঙা হারমোনিয়াম। সেটা টেনে বের করে কবি নজরুল চমক-মারা গলায় গান ধরলেন—

'কারার ওই লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ-দেবী।'

সমস্ত অন্তরে যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। সত্যি, আজকের দিনে, এমন মিয়োনো, ঝিমিয়ে-পড়া সমাজে এইভাবে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে তো গান কেউ শোনায় না!

সেইদিন কাজিদার সঙ্গে আলাপ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে 'তুই' বলে ডেকে—এই দিল্‌দরিয়া মানুষটি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আপনার করে নিলেন।

তারপর কতো সন্ধ্যায়, কতো উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে, কতো প্রসন্ন প্রত্যুষে কাজিদাকে সঙ্গীরূপে পেয়েছি। কতো সভা-সমিতিতে সঙ্গে গিয়ে গান শুনেছি। মনে হয়েছে—কাজিদা আমাদের কতো কালের চেনা মানুষ, কতো আপনার জন।

কিছুদিন বাদে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর মুরলীধর বসু—শিশির নিয়োগীর সাহচর্যে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের

দোতলায় 'কালি কলম' কাগজ প্রকাশ করে বসলো। সেখানেও তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দের সমভাবে আনাগোনা শুরু হয়ে গেলো। এখানে আমি ছোটো ছোটো লাইন ড্রইং 'কালি কলমের জন্য অনেক এঁকে দিয়েছিলাম। এখানে বসতো বারবেলা বৈঠক। কাজিদার গানে সেই বারবেলা বৈঠকও একেবারে জম্‌জমাটভাবে জমে যেতো।

কাজিদা যখন গান রচনা করতেন কে যেন ভিতর থেকে ঠেলা দিয়ে সুরগুলি আগ্নেয়গিরির্ লাভার মতো প্রচণ্ড আবেগে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে দিতো। তখন এই আপন ভোলা মানুষটি নাওয়া-খাওয়া একেবারে ভুলে যেতেন। গান লেখা আর সুর দেয়া ছাড়া তখন কবি নজরুলের অন্য কিছু করবার যো ছিলো না।

অনেক সময় রসিকতা করে বলতেন, আমায় যেন ভূতে খাটিয়ে নেয়।

চীৎপুরে এক সময় গ্রামোফোন রিহার্সাল রুম ছিলো। সেখানে একই আসনে বসে নতুন সঙ্গীত-রচনা, সেই সঙ্গীতে সুর সংযোজনা, আবার সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতীয় শিল্পীদের সেই সঙ্গীত শিখিয়ে দেয়া, সারাদিন ধরে চলতে থাকতো।

আত্মভোলা কবি নিজের নাওয়া-খাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে বসে থাকতেন। শুধু চা আর পান চলতো—সারা দিন ধরে। দিনশেষে বাড়ীতে গিয়ে শুধু একবার অন্ন গ্রহণ।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, কাজিদা এইভাবে দিনের পর দিন খাওয়া বর্জন করে চললে কি করে শরীর টিঁকবে?

কাজিদা শুধু আপন মনে হাসতেন, আর হারমোনিয়ামের রীড্ টিপে রাশি রাশি গানের কলি বের করতেন।

প্রথমে গুন্ গুন্ করে একটা সুর জাগতো মনে। ঠিক ভ্রমর গুঞ্জনের মতো।

তারপর অকস্মাৎ যেন জোয়ার জাগতো ছন্দে—আর মিলে। দেখতে দেখতে খাতার উপর একটি নিটোল কবিতা রূপলাভ করতো। কিন্তু সেটা কবিতা নয়। আস্ত একটি গান।

সুরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো সেই গান। কোন্ শিল্পীর কণ্ঠে রূপলাভ করবে সেই গান ?

কাজিদা যেন আপন মনেই সেই গানকে শুধোতেন—'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান, কোথায় রে তোর স্থান ?'

তারপর আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম—কোনো গান ইন্দুবালার কণ্ঠে, কোনো গান ধীরেন দাসের কণ্ঠে, আবার কোনো গান মৃণালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে অপরূপভাবে রূপলাভ করেছে।

কাজিদার পরশ পেয়ে যেন গানের কারখানা গড়ে উঠতো—গ্রামোফোন রিহার্সাল রুম। ··

কাজিদার সঙ্গে সভা-সমিতিতে যোগদান করতে গিয়ে দেখেছি, সবাই তাঁর গান শুন্‌তে উৎসুক। ফলে সভাপতির ভাষণ পরিত্যাগ করে তাঁকে গান ধরতে হতো—

'বসিয়া বিজনে কেনো একামনে ?
পাণিয়া ভরণে চললো গৌবি।
চলো জলে চলো, কাঁদে বনতল—
ডাকে ছল-ছল জল-লহরী॥'

নাট্যশালায় নজরুলের প্রবেশ কি করে ঘটলো—সেও এক বিচিত্র কাহিনী।

মনোমোহন থিয়েটারে শ্রীপ্রবোধ গুহ মশাই-এর ব্যবস্থাপনায় নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক অভিনীত হবে। কংসের চরিত্রটিকে রূপদান করা হয়েছে যেন অত্যাচারী বৃটিশরাজ। এই ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নীহারবালা একাই ছুটি ভূমিকায় রূপদান করেছেন—চন্দনা আর ধরিত্রী। নিপীড়িতা ধরিত্রীর গান কে রচনা করবেন এই নিয়ে এক মহা সমস্যা দাঁড়ালো। কারো নামই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় না। অবশেষে নাট্যকার মন্মথ রায় চিঠি লিখলেন কাজি নজরুল ইসলামকে।

আত্মভোলা। কাজিদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আপনার নাটকে গান না লিখ্‌লে আমার ক্ষোভের কারণ ঘটবে।'

সুযোগ পেয়ে প্রবোধচন্দ্র একদিন কাজিদাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন মনোমোহন থিয়েটারে। তারপর তাঁকে কৌশলে একটি কামরায় বন্দী করে ফেললেন। শিবাজীর মতো মোগল দরবারে কাজিদা বন্দী! বাইরে বেরুবার উপায় নেই। কামরার বাইরে থেকে জানানো হলো, খাদ্য, পানীয়, চা-পান সব জানলার ভেতর দিয়ে যথাসময়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু 'কারাগার' নাটকের গান আর সুর শেষ না হলে এই মনোমোহনের কারাগার থেকে মুক্তি নেই।

কাজিদা সেই বন্দী অবস্থায় ঝর্ণা ধারার মতো গানের বন্যা বইয়ে দিলেন।

আমরা বাইরে থেকে বিস্ময়ে গান শুনি, সুর শুনি আর অবাক হয়ে ভাবি, এ যে নতুন করে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ। এইভাবে গান রচিত হল—

'বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা'
'কারার পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ'
'তিমির বিদারি অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ'
'নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি—'

এক-একটা গানে সুর হয় আর নীহারবালা নিজকণ্ঠে তাকে ধরে রাখেন। কাজিদাকে তো আর চিরকাল এখানে বন্দী করে রাখা যাবে না! তিনি সাময়িক ভাবে স্নেহের কারাগারে বন্দী।

এই সময়ে প্রতি সন্ধ্যায় আসতেন—চারু রায়, যামিনী রায়, প্রভাত গাঙ্গুলী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শচীন সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, অনাদি বসু (অরোরা ফিল্ম কোম্পানীর স্রষ্টা) প্রভৃতি, আর আমরাও ফরাসের এককোণে ঠাঁই করে নিতাম।

প্রবোধচন্দ্র নিজের হাতে চপ, কাটলেট, ডেভিল ভেজে মনের আনন্দে সবাইকার মধ্যে বিতরণ করতেন। আর ডিবে খুলে পান জোগাতেন অনাদি বসু মশাই। সে যেন এক আনন্দের হাট বসে যেত।···

কাজিদা আমার হাতের ছবি আঁকাও খুব পছন্দ করতেন। এক সময় তাঁর অনেক বইয়ের প্রচ্ছদপট আমি এঁকে দিয়েছি। কাজিদার নতুন বই বের হবার পরিকল্পনা হলেই প্রকাশককে বলতেন, 'যাও—অখিলের কাছে চলে যাও, সে আমার মনোমত কভার এঁকে দেবে।'

অনেক স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। একবার বাঙলা দেশের এক প্রকাশক কাজিদাকে দার্জ্জিলিং পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে নিরিবিলি বসে হজরত মহম্মদের জীবনী কবিতাতে রচনা করতে হবে। এই সময় মন্মথ রায় আর আমিও একদল বন্ধুর সঙ্গে দার্জ্জিলিং গিয়ে হাজির হলাম। কবিতা রচনার খাতা কোথায় পড়ে রইলো। কাজিদা আমাদের পেয়ে খুব খুশী। একেবারে যাকে বলে নরক গুল্‌জার হয়ে উঠলো। আবার ওখানে থাকতে থাকতে খবর পাওয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং বেড়াতে এসেছেন।

যাকে বলে একেবারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ। কাজিদাকে সেনাপতি করে আমরা একদিন ভোরে উঠে কবির দরজায় হানা দিলাম।···

যথা সময়ে আমরা তো গিয়ে হাজির হলাম। কাজিদার নাম শুনে কবি তাঁর সকাল বেলাকার রচনা ফেলে আমাদের সঙ্গে মজ্‌লিশে বসে গেলেন। আলাপে, আলোচনায়, গানে, সরস কৌতুকে আমাদের একেবারে মাতিয়ে রাখলেন। আমরা শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে লাগলাম।···

রবীন্দ্রনাথ কাজিকে পেয়ে নানা ধরণের আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন। বর্তমানে বাঙলা নাটকে কি রকম গান চলছে? কাজি আজকাল কি জাতীয় গান লিখছে, অন্যান্য দেশের মঞ্চের গানের

কথাও আলোচিত হলো। কবি কাজিকে শান্তিনিকেতন যেতে বললেন।

সেই বছর কবির সত্তর বছর পূর্ণ হলো। আমি রবীন্দ্রনাথের নামে একটি ছোটদের বই উৎসর্গ করেছিলাম। প্রণাম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি উল্টে উল্টে বইয়ের ছবিগুলি দেখলেন। কাজিদা বলে দিলেন, ছবিগুলোও আমার আঁকা। তখন তিনি খুব প্রশংসা করলেন, আর শান্তিনিকেতন গিয়ে বইখানি পড়বেন, সে কথা জানালেন।

হঠাৎ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে ঢুকে বললেন, বাবামশায়ের খাওয়ার দেরী হয়ে যাচ্ছে—

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই চম্‌কে উঠলাম! কখন যে বারোটা বেজে গেছে কেউ টের পাইনি। সবাই লজ্জিত হলাম আমরা।

কবির পদধূলি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম।

দার্জ্জিলিঙে কাজিদা যে কাজে গিয়েছিলেন—তা এক লাইনও এগুলো না! আমাদের নিয়ে তাঁর শুধু ভ্রমণ চলতো। রাস্তায় বেরিয়েই তিনি ট্যাক্সি ডেকে নিতেন, তারপর চলতো লম্বা সফর—

প্রকাশক ভদ্রলোক খুবই বিরক্ত হলেন আমাদের ওপর। কিন্তু কাজিদা একেবারে নির্বিকার।

কাজিদা যে হোটেলে উঠেছিলেন, তার নাম ছিল হিন্দু বোর্ডিং। এ নিয়েও আমাদের রসিকতার অন্ত ছিল না।

এই সময়ে নাট্যনিকেতনের দলবল নিয়ে প্রবোধচন্দ্র গুহ দার্জিলিং এসে হাজির হলেন। সঙ্গে ছিলেন নীহারবালা। কাজেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজিদা ও নীহারবালার মধু-কণ্ঠের সঙ্গীতে আমরা অবগাহন করতে লাগলাম। আর প্রকাশক মশাই রাগে কেবলি কেশর ফোলাতে লাগলেন।

অবশেষে ফিরে আসাই সাব্যস্ত হলো।

কাজিদা এক সময় কলকাতায় একটি গ্রামোফোনের দোকান খুলে ছিলেন। বেশ ভালোই চলতো সে দোকান। আপনভোলা কাজিদার ভালো মানষীর সুযোগ নিয়ে অনেক বন্ধু কাজিদার কাছ থেকে এই সময় টাকা ধার নিতো, কিন্তু আর কখনো ফেরত দিত না। কাজিদাও কারো কাছে সেই টাকা চাইতে পারতেন না।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন দিল দরিয়া। যখন পকেটে টাকা থাকতো—তখন নজরুলই বা কে—আর দিল্লীর বাদ্শাই বা কে?

ট্যাক্সি ছাড়া তিনি এক পা-ও চল্তে চাইতেন না,—এ তো আমরা নিত্য চোখের ওপর দেখেছি।

ডি, এম, লাইব্রেরীর গোপালদার [শ্রীগোপালদাস মজুমদার] মেসের পাশের ঘরে আমি থাকতাম। কাজিদা অনেক রাত পর্যন্ত সেই ঘরে দাবা খেলতেন। কখনো কখনো চ্যাচামেচিও হতো।

আমি গিয়ে বলতাম, কাজিদা, আমাদের ঘুমুতে দেবেন না?

কাজিদা শুধু হো-হো করে হাসতেন। এই আপনভোলা মানুষটির ওপর রাগ করেও সুখ নেই!

তখন গ্রামোফোনের রিহার্সেল রুম নলিন সরকার ষ্ট্রীটে।

একদিন বসে বসে কাজিদার গান শুনছি—হঠাৎ একদল তরুণ এসে হাজির। তারা কাজিদার জন্মোৎসব করবে—কাজিদাকে রাজি করাতে এসেছে!

কিন্তু কাজিদা যেতে মোটেই রাজি নন। ওরাও না-ছোড়বান্দা।

তখন কাজিদা রেগে উঠে বললেন, তোমরা যে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সভার মধ্যে বসিয়ে রাশি রাশি মিথ্যা প্রশংসা আমার কানে ঢেলে দেবে,—তাতে আমি আদৌ রাজি নই!

ছেলের দল ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলো। আমি বললাম, কাজিদা, একবার গেলেই হতো। ওরা খুব দুঃখিত হয়ে চলে গেলো!

কাজিদা বললেন, আরে জন্মদিন পালন করতে চাস তো' রবীন্দ্রনাথের কর। আমাকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি কেন বাপু?

নিজের নাম প্রচারে একেবারে বিমুখ ছিলেন নজরুল অট্টহাসি দিয়ে সব কিছু উড়িয়ে দিতে চাইতেন!

শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনায় এই নজরুলকেই আবার অন্য রূপে দেখেছিলাম।

বেহালায় স্বরেন বায় মশায়ের বাড়ীতে বিরাট ভোজ সভার আয়োজন হয়েছে। বাঙলা দেশেব বহু সাহিত্যিক নিমন্ত্রত হয়েছেন।

সঙ্গীত পবিবেশন কববেন দিলীপকুমার রায়, আর কাজিদা।

শরৎ-সন্ধ্যায় শবৎচন্দ্রকে কেন্দ্র কবে সাহিত্যিকবৃন্দেব বিবাট মজলিশ জমে উঠলো।···কাজিদা নতুন গান রচনা কবেছেন। কণ্ঠে সেই গান ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

'কোন শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ
আসিলে এ ধবাতল ?'

একবার নজরুল, একবার দিলীপ রায়।

গানে গানে সেই স্মবণীয় শবৎ-সন্ধ্যা মধুময় হয়ে উঠলো।

এতদিন এতভাবে কাজিদার সঙ্গে মিশেছি—, কিন্তু তাঁকে কখনো কাবো নিন্দে করতে শুনিনি।

সাহিত্যিকবা নাকি একে অপবেব প্রশংসা সহ্য করতে পাবেন না। কিন্তু কাজিদা এই সব গ্লানি ও কালিমা মুক্ত মানুষ। চিরদিন হাসি দিয়ে অতি বড় দুঃখকে জয় করে গেছেন।

নজরুল ইসলামের কবিতায় আছে—

'হিন্দু না ওই মুশলিম তাই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডাবী শোনে, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

এইটেই হচ্ছে কাজিদার মনের কথা। তাঁর অন্তর-বাহির চিরকাল সূর্যের কিরণের মতো ঝল্‌মল্ করেছে।

এই সদানন্দময় আপনভোলা কবিকে বাঙলা দেশ কি কখনো ভুলতে পারবে?

গিরিবালা

মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রদ্ধের মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের রচিত 'নজরুল-জীবনী' খানা কল্যাণীয় কাজী সব্যসাচী আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন -বইখানি আদ্যপ্রান্ত প্রায় এক নাগাড়ে পড়ে ফেললাম—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে নিরুত্তাপ যুক্তিপ্রবণ এই রচনা কিন্তু আমার মনে গভীর বিস্ময় ও আবেগ সঞ্চারিত করলো। এই বিস্ময় কবি নজরুলের সৃষ্টি শক্তির অপূর্বতায় নয়, যা আমাদের পূর্বেই জানা, এই বিস্ময় নজরুলের জীবনে এক অভূতপূর্ব আবির্ভাব তাঁর শশ্রুমাতা গিরিবালা দেবীর কাহিনীতে। এই মহিমাময়ী নারী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান লাভের যোগ্য—কিন্তু ক'জন বা তাঁর কথা জানে। গিরিবালা দেবী বৈদ্য জাতি সম্ভূতা। আমাদের বাল্যকালে বৈদ্যরা খুব সংঘবদ্ধ ছোট সম্প্রদায় বলা চলতো, কিছু-না-কিছু আত্মীয়তা পরস্পরকে যুক্ত রাখতো : আমার কোনো আত্মীয়া এঁদেও সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে প্রমীলা দেবীর বিবাহের রোমান্সের গল্প শুনেছিলাম—শুনেছিলাম সমাজে সেজন্য তাঁর মাতাও নির্যাতিতা হয়েছিলেন। কিন্তু রোমান্সের রঙীন দিকটিই তাঁর বক্তব্যেও মধ্যে প্রাধান্য পাওয়ায় অন্যদিকটি তেমন করে ভেবে দেখিনি। সে বয়সও তখন নয়।

উল্লেখিত জীবনী-গ্রন্থে একটি সুগ্রথিত ছবি পাওয়া গেল। আজ থেকে ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার পক্ষে এযে কতদূর বৈপ্লবিক কর্ম তা বোধ হয় আজকের যুগে বসে অনুমান করা যায় না। যদি প্রমীলা দেবী সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের মতামত অগ্রাহ্য করে কবিকে বিবাহ করে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে চলে যেতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, যৌবনের আবেগ প্রেমের প্রবলতা বহু

মানুষকেই যুগে যুগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি দিয়ে থাকে। প্রেমের আহ্বানের অনিবার্যতার মুখে ভেসে যায় মানুষের মনগড়া বাধা, যৌবনের আহ্বান সমাজের মুখে তুড়ি মেরে বলতে পারে 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, তুমি কি এমন শক্তিমান?'

কিন্তু গিরিবালা দেবীর মাতৃস্নেহ—সে কি করে এমন সর্ববাধা-বিজয়ী অজেয় শক্তি লাভ করলো, চিরন্তন মানব ধর্মে কোন গভীর বিশ্বাস এই শত বাধা কণ্টকিত সঙ্কীর্ণ হিন্দু সমাজের পল্লী পরিবেশের মধ্যে তাঁর চিত্তের গহনে চির জাগ্রত ছিল, যা নজরুলের কবি মানসকে সর্ব জাতি সম্প্রদায়ের উর্ধে তুলে দেখতে পেরেছিলো?

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি গোরার আনন্দময়ী কল্পিত চরিত্র, একমাত্র সেই কল্পনার সঙ্গেই যেন তাঁর তুলনা মেলে, জানি না রবীন্দ্রনাথ এই মহিমাময়ী নারীর কোনো সংবাদ জানতেন কি না, জানলে অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যেতেন।

গিরিবালা দেবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজ সমাজ পরিত্যাগ করে আসেন নাই, তাঁর আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম বিশ্বাসও পরিবর্তিত হয় নাই। একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে ভাসুরের সংসার ত্যাগ করে এলেন কলকাতায়, কোন সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে এই উদ্দাম বিদ্রোহী কবির সংসারে পাবেন না, এ সংসার যে তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ধারণ করে রাখতে হবে এ তাঁর অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিসেব জোরে তিনি দুই সমাজের তীব্র প্রতিকূলতার মুখে অটল থেকে তাঁর কন্যা জামাতার সংসার সাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন তা জানি না। যখন কন্যা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন, জামাতা জ্ঞান হারালেন, তখন এই দুই রুগীর সমস্ত পরিচর্যা ও সন্তানগুলির দায়িত্ব তিনিই বহন করে চলেছিলেন। হিন্দু সমাজ ভ্রূকুটি করেছে কিন্তু মুসলমান জামাতার সমস্ত সেবা নিজ হাতে করে তিনি নিজের পুজার্চনা ও স্বপাক আহার ইত্যাদি চালিয়ে গেছেন। আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে মানবধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, মানবতা

যে এ সমস্তর উর্ধ্বে, তা কোনও যুক্তিতর্ক ও দর্শন শাস্ত্র দিয়ে না বুঝলেও যে অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায় তা এমন সব জীবন না থাকলে বিশ্বাস হত না। এই জীবনখানি তাই একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

গোঁড়া মুসলমান সমাজ যখন রাজনৈতিক দলাদলিকে আশ্রয় করে উগ্র হয়ে উঠেছিল তারা নজরুলের গৃহে হিন্দু আচার নিরত এই হিন্দু মাতার প্রভাব সহ্য করতে পারে নাই, তাঁর নামে নানাভাবে নিন্দা রটিয়েছে। তারপর এল ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, সেই ভয়াবহ দাঙ্গা তিনি চোখে দেখলেন, শুনেছি তাঁদের পাড়ার হত্যাকাণ্ডে তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি।

এই দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই কাউকে কিছু না বলে একদিন এই মহিয়সী নারী গৃহত্যাগ করে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর সন্ধান পায় নাই। তিনি কি অকৃতকার্যতার বেদনা নিয়ে গেলেন, সারা জীবন দিয়ে যে সত্য তিনি অনুভব করেছিলেন, সেই মানব ঐক্যের রূপ কি তার চোখের সামনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল? না অতি প্রিয় জামাতার এই নিদারুণ ব্যাধির দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না—তা জানা যায় না। নজরুল জীবনীকারও সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত দেন নাই। তা ছাড়া এই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণ ও তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে যে এক দুর্জ্ঞেয় গভীরতা রয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

কবি নজরুলের ভাবনায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির দুই ধারা যে গভীর ভাবসঙ্গমে মিশে ছিলো তা হয়তো গিরিবালা দেবী ও তাঁর বড় জা বিরজাসুন্দরী দেবী, যাঁকে নজরুল 'মা' বলতেন, তাঁদের স্নেহ না পলে এত সত্য হতোনা। তা হয়তো মূল হারা আশ্রয়হীন হয়ে যেতো।

হিন্দু মুসলমান উভয়ে একদেশের মানুষ হয়েও তীব্র বিরুদ্ধতা

ধর্ম নিয়ে রয়ে গেছে এবং বার বার নানা কারণে তা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত করে আনেন।...যে সব উদার চিত্তে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ-ধারা মিলিত হতে পেরেছে সেই সব চিত্তে, সেই ধর্ম সঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত, রামানন্দ। কবীর, দাদু রবিদাস নানক প্রভৃতিব চরিত্রে এই সব তীর্থ চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল।'

এই একটি নামের সঙ্গে আরও বহু নামও যোগ করা যায়, ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে রইলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নামও হবে গাঁথা।

কিন্তু গিরিবালা দেবীর সমগ্র জীবনখানির মধ্যে যে মানব ঐক্যের জয়বার্তা বেজে ছিল তা কারু মনে থাকবে না।

এ সেই চির অনাদৃত উপেক্ষিত বাঙালী মেয়ের জীবন যা মরুভূমির মধ্যে রস সঞ্চার করে মরুকে করে উর্বর কিন্তু তার সকল বিশেষ পরিচয় যায় লুপ্ত হয়ে। ইতিহাস যাহাদের ভোলে অনায়াসে — সভাঘরে যাহাদের স্থান নাই।

যে অশান্ত আর আদম্য প্রাণশক্তি কাজী সাহেবকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছিলো সেই একই অস্থিরতা আর প্রাণপ্রাচুর্য তাঁকে সুরের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। তাঁর ভিতর সুরবোধ ছিলো সহজাত। সহজাত সুরবোধ যাঁর আছে, এমন কবির পক্ষে কাব্য-জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সঙ্গীত অনুশীলনে আত্মনিয়োগ অবধারিত। কাজী সাহেবের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। তিনি কাব্য এবং সঙ্গীত উভয়ত্র স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে বিচরণ করেছেন।···

কাজী সাহেবের কবি-প্রকৃতির দুই দিক—প্রথমতঃ তিনি নির্যাতিত শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় দরদ প্রকাশ করে বাংলা কবিতার প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি···কৃত্রিম বিধিনিষেধ আর অনুশাসনের নিগড় ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রবৃত্তির একটা প্রচণ্ড উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায়।···

কাব্যজীবনের একটি বিশেষ পর্বে এসে কবি আর বাণীরূপেই শুধু তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তিনি সুররূপের ধ্যানেও নিবিষ্ট হলেন। কবি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন। সুররূপী নর্মবাঁশীর লীলা তাঁর মন কেড়ে নিলো। সে বাঁশীর সুর যে পরবর্তী অধ্যায়ে কতো বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে তা কবি রচিত অজস্র গানের শ্রেণী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এতো বেশি সংখ্যক গান [কাজী নজরুল ইসলাম সবশুদ্ধ আনুমানিক তিন হাজার গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে এইটেই বোধহয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার।] আর এত বিচিত্র ঢঙের গান বাংলা দেশের অন্য কোনো সুরকার

আজ পর্যন্ত রচনা করেন নি। এ থেকে এই কথা এক প্রকার বিনা দ্বিধায়ই বলা চলে যে, সঙ্গীত আর কবিতার মধ্যে সঙ্গীতই নজরুলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিক সহায়ক ছিলো, তাঁর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত-তর মাধ্যম ছিলো। সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌথচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ-প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস, গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যেও এ সকল ভাবেরই প্রধান্য, তবে সঙ্গীতে সে প্রকাশ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে সংসাধিত হয়েছে সে-কথা বলা দরকার। কেন না এ ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে—সুর-সৌন্দর্য। বাণী আর সুরে মিলে কাজী নজরুলের অদম্য প্রাণের আবেগ চমৎকার এক সুসমঞ্জস শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নজরুল সঙ্গীতজীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ জিনিস একেবারেই অভিনব।···

উর্দুতে এই ধরনেব গান অনেক আছে। উর্দু কবি গালিবের একাধিক গজল রচনা বিদ্যমান। নজরুল গজল গান বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করেন। এক সময় বাংলার আকাশে-বাতাসে নজরুলের গজল গান ভেসে বেড়িয়েছে।···আজ অবশ্য সে-সব গান কারও মুখে শোনা যায় না, তবে এক সময়ে মুটে-মজুর, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখেও এই সকল গানের কলি সদাসর্বদা সঞ্চরণ করে ফিরেছে। এ থেকেই গানগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল,'
'আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী,'
'চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না ওই নয়ন পানে,'
'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে,'
'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়,'
'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখিজল,'

প্রভৃতি তাঁর বহু খ্যাত গানগুলির কয়েকটির প্রথম পদ। এ সকল গান এক সময়ে দিলীপকুমার রায়, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়কগণ জনসমাজে প্রচার করেছেন।

বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুক্তি-সংগ্রামের অধ্যায়ে নজরুল রচিত 'কোরাস' গান যৌথ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান যোজনা। অত্যাচারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ গণমানবের প্রতিরোধ-স্পৃহা আর সংগ্রাম-চেতনা এই সকল কোরাস গানের দ্বারা যে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলো তা বলে বোঝানো যায় না। নজরুলের আগেও অবশ্য বাংলায় কোরাস গান রচিত হয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-গীতিকারগণ কোরাস গান রচনা করেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে নজরুলের দানও বড়ো কম নয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কোরাস 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানের সত্যিই তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটি বাংলা দেশের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত। এ গানটি কবি, সুভাষচন্দ্রের দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ উপলক্ষের জন্য রচনা করেছিলেন, তাঁর সে রচনা সর্বাঙ্গ সার্থক হয়েছিলো। তা ছাড়া কোরাস গানের একটি বিশেষ ধারা—'মার্চ সঙ্গীত'—এ গানে নজরুলের জুড়ি নেই। নজরুলের মার্চ সঙ্গীত, যথা 'ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল' ইত্যাদি, কিংবা 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে' ইত্যাদি গান কে না শুনেছেন?

কাজী সাহেব নানা শ্রেণীর আর নানান ধরনের গান রচনা করেছিলেন। এই সব গানের মধ্যে আছে—ইসলামী সঙ্গীত, নবীর গান, ছাদ্‌-পেটানো গান, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, লাউনি, গীত, আরবী সঙ্গীত, দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপের গান, চীনা সঙ্গীত; কতো নাম করবো। এ ছাড়া শেষ বয়সে তিনি অধ্যাত্মভাবের প্রেরণায় শ্যামাসঙ্গীত আর কীর্তনও অনেক রচনা করেছেন।

তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কীর্তনের পদ—

'আমি কী সুখে লো গৃহে রব,
আমার শ্যাম যদি ওগো যোগী হলো
সখি আমিও যোগিণী হবো।' ইত্যাদি

সাঙ্গীতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি আর এক ধরনের সঙ্গীত রচনায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—লুপ্ত বা অর্ধ-লুপ্ত রাগিণীব অবলম্বনে বাংলা গান সংগঠন। এগুলি প্রধানতঃ খেয়ালের আঙ্গিকে রচিত। এইরূপ দুইটি গানের পদ—'গুঞ্জ মালা দোলে কুঞ্জে এসো হে কালা' (মালগুঞ্জ); 'পার্থসাবথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য তব শঙ্খ' (শিবব উজনী)। হিন্দী গান ভেঙে বাংলা গান বচনাব দৃষ্টান্তঃ 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া' (ঠুংরী খাম্বাজ)।

চিৎপুরের বিষ্ণুভবনে ছিলো আমাদের গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘর। কাজীদা ছিলেন আমাদের বাংলা গানের ট্রেনার। কাজীদার ঘরে থাকতো সদা সর্বদাই নানা লোকের ভীড়। কাজের লোকই শুধু নয়, নানান অকাজের লোকও এসে ভীড় জমাতো। তা এজন্য তাঁকে বিরক্ত হতে কোনদিন দেখিনি।

একদিন তাঁর ঘরে লোকজনের ভীড় ছিলো কম। কাজীদা তাঁর প্রিয় পান আর জর্দার কৌটো সামনে নিয়ে বসেছিলেন। মুখে এক-মুখ পান। সামনে খোলা গানের খাতা।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব কায়দায় হা হা করে হেসে উঠলেন। এমন হাসি যা আমার মনে হয়েছে কাজীদা ছাড়া আর কেউ হাসতে পারবেন না কোনদিন।. হাসতে হাসতে বললেন, 'আয় ইন্দু, বোস্।' তারপর আমি তাঁর পাশটিতে বসতেই বললেন, 'আচ্ছা, তোর ঐ অঞ্জলি লহো মোর সঙ্গীতে'—এর উল্টোপিঠের গানটা কি লিখি বল্‌তো?'

আমি চট্ করে কোনো জবাব দিলাম না। কাজীদা মহান কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তাঁর এ-কথার জবাব দিতে যাওয়া আমার মতো মানুষের পক্ষে মুর্খামী ছাড়া আর কি?

তাই একটুখানি চুপ করে থেকে শুধু বললাম, 'কাজীদা, এই গানটার সঙ্গে ঐ নতুন গানটাও যেন খুব ভালো হয়।'

কাজীদা আবার হা হা করে সারা ঘর হাসিতে ভরিয়ে তুলে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়া, চুপটি করে বোস্।' বলে এক মুখ পান ঠেসে খস্ খস্ করে কাগজে লিখে দিলেন সেই আমার গাওয়া বিখ্যাত গানটি—'দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে'।

কাজীদা এতো বড়ো ছিলেন, এতো মহান্ ছিলেন, তবু তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতেন। এমন কি, যে গানের জন্য তাঁর এতো খ্যাতি, এতো দেশজোড়া নাম, সেই গানের বাণী তৈরীর সময়েও তিনি জিজ্ঞেস করতেন আমাদের মতামত।

কাজীদার একটি জিনিস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই হতো। রিহার্সাল ঘরে খুব হৈ হুল্লোড় চলছে, নানা জনে করছে নানা রকম আলোচনা। কাজীদাও সকলেব সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করছেন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একধারে সবে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে বইলেন খানিক। অনেকে তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করলো না হয়তো। কাজীদার সেদিকে খেয়াল নেই। এতো গোলমালের মধ্যেও তিনি একটুক্ষণ ভেবে নিয়েই কাগজ কলম টেনে নিলেন। তারপর খস্ খস্ করে লিখে চললেন আপনমনে।

মাত্র আধঘণ্টা। কি তারও কম সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ'খানি গান লিখে পাঁচ-ছ'জনের হাতে হাতে বিলি করে দিলেন। যেন মাথার মধ্যে তাঁর গানগুলি সাজানোই ছিলো, কাগজ-কলম নিয়ে সেগুলো লিখে ফেলতেই যা দেরী!

কাজিদা এইরকম ভীড়ের মধ্যে, আর অল্প সময়ের মধ্যে এমন স্থন্দর গান লিখতে পারতেন।

আব শুধু কি এই?

সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সেই পাঁচ-ছ'জনকে সেই নতুন গান শিখিয়ে দিয়ে তবে রেহাই দিলেন তিনি। গান লেখার সাথে সাথে স্থরও তৈরী করে ফেলতেন কাজীদা। অপর্ব সব সুর।—যার তুলনা হয় না।

কাজীদা ছিলেন স্থরের রাজা।

কাজীদা'-র কথা

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

বাংলা গানে গজল সুবের প্রথম আমদানী করেন নজরুল ইসলাম, যুদ্ধ থেকে ফিবে এসে। প্রথম গান—'কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'। তারপব দেশে আসে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। কবি লিখে চলেন—'ঘোর ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'।

এই গানগুলি লেখার পর বাইবে যখন তাঁব যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো তখন হলো কবির সাথে আমার প্রথম পবিচয়। কুচবিহার কলেজের ছাত্র আমি, স্কুলে-কলেজে মিলে প্রতি বৎসর মিলাদ করতাম। সেই মিলাদ মহ্‌ফিলে কবিকে আমন্ত্রণ করি। সেই থেকে পবিচয়েব সূত্রপাত। তিনি আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহ দিলেন, বললেন, 'সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, কলকাতায় চলো, তোমার গান রেকর্ড করা হবে।'

১৯৩০ সনে প্রথম গান রেকর্ড করে কুচবিহারে চলে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতায় যাই এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল-ঘর তখন চিৎপুর রোডে। শুনলাম কাজী সাহেব সেখানে রোজই যান। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজী সাহেব কোথায় ?' তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে গান লিখছেন।' আমি ঢুকলাম। তিনি মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে ? বস বস বস।' সর্বনাশ, এই কি কাজী সাহেব। চেহাবায় কি পরিবর্তন ! এক বৎসর আগে কুচবিহারে যে কাজী সাহেবকে দেখেছি তিনি যে এমনভাবে বদলে যেতে পারেন স্বপ্নেও ভাবিনি। তখন ছিলো ইয়া বড় গোঁফ, দোহারা চেহারা, মাথায় ঢেউ খেলানো বাব্‌রী। তবে মাথার চুল ঠিকই

আছে—গোঁফজোড়া অদৃশ্য হয়েছে আর বপুখানি হয়েছে নাদুস নুদুস। চোখে আগে জ্বলতো বিদ্রোহের আগুন, এখন সেখানে এসেছে শ্রাবণের ঢল। সামনে এগিয়ে গিয়ে কদমবুছি করলাম। তিনি বললেন, 'সবাই আমাকে কাজী সাহেব বলে, তুমি কিন্তু কাজীদা বলে ডাকবে আমাকে। হ্যাঁ, তোমার জন্যে গান লিখতে হয়। আচ্ছা, ঠিক হবে।'

'আচ্ছা ঠিক হবে' তো বললেন, কিন্তু যতবারই যাই গ্রামোফোন ক্লাবে ততবারই দেখি তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অনেকে। আমি সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারি না। পাশের ঘরে পিয়ারু কাওয়াল রিহার্সাল দিচ্ছেন উর্দু কাওয়লী গানের। বাজারে সে-সব গানের কী বিক্রী! আমি কাজীদাকে বললাম, 'এমনিভাবে বাংলা কাওয়ালী গান লিখে দিতে পারেন আমার জন্যে?' গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙালী সাহেব বললেন, 'না না, ও ধরনের বাংলা গান বিক্রী হবে না।' অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজী হলেন. কাজীদাকে বললাম, 'সাহেব রাজী হয়েছেন।' কাজীদা তখুনি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বললেন, 'কিছু পান নিয়ে এসো।' পান নিয়ে এলাম ঠোঙা ভর্তি করে। তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাক।' ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' সুর-সংযোগ করে তখুনি শিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, 'কাল এসো, রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার জন্যে আর একখানা লিখে দেবো।' পরদিন লিখলেন 'ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।' রেকর্ড করলাম চারদিন পরে। সে গান বাংলার আকাশে-বাতাসে তুললো এক নব আলোড়ন। তারপর লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।

দু-তিন বৎসর পরে। একদিন রিহার্সাল রুমে বসে একাকী আমাদের দেশের একখানা পল্লী গান ভাওয়াইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে যে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিলেন, টের

পাইনি। গান শেষ করা মাত্র তিনি ঢুকে বললেন, 'আহা, কী সুন্দর কী মিষ্টি সুর! আব্বাস, গাও—আর একবার গাও তো।' আমি গাইলাম :

'নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া।'

কাজীদা বললেন, 'গাও, আবার গাও।' পাঁচ-ছ'বার গাইলাম তিনি বললেন, 'আচ্ছা, চুপ করে বসো।' তিনি কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসলেন। ১০ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো তো, তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায়নি?' আমি তাঁর লেখা গান গাইলাম :

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।'

এর পর তিনি ভাওয়াইয়া গান শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। গান গাইতে গাইতে গলা ভাঙার মাধুর্যে তিনি আত্মহারা হয়ে 'আহা-আহা' করে উঠতেন। আর একটা গান লেখার কথা মনে পড়ছে। আমি একদিন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম :

'তেরষা নদীর পারে পারে ও
দিদি লো মান্‌সাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও।'

কাজীদা সেই সুরে লিখলেন :

'পদ্মদিঘীর ধারে ধারে ও'

ভাওয়াইয়া সুরে লিখলেন :

'কুচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ,
আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ।'

পল্লী-সঙ্গীত লেখার অনুপ্রেরণা তিনি এইভাবে পেলেন
আমার জন্য আট-দশখানা পল্লী-সঙ্গীত লিখেছিলেন ; তার
রইলো 'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে আম-কুড়োনো খেলা
জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই', 'ওরে কে বলে আররে নদী নাই', 'আরে ও দারিয়ার মাঝি, মোরে নিয়ে যা রে মদিনা' এবং 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়, আমি কি তায় ভয় করি ।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ । একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজীদা এবং আরো অনেকে মিলে জোর আড্ডা বসে গেছে । আমি গেলাম। কিছুক্ষণ পরে খুব ঘটা করে মেঘ এলো, এলো বাদল । কাজীদা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন । কখন যেন কাগজ কলম ধরেছেন । আধ ঘণ্টা পরে হারমোনিয়ামটি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে শুরু করলেন । আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন, বললেন, 'নাও, সুরটা তুলে নাও—বর্ষা আসছে, বর্ষার আবাহন-গীতি লিখলাম ।' গান হলো :

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা
এস মালবিকা ।
অর্জুনমঞ্জরী কর্ণে
গলে নীপ মালিকা ।
মালবিকা ।।'

কাজীদার বাড়ীতে একদিন বসে আছি । কারমাইকেল হোষ্টেল থেকে চার-পাঁচজন ছাত্র এসে কাজীদাকে বললেন, 'কাজী সাহেব, আমাদের হোষ্টেলে আসছেন তুরস্ক থেকে হালিদা এদিব হানুম, তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো, আপনাকে সভাপতি হতে হবে ।' কাজীদা বললেন, 'আচ্ছা যাবো, আপনারা যান ।' ছেলেরা চলে গেলো । কাজীদা আমাকে বললেন, 'জানো আব্বাস, এই হালিদা এদিব হচ্ছেন তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতী । এঁর অভ্যর্থনা-সভায় নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু । ওরা তোমাকে বললো না, হয়তো চেনে না, কিন্তু আমি বলছি—নিশ্চয়ই যাবে ।' আমি বললাম, 'কাজীদা, যাবো নিশ্চয়ই

কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কবিতার সওগাত নিয়ে, আমি কী নিয়ে যাবো ?' তিনি বললেন, 'ওঃ—আচ্ছা।' তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। কী অপূর্ব গানই না লিখে দিলেন ! বললেন, 'এ গানে তুমি নিজে সুর দেবে।' গান তো নিয়ে এলাম। কাজীদার গানে আমি সুর দেবো, এতোবড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। অথচ তাঁর আদেশ। বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসায় এলো ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর ছেলে মরহুম আবদুল করীম খাঁ ওরফে বালী। বললাম, 'ভাই, উদ্ধার করো—এ যে বিরাট পরীক্ষা ; কাজীদার গান, আমাকে সুর দিতে বলেছেন।' বালী প্রথম স্তবকে সুর সংযোগ করলো, তারপর বললো, 'এইভাবে করতে থাকো।' পরদিন সমস্ত গানটা যখন গেয়ে শোনালাম, কাজীদা মহা খুশী। গানটা হচ্ছে : 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী।'

মুসলমানদের এক একটা পর্ব আসতো আর আমি কাজীদাকে অনুরোধ করতাম, 'কাজীদা, মোহররম মাস আসছে, মর্সিয়া লিখে দিন।' তিনি লিখেছেন, 'মোহরর্‌মের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়', 'ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি', ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে অঝোর নয়নে রে।' আসে ফাতেহা-দোহাজদাহাম ; কবি লেখেন :

'নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান,
শুনি সে তক্‌বীরের ধ্বনি আকুল হল মনপ্রাণ।
বাহিরে হেরিনু আসি বেহেশ্‌তী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমীন ও আসমান ;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশতা হুর গেলেমান—
এলো কে—কে এলো ভূলোকে
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।'

জাকাত সম্বন্ধে কবিকে লিখতে বলেছি ; তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিয়েছেন :

'দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত—
তোর দিল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।'

হজ সম্বন্ধে লিখেছেন :

'চল্ রে কাবার জিয়ারতে, চল্ নবিজীর দেশ ;
দুনিয়া দারীর লেবাস খুলে পর রে হাজীর বেশ।'

একদিন কাজীদা বলেন, 'আব্বাস, সুন্দর একটা গান লিখেছি, গানটা শেখো, খুব তাড়াতাড়ি রেকর্ড করতে হবে। গনের কথা হচ্ছে :

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার—
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
মাতিয়াছে সবে বিভবে বিলাসে ;
বসিয়াছে জালিম শাহী তখ্‌তে তব,
মজ্‌লুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব—
তলোয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামীর জিঞ্জির বাধে।'

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে তাঁর গানের বড়ো বড়ো খাতাগুলো পড়ে থাকতো। সেই খাতা থেকে কোনো কোনো নতুন কবি গান লিখে নিয়ে কাজীদার লাইন শুদ্ধ প্রায় হুবহু নকল করে নিজের লেখা বলে গ্রামোফোনে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজীদাকে বললাম সে-কথা। তিনি হেসে বললেন, 'দূর পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'ঘটি পানি নিলে কি সাগর শুকিয়ে যাবে? আর নবাগতের দল এক-আধটু না নিলে হালে পানিই বা পাবে কী করে?'

বিশ বৎসর প্রায় কাজীদার সাহচর্যে ছিলাম ; এর মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে পরনিন্দা শুনিনি।

একটি করুণ কাহিনী

আঙুরবালা দেবী

গ্রামোফোনের রিহার্সাল রুমে মাঝে মাঝে কাজীদা হাত দেখার বই যোগাড় করে, তাই নিয়ে মেতে থাকতেন। আমরা এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করতাম প্রায়ই।

কাজীদা কিন্তু রাগ করতেন না।

তাঁর এই হাত দেখা নিয়ে একটা খুব করুণ গল্প আছে।

আমাদের সময়ে গ্রামোফোনে একজন তবলা বাজিয়ে ছিলেন। নাম রাসবিহারী শীল। খুব গুণী লোক। রাসবিহারীবাবুর তবলা সঙ্গত না থাকলে আমাদের গান যেন জমতেই চাইতো না।

একদিন শোনা গেলো, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী মশাই নৌকা যোগে কোথায় যেন গান গাইতে যাবেন, আর তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবার জন্য যাবেন সেই রাসবিহারীবাবু।

সেদিন যথারীতি রিহার্সাল রুমে কাজীদার সঙ্গে আমরা গান বাজনা নিয়ে মেতে রয়েছি। রাসবিহারীবাবু আমাদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছেন। গান-বাজনার ক্ষণিক বিরতিতে তিনি কাজীদার সামনে ডান হাতটি মেলে ধরলেন ঃ

'কাজীদা, আমার হাতটা একটু দেখুন না।'

এটা তাঁর জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার আগের দিনের ঘটনা।

কাজীদার মুখে সব সময়েই হাসি লেগে থাকতো। সেই হাসি-মুখেই তিনি রাসবিহারীবাবুর হাত দেখায় মন দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। এক সময় রাসবিহারী-বাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

সবাই চুপচাপ। হঠাৎ কাজীদার এই ভাবান্তর দেখে আমরাও অবাক না হয়ে পারলাম না।

রাসবিহারীবাবু হাসিমুখে বললেন, 'কই কাজীদা, হাতে কি দেখলেন বললেন না তো!'

কাজীদা তবুও নিরুত্তর।

রাসবিহারীবাবু আবার বললেন, 'বলুন না কাজীদা, কি দেখলেন। খারাপ কিছু?'

এবার কাজীদার মুখে মৃদু করুণ হাসি ফুটে উঠলো। রাসবিহারীবাবুকে তাঁর গুণের জন্য কাজীদা খুবই স্নেহ করতেন। তাই ধীরে ধীরে তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'দূর পাগল, খারাপ কেন হবে! ভালোই তো, সব ভালো।'

এই কথার পর কাজীদা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

তখনকার নাম-করা গায়ক ধীরেন দাস সেদিন ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারীবাবু চলে যাবাব পব ধীরেনবাবু কাজীদাকে চেপে ধরলেন, 'বলুন না কাজীদা, ওব হাতে কি দেখেছেন?'

কাজীদা বললেন, 'একটু খারাপ জিনিসই দেখলাম।'

ক'দিন পর জ্ঞানবাবু গান গেয়ে আবার ফিরে এলেন, কিন্তু রাসবিহারীর দেখা নেই।

আমরা তাঁর খোঁজ করতেই শোনা গেলো, রাসবিহারীব জ্বর হয়েছে। এর ক'দিন পরে খবর এলো তাঁর সামান্য জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়িয়েছে।

অনেক চিকিৎসা করা হলো। কিন্তু তাঁর সে নিমোনিয়া আর ভালো করা গেলো না। মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রাসবিহারী শীল মারা গেলেন।

ধীরেনবাবু কাজীদাকে ধরে বললেন, 'কাজীদা, এই জন্যেই আপনি হাত দেখে রাসবিহারীকে কিছু বলেননি, না?'

কাজীদা বেদনার হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সেদিন ওর হাতে মৃত্যু-যোগ দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম, খুব শীগ্‌গিরই হয়তো রাসবিহারীর মহা বিপদ আসছে। আর সেই জন্যেই আমি কিছু বলিনি সেদিন।' কাজীদার গানের ক্লাশ ভালো জমলো না সেদিন।

কাজীদা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম যে কতোবড়ো গুণী, জ্ঞানী, কতোবড়ো স্রষ্টা, কবি ও শিল্পী, তাঁর ব্যক্তিত্ব যে কতো মহান্, তাঁর বৈশিষ্ট্য যে কতোখানি এবং তাঁর স্থান যে কতো উঁচুতে তা দেশে বিদেশে কারো অজানা নেই।

তবে আমার পুরোনো দিনে, কাজীদার সঙ্গলাভ করার যথেষ্ট সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর ঐ সদাহাস্যময় মুখ, দিল্-খোলা হাসি, মধুর ব্যবহার, সরলতা ও আপন-হারা ভাব কোনদিনই ভুলতে পারবো না। ছোটোখাটো হাসির কথা নিয়ে তিনি হাসির রোল তুল্‌তেন—সেই সঙ্গে তাঁর ভিতরের গভীর ভাবও প্রকাশ পেতো।

একদিন রাত্রে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। কী যেন একটা প্রসঙ্গে আমাদের বেশ গল্প জমে গেলো। হঠাৎ দেখি কাজীদার মনটি আর যেন এ-জগতে নেই—আপন আনন্দে আপনি বিভোর হয়ে গেছেন।

আমি তো প্রথমে এই দেখে অবাক!

তারপর দেখি কি ঘরের এক দেওয়ালে একটু অন্ধকারে একটা জোনাকি পোকা জ্বলছে—নিভছে, আমরা কেউ সেদিকে খেয়ালই করিনি। কিন্তু কাজীদার দৃষ্টি সেদিকে চলে গেছে আর তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখে প্রাণ-ভরে উপভোগ করছেন ও 'আহা আহা' বলছেন।

অনেকক্ষণ এভাবে কাটলো।

আমিও মুগ্ধ হয়ে কাজীদার ঐ আনন্দ আস্বাদন করতে লাগলাম।

সেদিন কিন্তু আগের প্রসঙ্গে আর ফিরে যাওয়া হলো না।

এরকম অনেকবার তাঁর সান্নিধ্যে যা যা ছোটোখাটো ঘটনার সৃষ্টি

হয়েছে তার মাধ্যমে কাজীদাকে আরো বেশী করে পেয়েছি ও জেনেছি। তাঁর যে ক'খানা গান আমি রেকর্ড করেছি—তার প্রতিটিতেই কাজীদার স্নেহের স্পর্শে আমার গান সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

তাঁর গান গেয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি তা আমার মনে সর্বদাই গেঁথে আছে ও থাকবে।

তাঁর গান গেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

কবি নজরুল

জগৎ ঘটক

প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্বেকার কথা। বহরমপুরে কবির এক সংবর্ধনা সভায় তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে পরিচয় আত্মীয়তায় নিবিড় হয়ে উঠেছিলো একদিন।

কর্মসূত্রের টানে কিছু দিনের মধ্যে যখন আমাকে কলকাতায় চলে আসতে হয় তখনই কবির পরিবার ও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গভীরতর হয়ে ওঠে। তিনি তখন হতেই অগ্রজের স্থান গ্রহণ করেন এবং অভিভাবকের ন্যায় আমাদের সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করেন। কোন্ অদৃশ্য হস্তের সোনার ছোওয়ায় এ মিলন-সেতু রচিত হয়েছিলো জানি না, তবে বোধ হয় প্রয়োজন ছিলো। প্রয়োজন ছিলো কবির—প্রয়োজন ছিলো আমাদেরও।

এরপর যখন তিনি 'মেগাফোনে' সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে যোগদান করেন, আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে তিনি সহকারী রূপে সঙ্গে নেন। অপরিসীম স্নেহে সযত্নে তিনি নিতাইকে [নিতাই ঘটক] গড়ে তুলতে থাকেন এবং মেগাফোন ছেড়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদানকালে তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কাজী নজরুল কবি, সাহিত্যিক। কিন্তু সঙ্গীত ছিলো তাঁর প্রাণ। তিনি নানা বিষয়ে নানা শ্রেণীর অসংখ্য গান তো লিখেছেন। কতো গান যে হারিয়ে গেছে এবং কতো গান যে লুপ্ত হবার পথে—তা বলা যায় না। তিনি নিজেও সে-কথা পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যদিও পূর্বে তিনি তাঁর গানের কিছু কিছু স্বরলিপি আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁর গানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য স্বরলিপির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই স্বরলিপির ভার

তিনি সম্পূর্ণ আমার উপরেই দিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রায়ই তার জন্য আমায় তাগিদ দিতেন। উত্তর কালে যখন মার্গ সঙ্গীত উদ্ধারকল্পে গান রচনা করতে থাকেন, তখন অধিকাংশ সময়েই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসতেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করিয়ে নিতেন। এর ফলে সৃষ্টি হলো 'হারামণি', 'নবরাগ' প্রভৃতি গানের। দুঃখের বিষয়, হারামণি একদিন হারিয়ে গেলো কবির কাছ থেকেই আর তার আঘাত করিব প্রাণে যেভাবে বেজেছিলো তা সত্যই মর্মস্পর্শী। কবি বলেছিলেন, 'যা হারিয়ে গেলো, তা আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না।' এ-কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে। আঘাত আমার প্রাণেও কম বাজেনি—কবির সৃষ্ট গান ও সুর আর আমার সমস্ত গানের স্বরলিপি। অবশ্য পরে কয়েকটি গান ছিন্ন-কাগজের টুকরো খুঁজে উদ্ধার করেছি—তবে কয়েকটি মাত্র। 'নবরাগের' গানগুলি ও আমার স্বরলিপি অক্ষতই আছে। 'নবরাগ' কবির সৃষ্টি-রাগ।

স্বরলিপি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিলো। স্বরলিপিতে গানের সুরের কাঠামোটাকেই শুধু প্রকাশ করলে যেমন সুরের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় না, স্বরলিপির জটিলতাও তেমনি গাওয়ার পরিপন্থী হয়ে পড়ে। তাই স্বরলিপির ভাষাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করে গানের সুরকে মূর্ত করে তুলতে পারলেই সেই স্বরলিপি সার্থক হয়ে ওঠে। তিনি পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর গানের সুর কিছু কিছু অদল-বদল হবার উপক্রম হতে চলেছে এবং এ বিষয়ে তিনি এক-আধজনকে সাবধানও করেছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরের বিকৃতি তিনি পছন্দ করতেন না।

কবি ও শিল্পীর জনপ্রিয়তার জন্য একই সঙ্গে চাই দুটো জিনিস—বৈচিত্র্য আর গভীরতা। বাংলা দেশের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, এক সময়ে প্রায় সব সব সেরা কবিই গান লিখতেন। তাতে গানের বৈচিত্র্য ও গভীরতা দুই-ই ফুটতো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—সকলে নিজেদের গানের বেশীর ভাগ সুর নিজেরাই দিয়ে গেছেন। ফলে গানের ভাবের দিকটা, যা কথা দিয়ে ফোটানো চলে, তা যেমন তাঁরা নিজেদের আইডিয়া অনুযায়ী দিয়ে গেছেন, তেমনি সেই আইডিয়ার সুরগত প্রকাশের দিকটাকেও নিজেরাই পূর্ণ করে রেখেছেন। ফলে, সে-সব গান সৃষ্টির দিক থেকে পূর্ণরূপে কবি ও গীতিকারের প্রতিভার পুণ্যস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং সেই একই কারণে তাঁদের গান মানুষের চির-কালের আনন্দের উৎস এবং গোটা দেশের চিরদিনের সম্পদরূপে গণ্য হতে পেরেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের দান মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতের এবং মার্গ সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কাব্য সঙ্গীত যদিও এই সময় অনুপস্থিত ছিলো না তবু তা যেন ততখানি আভিজাত্য লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথই বুঝতে পেরেছিলেন কেবল মার্গ সঙ্গীতের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকলে বাংলা গান প্রাণ পাবে না। তাই একদিকে কথায় কাব্য-সঙ্গীতের ধারা এবং অপর দিকে দেশী ও বিদেশী সুরের উদার অভ্যর্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে মেলে ধরলেন। নজরুল এসে সেই ধারাকেই আরও অনেক দূরে ও বিচিত্র পথে টেনে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিদেশী সুরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিলো।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট সঙ্গীত জগৎ যেন তাঁর সুরগীতির অঙ্গনে আমন্ত্রণ পায়নি। নজরুলের গানে সেই অনিমন্ত্রিত অতিথির প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধরে, কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুরা ও সাকী ; খেজুর গাছ, প্রখর রৌদ্র এবং ওয়েশিসের শ্যামলিমা নিয়ে হাজির হলেন। বাঙালীর কাছে এর স্বাদ নতুন, সুর নতুনতর। তাঁর প্রেমের (গজল) গানের কলি অনেক মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো।

আর কি তার বৈচিত্র্য ! বৈষ্ণব যাঁরা তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রেমলীলা ও গোষ্ঠলীলায় সুর-চিত্র দর্শনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়। শাক্ত যিনি, তিনি শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় নিজের মনটিকে একটি রাঙা-জবা করে ধরে দিতে পারেন নজরুলের শ্যামা সঙ্গীতের খেয়ায় ভেসে। মুসলমান যিনি তিনি ঈদ মুবারকের বাঁকাচাঁদ প্রথম দেখার আনন্দে আত্মহারা হবার ভাষা খুজে পাবেন এই নজরুল-গীতির ভাণ্ডার থেকেই। প্রেমিক যিনি তিনি প্রেমের বিভিন্ন স্তরের সুখের ও শোকের সাড়া পাবেন নজরুলের গানে। তাঁর হাসির গানের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর দেশাত্মবোধক গান সারা বাংলা তথা ভারতের নিপীড়িত জনগণের অন্তর মথিত বাণী।

বিদেশী সুরে লেখা গানের পরিমাণ নজরুলের বিরাট গীতি ভাণ্ডারের তুলনায় খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু নজরুলকে জানতে গেলে এর মূল্য আছে। কয়েকটি গানের নাম করছি—'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি', 'হে আমারই বাংলা দেশ' (হাওয়াইয়ান সুর), 'রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়' (আর্‌বি সুর), 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে' (ইরাণী ও তুর্কী), 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' (মিশরীয়) প্রভৃতি। দুঃখের বিষয় নজরুলের এই সব সুরে রচিত গানগুলির ঠিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে খুব বেশী প্রচলিত

করবার চেষ্টা এখনও হচ্ছে না। প্রতিভাবান এবং জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পীদের দিয়ে এই ধরনের গান আরও বেশী করে রেকর্ড করানো দরকার। রেকর্ড করবার সময় যন্ত্র-সঙ্গীতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলে তাঁর সঙ্গীতের অনেক দিক স্পষ্ট হবে যেটা তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

ঝুমুর ও ভাটিয়ালী গানের সুরে, পদাবলী ও শ্যামা সঙ্গীতের সুরে, কিংবা খাঁটি বাংলা সঙ্গীতের অনুসরণে নজরুল যে সব গান লিখেছেন তাতে নতুনত্ব যতখানি, তার চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সুরে রচিত গানগুলিতে নতুনত্ব অনেক বেশী। তাঁর সুরের মধ্যে রাগ-সঙ্গীতের ধারা, লোক-সঙ্গীতের ধারা, বিদেশী সুরের ধারা, এবং সবার শেষে নিজস্ব সুরের ধারার সন্ধান মেলে। খুঁজলে গবেষকরা আরো দু-একটা নতুন ধারার খবর পেতে পারেন। বাংলা দেশে 'গজল' (প্রেম সঙ্গীত)এর বহুল প্রচলন (বিশেষ করে বাংলা ভাষায়) নজরুলের দ্বারাই হয়।

নজরুলকে যেমন দেখেছি

বেগম শামসুন্‌নাহার মাহ্‌মুদ

নজরুলের আবির্ভাব অত্যন্ত আকস্মিক। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র পাতায় পাতায় তাঁর আগুন-ঝরানো লেখা হঠাৎ চমক লাগালো বাঙালী পাঠক সমাজের মনে। কে এই সৈনিক কবি?…'উঃ কি আগুন বৃষ্টি! আর কী ভয়ানক শব্দ—গুড়ুম দ্রুম—দ্রুম। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না। যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। বাস্তবিক এ গোলা বারুদের রঙে আসমান-জমীন লালে লাল হয়ে গেছে! সব চেয়ে বেশী লাল, ঐ বুকে বেয়োনেট-পোরা, হতভাগাদের বুকের রক্ত। লালে লাল! শুধু লাল আর লাল! এক একটা সেপাই শহীদ হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মতো লাল হয়ে আছে।' এই ধরনের লেখা, সত্যি বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু! মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিক-কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের চমক-লাগানো লেখা প্রায়ই দেখা যেতে লাগলো মাসিক পত্রিকার পাতায়। বাঙালীর মনে ধাক্কা লাগালো তাঁর মর্মভেদী সুর—'ওরে আয়, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়।'

মহাযুদ্ধের শেষে ফিরে এলেন নজরুল। তাঁর রচনা তখন পুরোদমে চলছে আর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন বাঙালীর মনে। 'মোসলেম ভারতে' মাসের পর মাস বেরুতে লাগলো 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হলো—

'ঐ বল বীর—বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'…

'ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।'

যেখানেই গেছেন নজরুল, যে কাজেই হাত দিয়েছেন, ঝরেছে তাঁর উপচে-পড়া প্রাণের প্রাচুর্য। তাঁর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে তিনি সজীব করে তুলেছেন চারিদিক। জেলখানার ভিতরে বসে তিনি গান রচনা করতেন, গাইতেন, আর দল গড়তেন। তাঁর আশেপাশে এসে জুটতেন ঘরছাড়া রাজনৈতিক বন্দীর দল। তাঁদের হাত-পায়ের শিকল ঝন্‌ঝনিয়ে বাজতো। নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে মহা উন্মাদনায় তাঁরা গাইতেন—

'শিকলপরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'

এভাবে কয়েদখানার আবহাওয়াকে কি করে তাঁরা উতরোল করে তুলতেন, অতিষ্ঠ করে তুলতেন জেল কর্তৃপক্ষকে—এ-সব গল্প আমরা নজরুলের নিজের মুখে শুনেছি। তাঁর ১৯২৯ সালের চট্টগ্রাম সফরের কথা বলছি। আমাদের বৈঠকখানায় দাদার (জনাব হবীবুল্লাহ্ বাহার) সঙ্গী ছাত্রদল, অন্যান্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের মজলিস জমজমাট করে তুলতেন নজরুল—তাঁর গান, গল্প ও আবৃত্তি দিয়ে।

দেখতে দেখতে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি পুস্তকের গান ও কবিতা দেশের মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো। দেশের মুক্তি-আন্দোলনে একটা প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করলো নজরুলের সাহিত্য ও জীবন। রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেও ঐটুকুই বিদ্রোহী কবির সব নয়। তাঁর বিদ্রোহ শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয়। সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে বিভেদ, অর্থনীতিক বিভেদ ও সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য—এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিদ্রোহের মূল সুর। দেশের লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত, চাষীমজুর, ধীবর—সকলেই মর্যদা পেলো তাঁর কাব্যে। তাদের করুণ কাহিনী রূপ পেলো তাঁর কবিতার ছন্দে, তাঁর গানের সুরে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের হট্টগোলের মাঝখানে সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রচারের উত্তেজনার ভিতরে একই সময় পাশাপাশি বিশ্ব-প্রকৃতি কি করে তাঁকে হাতছানি দিতো তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সারাদিন সভা-সমিতি, বক্তৃতা-মজলিস নিয়ে মেতে থাকবার পর রাত্রিবেলা গভীর অন্ধকারে প্রকৃতি তার রূপের ঐশ্বর্য মেলে ধরতো তাঁর কাছে। চট্টগ্রামের গিরিদরীবন তাঁর মনকে উতলা করে তুলত। রাত্রির পর রাত্রি অবিরাম তিনি লিখে যেতেন —'সিন্ধু'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ, 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এই সময়েই তিনি লিখেছেন 'অনামিকা', 'গোপন প্রিয়া' প্রভৃতি 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলি। তিনি লিখেছিলেন আমাকে একটা চিঠিতে—'আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ। আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে—দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারে গ্রামবাসীদের জন্য—তা তার এক আনা; বাকি পনেরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে—সৃষ্টি-দিন হতে—আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যতো বলা সেই বিপুলতরকে নিয়ে—আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে।' রাজনৈতিক কোলাহল ও হট্টগোলের মাঝেও তিনি সেই সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতেন।

নজরুলের অল্প কয়েক বছরের কবি-জীবন। শেষের দিকে তাঁর প্রতিভার সেই আবেগ ও উন্মাদনা অনেকটা স্থিতি লাভ করলো। এ সময় তিনি গান ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নি। গান তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য। তার মধ্যে বহু গান সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবার দাবী রাখে। তাঁর প্রথমবার চট্টগ্রাম অবস্থান-কালে যেমন তিনি মজলিস জমাতেন স্বদেশী গান দিয়ে—তেমনি দ্বিতীয়বারে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করতেন গজলের সুরে সুরে।

আমাদের বৈঠকখানায় বসতো গানের মজলিস। কবি কণ্ঠে ঝরে ঝরে পড়তো সঙ্গীতের আনন্দ ও বেদনা।

১৯৪০ সালে নজরুলকে আমাদের ভবানীপুর পুলিশ হাসপাতালের বাড়ীতে যখন দেখি, তারপর থেকে দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তারপর বেশীদিন তিনি আর প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। শেষের দিকে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবই ছিলো প্রবল। সেই উদ্দাম আবেগ ও আনন্দের প্রতিমূর্তি নজরুল যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিলেন আমাদের কাছ থেকে। ভবানীপুরের কথা বলছিলাম। আমরা একটা সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলাম। তখনো পর্যন্ত সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ আর প্রাণখোলা হাসি নিয়ে মজলিস জমাচ্ছিলেন নজরুল। আমাদের দেশের মেয়েরা সে-যুগে পর্দার বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসছেন দলে দলে। স্কুল-কলেজে, খোলা আকাশের তলায় তাঁদের ভিড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে—সফল হতে চলেছে নজরুলের নারী-জাগরণের স্বপ্ন। সে-কথা আলোচনা করতে গিয়ে নজরুল আকবর এলাহাবাদীর 'দেওয়ান-ই আকবর' কাব্যের একটি কবিতা সকৌতুকে আবৃত্তি করলেন। যাতে বিবিকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'বিবি, তুমি নেকাব খুলে ফেলেছো যে?' বিবি জবাব দিচ্ছেন, 'পুরুষের আক্কেলের ওপর পড়েছে সেই নেকাব।' এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল হাসিতে ফেটে পড়লেন।

তাঁর হাসি ও আনন্দের উৎস সেই থেকে একেবারে শুকিয়ে এলো। নজরুলের কথা ভাবতে গেলেই আমি ফিরে যাই সেই কুড়ি বছর আগেকার আমাদের সেই চট্টগ্রামের বাড়ীতে—যেখানে গানের পাখী নজরুল বাসা বেঁধেছিলেন কিছুদিনের জন্য। আজ আর সেই নজরুল নেই, নেই সেদিনের চট্টগ্রাম। আর নেই যাঁরা ছিলেন আশেপাশে—মা, দাদু, দিদারুল আলম…। সেদিন ছিলেন আরো অনেকে, যাঁদের সাহচর্যের আনন্দে কবির সৃষ্টি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো। স্মৃতির পাতায় সেদিনের ছবি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে …হয়তো মলিন হবে না জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

মুক্তির ডাক যখন যেভাবে এসে পৌঁচেছে তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছে নজরুলের বিদ্রোহী মন। মহাযুদ্ধের সৈনিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হয়ে সার্থকনামা হয়ে উঠলো। নজরুলের কাব্যসাধনার সেই চারণ-যুগ অবিস্মরণীয়। তাঁর হাতে ছিলো বিষের বাঁশী। যে-বিষ তিল তিল পান করে ভারতবর্ষ নীলকণ্ঠ, সে বিষেরই বিষাক্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র পাঠ করেছিলেন তিনি। শুনতে পেয়েছিলেন 'রক্ত ঝিঁঝিঁ ভোরে', 'বন্দীশৃঙ্খলে', 'মুক্তি কোলাহল'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, সৈনিকের ঐতিহ্য সাগ্নিকতা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি :—

'ওরে হত্যা নয় এ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন'—এ বিশ্বাসের বর্ণে-ই তাঁর মনের তন্তুগুলি রঞ্জিত ছিলো, যদিও 'বন্দিনী মা'র আঙিনায়', 'পাগল পথিক' গান্ধীজীকে দেখেও মন তার গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠেছে :—

> 'কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়
> ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়—'।

অসহযোগ আন্দোলনের অধ্যায় সমাপ্ত হলো, কিন্তু চারণ-কবি নজরুলের মনে সামাজিক মুক্তির আন্দোলন নীরব হয়ে এলো না। বৈদেশিক শাসন আর শোষণই তো শুধু নয়, নিজেরাই নিজেদের শাসন-শোষণ করে চলেছি আমরা অবিরত আর তারই দরুণ মানুষ পূর্ণ-মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। 'নরনারায়ণে' আমরা পদাঘাত করি, 'জাতের নামে বজ্জাতি' করি, অবমাননা করি স্ত্রীজাতির— কোথায় আমাদের মনুষ্যত্ব? নজরুলের মানবীয় অনুভূতির রং সাম্যবাদের অরুণাভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আবার। পুরোনো দেশের

পুরোনো জীবনের চারপাশে যে অসার জঞ্জাল জড়ো হয়েছে—তার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়া চাই। সমাজের সচেতন শ্রেণীর এই আশঙ্কা কবিতা হয়ে উঠলো নজরুলের ভাষায়—নজরুলের সদাজাগ্রত অনুভবশক্তি সমাজের এই মূক অনুভূতিকে স্পর্শ করে গেলো। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে সমাজ-মনের শাপ-মোচন অবশ্য মন্থর গতিতে সব সময়েই হয়ে এসেছে, অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন সে গতিকে খানিকটা ক্ষিপ্র করে তুলেছিলো মাত্র। এই ক্ষিপ্রতার ছন্দেই ছন্দিত হয়েছে নজরুলের কবিতা, তিনি এক তিলও পিছনে পড়ে থাকেন নি।

বন্ধন-মুক্তির যে প্রেরণা কবি নজরুলের মনে সক্রিয় ছিলো তা একটি আসন্ন সাহিত্যিক অন্দোলনেরই অগ্রদূত। প্রাচীন সংস্কারের বলয়-বেষ্টন ভেঙে দিয়ে সমাজ-মানসের একটি ধারা তখন নতুন জগতের স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল—নজরুলের সর্বতোমুখী বিদ্রোহের উদাহরণে সে নবধারা একটি প্রশস্ত পথ কেটে নেবার উৎসাহ লাভ করলো। দেখা গেলো এই মনোভঙ্গীর ধারক ও বাহক তখন আর একা নজরুল ইসলাম নন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্তের মতো প্রতিভাবান কবিসম্প্রদাও। বাংলা-সাহিত্যে এই কবি-সম্প্রদায়ের দান অসামান্য আর কবি নজরুলের সবচেয়ে সার্থকতা এই যে, তিনি এদের অগ্রজ।

জীবনের অবারিত অভিযানে সমাজের ও সাহিত্যের বন্ধন-মুক্তিই সেদিন শেষ কথা ছিলো না, দ্রুত পদক্ষেপে দেশ এগিয়ে চল্‌ছিলো আবার রাষ্ট্রিক বন্ধন-মুক্তির জয়যাত্রায়। আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতবর্ষের জনসমুদ্র আবার গর্জে উঠলো। কবি নজরুল আবার ফিরে এলেন চারণের ভূমিকায়—নূতন করে জন্ম নিলো তাঁর বিদ্রোহী সত্তা :—

'কারার এ লৌহ কপাট
ভেঙে ফ্যাল্ কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণবেদী—'

—গেয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠ, দুর্গম গিরি, দুস্তর পারাবার পার হবার আহ্বান জানালেন তিনি—জিজ্ঞেস করলেন—

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?'—

তারপর সত্যিকারের চারণের মতোই দুঃসাহসিক আশ্বাস দিলেন ঃ—

'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

চারণ-কবি হয়ে পুনরায় ফিরে আসাই হয়তো সত্যিকাবের নজরুল ইস্‌লাম। হয়তো নজরুল ইস্‌লামই বাংলার শেষ চারণ-কবি। চারণ-কবির কণ্ঠ থেকেই বিদ্রোহী বিদ্রোহের সুর শিখে নেয়, কবি খুঁজে নেয় কবিতার উপাদান, রক্ত নেচে ওঠে সৈনিকের ধমনীতে আর তারই স্মৃতি বহুদিন, বহুযুগ ঘুরে বেড়ায় আমাদের মনে।

উপন্যাস রচনায় নজরুল

মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের খ্যাতি কবি ও সুরশিল্পী হিসাবে। কবিতা ও গানের অনুপাতে গদ্য-রচনা তাঁর অনেক কম। তিনি গোটা-আঠারো গল্প লিখেছেন আর উপন্যাস লিখেছেন তিনটি। আঠারোটি গল্প তাঁর 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' এবং 'শিউলি-মালা' গল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস তিনটি যথাক্রমে 'বাঁধনহারা', 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম একটা ব্যতিক্রম। নেতিয়ে-পড়া সুরের দেশে কাব্যে এবং সঙ্গীতে তিনি প্রলয় নিনাদ তুলেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের গদ্য রচনাতেও এ ব্যতিক্রমের সুর সুস্পষ্ট। সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে উপন্যাসে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে যে ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে তা নেই।

সমালোচনার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হাতে নিয়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে নজরুলকে বিচার করলে একদিকে যেমন তাঁর অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে, তেমনি এ ত্রুটিগুলোই যে তাঁর ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক হয়ে রয়েছে, সমালোচককে তাও স্বীকার করতে হবে।

একটা যুগের স্রষ্টা হিসাবেই নজরুল বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় একটা ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছেন। নজরুল প্রতিভার ছোঁয়া সাহিত্যের যে ধারায় লেগেছে, তাতেই বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি কম হয়নি। উপন্যাস রচনাতেও তাই দেখা যায়, তিনি গতানুগতিকতার পথে পা বাড়ান নি।

প্রথম যুদ্ধের পর থেকে বাংলার বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩০—৩২ সাল পর্যন্ত নজরুল, রবীন্দ্রনাথের যুগেই

রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে একটা স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করেছিলেন। এ-যুগ বাংলা দেশের তথা অবিভক্ত ভারতের মানস চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হলেও বৃটিশ রাজ-শক্তির পতনোন্মুখ রূপ এ উপমহাদেশের অগণিত তরুণ মনে আশার সঞ্চার করে। এ দেশ স্বাধীন না হলে দেশের আত্মা জাগ্রত হবে না। বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধারও অবসান হবে না। তাদের এ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ীভূত করেছিলো এ কালের নতুন সমাজবাদ-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পথে এদেশবাসী আকৃষ্ট হলেও বাংলার তরুণদের প্রাণে তার আবেদন তেমন প্রবল হয়নি। বাংলার তরুণেরা অহিংস পথ অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লব ও সন্ত্রাসের সহিংস পথই বেছে নিয়েছিলো। এ যুগের মানস-চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ-কবি হিসাবে নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে মুখরিত করে তুলেছিলেন আর তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে এঁকেছিলেন এ যুগেরই জীবন্ত প্রতিরূপ। বাংলার যে অক্ষয় যৌবন সে-সময় মুক্তিকামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আজাদীকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে তরুণ-তরুণীরা ফাঁসীমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, দেশ-প্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন নজরুল তার 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে। এদের পণ ছিলো দৃঢ়, বাসনা ছিলো অদম্য। দেশোদ্ধারই ছিলো তাদের একটি মাত্র 'প্লট'। ষড়যন্ত্র যতই তারা করুক না কেন, তাতে কোনো জটিলতা ছিলো না। দিনের আলোর মতই তা ছিলো সুস্পষ্ট। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝুলুল আর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু'হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রলয়-নেশায় মেতে উঠতে দেখি। মায়ের স্নেহ, আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর-যত্ন অবহেলা করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বারংবার এরা বিপ্লব-বহ্নির করাল কবলে সমর্পণ করেছে, তবু পরাজয় স্বীকার করেনি।

'মৃত্যু-ক্ষুধা'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে ধুঁকে মরেছে তার নিখুঁত এবং জলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল। এ কাহিনীর সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েছে বিপ্লবী আনসারের দেশসেবা, কারাবরণ ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস।

'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যু-ক্ষুধা'য় নজরুলের জীবন-দর্শন রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে এবং তাদের দেশমাতৃকার মুক্তিপণের জন্য জীবন বলিদানে। কিন্তু নজরুলের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বোধ হয় আমরা পাই তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে। 'বাঁধনহারা' নামটি এ উপন্যাসের প্রকৃতি এবং গ্রন্থকারের মানসেতিহাসের পরিচয় বহন করছে।

উল্কা এবং ঝঞ্ঝার বেগে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের মতো ধীরে ধীরে ষোলকলায় তিনি বর্ধিত ও বিকশিত হন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-গুলী ও তলোয়ার সঞ্চালন করতে গিয়ে মসীযুদ্ধেও তিনি হাত পাকিয়েছেন।

নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে কাহিনীর গাঢ় বিন্যাস এবং উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রণ আমরা পাইনে সত্য, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কবিতা ও সঙ্গীতে যেমন, এগুলোতেও তেমনি বিধৃত হয়েছে। ভাষার উপরে নজরুলের যে কতোবড়ো দখল ছিলো তাও দেখা যায় তাঁর এ উপন্যাসগুলিতে।

তাঁর উপন্যাসে আমরা নজরুলের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

মধুমালার গোড়ার কথা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

১৯৪৫ সালের কথা—রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কয়েকজন হ্যারিসন রোডে এ্যাল্‌ফ্রেড্‌ রঙ্গমঞ্চে নাট্যভারতীর উদ্বোধন করি। এখন এই রঙ্গমঞ্চ গ্রেস্‌ সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় গদাধর মল্লিক। গদাধরবাবু এক সময়ে আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন ও তাঁর নাট্য-প্রীতি ছিলো অসাধারণ। তাই গদাধরবাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান্‌ বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রীরঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভালো নাটক মঞ্চস্থ করবার সঙ্কল্প করলেন, তখন আমাদের হাতে প্রযোজনা করার মতো কোনো নাটক ছিলো না।

নাট্যভারতীর যিনি নামকরণ করেছিলেন সেই স্বনামখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখন নতুন নাটক রচনায় ব্যাপৃত, কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভালো নাটক কোথায় পাওয়া যায় তার জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর কাজী নজরুল আমায় বললেন যে, ‘মধুমালা’ নামে তাঁর একটি ভালো গীতিনাট্য লেখা আছে, সেটি যদি আমি পরিচালনার জন্য গ্রহণ করি, তাহলে তিনি খুশী হবেন।

আমি বললাম, তুমি ভাই আমায় পাণ্ডুলিপি পড়তে দাও, যদি মনে করি যে, তার প্রযোজনা করা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সম্ভবপর, তাহলে আমরা অবিলম্বে তোমার নাটক নিয়েই কাজ শুরু করবো। নজরুল তার পরদিনই নাটকটি আমার হাতে দিলেন এবং সেই দিনই তা পড়ে আমি গদাধরবাবুকে শোনালাম। তিনিও গীতিনাট্যের রচনা প্রণালী দেখে মুগ্ধ হলেন। পরের দিনই বন্ধুবরকে আমি নিয়ে গেলাম তাঁর

কাছে এবং মধুমালাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে তোলবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেলো।

কাজী স্বয়ং তাঁর গানের রচনায় সুর সংযোগ করতে এগিয়ে এলেন—তাঁর সুর শুনে গায়ক গায়িকারা মুগ্ধ হলো এবং রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

গীতিনাট্যের প্রযোজনা করা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ, সাজ-পোশাক, দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব, সঙ্গীতের বিপুল আয়োজন, সব কিছুর জন্য যে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন, অনেক রঙ্গমঞ্চের মালিকের পক্ষে অতো টাকা ব্যয় করা সব সময় সাধ্যায়ত্ব হয়ে ওঠে না। তবে গদাধরবাবু ও তাঁর জামাতা রঘুনাথবাবু বললেন যে, খরচ করতে আমরা কর্পণ্য করবো না। সত্যি, খরচ করতে তাঁরা পিছপাও হন নি। সে সময় সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চশিল্পী মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (নানুবাবুকে) মহাশয়কে তাঁরা দৃশ্যপট ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার দিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ নতুনভাবে তৈরী করালেন, শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমতী হরিমতিকে তাঁরা মূল গায়িকা হিসাবে নিযুক্ত করলেন, তাছাড়া সে যুগের নৃত্যগীত-কুশলা অভিনয়দক্ষা শ্রীমতী সাবিত্রীকে মধুমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে মনস্থ করলেন। রাজপুত্রের ভূমিকায় শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ভূমিকায় স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ সিংহ ও আরও কয়েকজন অবতীর্ণ হলেন। গানের ও নেপথ্য সুরের মূর্ছনায়, দৃশ্যপটের অভিনবত্বে মধুমালা অপরূপ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো।

কাজী স্বয়ং সুরের দিক ও আমি অভিনয়ের দিক দেখতে লাগলাম। সমস্ত দর্শক মুক্তকণ্ঠে মধুমালার প্রশংসা করতে লাগলেন কিন্তু ঐ সময় আপেরার বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য যে দর্শকের সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো তা হলো না। গীতিনাট্য চিরদিন লোকে অন্য নাটকের সঙ্গে দেখে এসেছে কিন্তু এককভাবে গীতিনাট্য দেখতে লোকে উৎসাহ বোধ করলে না। অথচ সাধারণ যে-কোনো নাটকের

দ্বিগুণ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ নাটক রঙ্গমঞ্চে চলে না। এ ছাড়াও সে সময় বর্তমানকালের মত এতখানি রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রীতিও লোকের ছিলো না—তাই চল্লিশ রাত্রি অভিনয়ের পর আমাদের আবার অন্য নাটক প্রযোজনা করতে হয়।

তবে এ-কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি বিদগ্ধ সমাজ কাজী সাহেবের এই গীতিনাট্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা করে গেছেন এবং সে সময় সঙ্গীত-রসিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শক-মহল অজস্র অভিনন্দন দিয়েছিলেন আমাদের।

মধুমালার কথা, পরীদের গান, সংলাপের ভাষা—সব কিছু মিলিয়ে এক মোহময় স্বপ্নাবেশের সূচনা হতো প্রেক্ষাগৃহে। কবির চনা যে সার্থক হয়েছিলো তা সকলেই স্বীকার করে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমার জীবনে নজরুল

ইব্রাহীম খাঁ

নজরুল ইসলামের প্রতিভার ছটা, তাঁর প্রাণের আগুন তরুণ বাংলার আকাশে-বাতাসে এমনভাবে ছেয়ে গেছিলো যে, তার প্রভাব হতে মুক্তি পাওয়া অনেকের পক্ষেই সুকঠিন ছিলো। আবহাওয়া মানুষকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করে; হাতের আঙুল দিয়ে কড়ায়-ক্রান্তিতে গণনা করে অথবা ছটাক-তোলার তৌল-দণ্ডে তুলে, কিংবা গজ-হাত-ইঞ্চির ফিতায় মেপে তা প্রমাণ করা সহজ নয়। নজরুল ইসলামের প্রভাবও তেমনি অল্পাধিক এতো সূক্ষ্ম মাত্রায়, এতো বিভিন্ন লোককে এতো বিচিত্ররূপে প্রভাবিত করেছে যে, সব স্থলে তা হাতে-কলমে প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু সে প্রভাবের পরিচয় আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে থাকি।

আমার জীবনে নজরুল ইসলামের প্রভাব কতখানি পড়েছে, স্পষ্ট বলতে পারি না। তবে প্রভাব যে পড়েছে তাও অস্বীকার করার উপায় দেখি না। কারণ আমার অন্তরের আনন্দ-মহলে নজরুল ইসলাম তাঁর স্থায়ী আসন গেড়ে বসে আছেন। আনন্দ হতে সৃষ্টি। কাজেই আনন্দের সাথে যিনি অংশতঃ মিশে বসে আছেন, সৃষ্টির মধ্যেও তিনি অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে আসছেন—এই-ই স্বাভাবিক।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ-ফরাসী-ইটালী-আমেরিকার রণ-ক্লান্ত সৈন্যরা গৃহে ফিরেছে: পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, শহরে-বন্দরে বিজয়-অভিনন্দনে তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের আশা-উন্মেষ বুকে নিয়ে প্রতীক্ষমান এই উপমহাদেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছে: হিন্দু মুসলমান মিলে জগতের দিকে দিকে লড়াইয়ের বিভিন্ন ময়দানে ইংরেজ পক্ষে জয়ের জন্য যে-অর্থ, যে-রক্ত,

যে-প্রাণ দিয়েছে তার বিনিময়ে চায় তারা দেশের স্বাধীনতা—যোল আনা না হয় অন্ততঃ আংশিক। আর মুসলমানরা আরো চায় যে, তুর্ক সাম্রাজ্য রাখা হোক অক্ষুণ্ণ—যেমন জবান দেওয়া হয়েছিলো। ইংরেজ এর কোনটাতেই রাজী হতে পারলো না। তখন ধূমায়িত হতে শুরু করলো দেশের স্বাধীনতা-সাধকদের অসন্তোষের অনির্বাণ বহ্নি।

দেশের এই ক্ষুব্ধ মুহূর্তে সহসা নজরুল ইসলামের কলমে নব-জীবনের বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো। মনে আছে, আমাদের বিদ্যালয়ের এক হিন্দু পণ্ডিত একদিন মহোল্লাসে এসে আমাকে বললেন: দেখুন দেখুন, একটা নতুন রকমের কবিতা—এ যেন রামধনুর বিচিত্র রূপসজ্জার জায়গায় জ্বলন্ত পাখা-প্রহারে ঝিলিক দিয়ে বেড়াচ্ছে এক প্রদীপ্ত বিদ্যুতের দুরন্ত বলাকা। দেখলাম, তিনি 'শাতিল আরব' কবিতাটি নিয়ে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আমারও কাছে ও-কবিতা অদ্ভুতই লেগেছিলো। তখন সাকুল্য কবিতাটাই মুখস্ত হয়ে গেছিলো। এখনও দু-চার লাইন মনে পড়ে:

> 'শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূতঃ যুগে যুগে তোমার তীর
> শহীদদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর!
>
> ....
>
> শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর।'

আমাদেরই এক ভাই লিখতে পারে, আগুনের ভাষায় লিখতে পারে, মুসলমানের নিত্য-ব্যবহার্য শব্দ দিয়ে অপরূপ সুন্দর করে লিখতে পারে, মুসলমানের অতীত কীর্তি-মহিমার কথা রক্তাশ্রুময় দরদ দিয়ে লিখতে পারে, এই একটি কবিতায় তা প্রমাণিত হলো। সেদিন এ কবিতার বিজলী জাবনের তরুণ পাতায় আগুনের অলিখিত আখরে যা লিখেছিলো তা কি আজ সম্পূর্ণ মুছে গেছে? সবখানি যে মুছে যায়নি তা মনে করি এই জন্য যে, আজো তো এ কবিতা পড়ে মন নেচে ওঠে, আজো কবির সাথে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি আর বলি:

> 'শহীদের দেশ! বিদায় বিদায়! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।'

তরীকুল আলম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বর যুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তরীকুল আলম ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং সে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর দাবীও ছিলো, গর্বও ছিলো। অতি আধুনিকদের ভাষায় 'কোরবানী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে তাতে তিনি যা বলেছিলেন, যতদূর মনে হয়, তার মর্ম এই যে: কোরবানী বর্বরযুগের হত্যারীতির চিহ্ন বই আর কিছুই নয়; আল্লাহ্ দয়াময়, তিনি এ হত্যায় খুশী হতে পারেন না। এ প্রবন্ধ পড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠলো। নব্য তুর্করা তখন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জান কোরবান করছিলো। সেই ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে তিনি লিখলেন:

'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির, উদ্বোধন!
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, অহো খামখা ক্ষুব্ধ মন!!
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর-বাণীর
আজিকার এ খুন কোরবানীর
দুম্বা-শির
রুম-বাসীর
শহীদের শির সেরা আজি—রহমান কি রুদ্র নন?
ব্যস্, চুপ খামোশ রোদন।

*

এইদিন মীনা ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্র পণ;
ছি ছি, কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।'

এই জোশের কথা, এই যে প্রচণ্ড শক্তির ভাষায় ইসলামের অনুষ্ঠানের সমর্থন, আধুনিক বাংলা ভাষায় এ নতুন। এ কবিতাটিও পড়তে পড়তে আমার মুখস্ত হয়ে গেছিলো। আমার 'কামাল পাশা'

নাটকে তলোয়ারধারী তুর্ক বালকের মুখ দিয়ে আমি সমর-সঙ্গীতরূপে এই গান গাইয়েছি।

এলো তার পর 'খেয়াপারের তরণী'। পড়লাম :

'কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান 'লা-শরীক আল্লাহ্'।

আমি মুগ্ধ হলাম। যে পড়লো সে-ই মুগ্ধ হলো। ইসলামী শব্দকে বাংলা ভাষায় এমন চমৎকার রকমে হীরের টুকরোর মতো বসিয়ে দেওয়া যায়, এ যেন কারো ধারণাই ছিলো না।

নজরুলের লেখায় এমনিভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিয়ে তরুণ মুসলিম বাংলার মনকে মুগ্ধ করে ফেললো :

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
আম্মা লাল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া।'

এ উর্দু ; না বাংলা ? আর এতো সুন্দর এ ! তারপর চললো—

'বাজিছে নাকারা, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁসিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য !'

অজ্ঞাতসারে পাঠকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো : মারহাবা নজরুল, মারহাবা !

'ওমর ফারুক', 'খালেদ', 'কামাল পাশা'—কবিতার স্রোত বয়ে চললো। খালেদের শেষ লাইন মনে আছে ; মনে থাকবে :

'খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন : আসিবেন ঈশা ফের,
চাই না মেহেদী, তুমি এসো বীর হাতে লয়ে শমশের।'

কিন্তু কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার কথা বলবো ? এই যে তাঁর কবিতা, তাঁর গজল, তাঁর গান, তাঁর কাব্যময় বক্তৃতা, তাঁর সাম্যবাদ, তাঁর কারাবরণ—এ সমস্তই সে-আমলের মুসলিম যুবকদের মনে করেছিলো সুস্পষ্ট রেখাপাত। আমার মনের পাতায়ও যে তার ছায়া পড়েনি কেমন করে বলবো ?

আমি চির দুরন্ত, দুর্দম’ এম. আবদুর রহমান

[জ]গতে যারা বড়ো হয়েছেন, নিজের বুদ্ধি, প্রতিভা, সেবা এবং সাধনা বলে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসের নব নব অধ্যায়, তাঁদের অনেকেই ছোটোবেলায় ছিলেন দুরন্ত এবং চঞ্চল। আবার তাঁদের কেউবা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, আপন-ভোলা এবং মৌনী স্বভাবের। ছোট্ট নজরুলের মধ্যে এই দোষ এবং গুণের সমাবেশ ছিলো সমানভাবে।

পীরের মাজারে, পুকুরের পাড়ে, নদী ও খাল বিলের ধারে বৃক্ষলতা ও ফুলের সমারোহের মাঝে, প্রকৃতির রূপসজ্জার মাঝে বালক ও কিশোর নজরুলকে যেমন ধ্যান-মৌনী শান্ত ও গম্ভীররূপে দেখা যেতো, খেলাধুলোয়, উৎসব অনুষ্ঠানে, মৎস্য শিকারে, আম পাড়ায়, গাছে চড়ায় এবং প্রয়োজন হলে ব্যক্তি বিশেষকে জব্দ ও জ্বালাতন করার ব্যাপারে তেমনই নজরুলের দুরন্তপনা প্রবল হয়ে উঠতো।

তাঁর ঐ সময়ের কয়েকটি দুরন্তপনার কাহিনী উল্লেখ করছি।

চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলেব এক নিকট সম্পর্কীয়া ভাগিনেয়ী কন্যার আকিকা বা নামকরণ উৎসব হচ্ছিলো সেদিন। বাড়ীতে তাঁদের এসেছিলেন অনেক আত্মীয় কুটুম্ব মেহমান। চলছে খানাপিনা, হাসি আনন্দ। এমন সময় নজরুল তাঁদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, ‘মাইজি গো—মাইজি, শিগ্‌গির মিঠাই-ফিরনী আনো, দেখ দেখ, কেমন বর এনেছি তোমার মেয়ের।’

নজরুলের ডাক শুনে ছুটে এলো ছেলে-মেয়েরা, এলেন ভাগিনেয়ী এবং আত্মীয়া মহিলারা দরজার কাছে। দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তাঁরা। বদ্‌খত্‌ চেহারার এক পশ্চিমা আদমী সওয়ার হয়ে আছে একটা প্যাকাটে মার্কা রোগা ঘোড়ার পিঠে। ময়লা মলিন ছিন্ন.

তার বেশ। সেই ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নজরুল। মুখে তাঁর প্রাণখোলা হাসি। পাগল দুখুর কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছে মেয়েরা। ভাগিনেয়ী কিন্তু রাগ করলেন। তাঁর জামাই হবে কিনা এমনি এক বিশ্রী চেহারার রাহী মুসাফির!

আর একদিনের ঘটনা। পাড়ায় জামাই এসেছে। ভালো মানুষ, নতুন জামাই। জামাই-এর বাপের অবস্থা নাকি ভালো। নজরুল তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফন্দি আঁটলেন—মিঠাই খাওয়ার টাকা আদায়ের। দলের পাণ্ডা 'দুখু' দলবল নিয়ে হাজির হলেন জামাই-এর কাছে। বললেন, 'নতুন জামাই আপনি, পীরের আস্তানায় যেতে হবে, সালাম দিতে হবে, 'সিন্নি' দিতে হবে; নইলে অকল্যাণ হবে আপনার।'

পীরের দরগায় 'সিন্নি' দেবার নাম করে প্রথমেই কয়েক সের মিষ্টির দাম আদায় করে নিলেন নজরুল। তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন—পীর হাজি পাহ্‌লোয়ানের আস্তানায়। সেখানে সালাম করিয়ে নিয়ে জামাইকে সঙ্গে করে চললেন সবাই 'দরমা পীরের দরগায়'।

একটা পড়ো বাড়ী। সে বাড়ীতে ছিলো একটা আধ-ভাঙা 'দরমা' অর্থাৎ কিনা হাঁস-মুরগী রাখার ছোটো ঘর। আকার-আয়তনে বড়ো টবের বাক্সের মতো। সেটিকে আগেভাগে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন নজরুলের সঙ্গীরা। সেখানে গিয়ে নজরুল জামাইকে বললেন, 'সালাম করুন'। জামাই সালাম করলেন এবং নির্দেশ মতো সালামী নজরানা বাবদ দিলেন কিছু নগদ তঙ্কা। তারপর মিছিল করে জামাইকে নিয়ে গেলেন তাঁরা তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে। বাড়ীর বাইরে থেকে ডাকলেন নজরুল জামাই-এর শাশুড়ীকে। শাশুড়ীর বুঝতে দেরী হলো না যে, তাঁর ভালোমানুষ জামাই পড়েছে পাড়ার দস্যিদলের পাল্লায়। এগিয়ে এলেন তিনি। নজরুল বললেন—

'মাসি গো মাসী
তোমার জামাই-এর দেখ হাসি
দরমা-পীরে সালাম দেওয়ালাম
খাওয়াও মোদের খাসি।'

দুষ্টু ছেলেদের কাণ্ড দেখে শাশুড়ী রাগে তেতে উঠলেন। নতুন বউ হলো বেজার, কিন্তু শালা-সম্বন্ধীয় দল হলো খুশী। ছেলের দল হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। নজরুল ততক্ষণে কেটে পড়েছেন দল থেকে।

গ্রীষ্মকাল। দু'চারটে করে আম পাকতে শুরু হয়েছে। এমন দিনের একটি ঘটনা। চুরুলিয়া থেকে বীরভূমের শিকারপুরে কুটুম্ব বাড়ী যাচ্ছেন নজরুল। গরুর গাড়ীতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়ীতে ছিলেন নজরুলের এক আত্মীয় এবং কয়েকজনা নিকট আত্মীয়া মহিলা আর গাড়ীর গাড়োয়ান।

পথের ধারে মস্তবড়ো একটা পুকুর, কাকের-চোখেব মতো কালো জল তার টলটল করছে। পাড়ে তার আমবাগান। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গাড়ী রওয়ানা করিয়ে দিয়ে নজরুল চুপটি করে বসে থাকলেন পুকুর ঘাটের কাছে। সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা গাড়ী নিয়ে রওনা হও, আমি একটু পরে দুটো আম নিয়ে যাচ্ছি।'

গাড়ী বেশ কিছুদূর চলে গেছে। বাগানে আম আগলাচ্ছিলো তখন একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়ে আর তার এক ছোট্ট ছেলে। মেয়েটির স্বামী গেছে বাগানের মালিকদের আম দিতে, আর আপন বাড়ীতে ভাত খেতে। কথায় কথায় নজরুল সে খবর মেয়েটির কাছে জেনে নিয়েছেন আর জেনে নিয়েছেন বাগানটি গাঁয়ের বড়োমিয়াদের। খানিক চুপচাপ থেকে সেই মেয়েটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'হ্যাঁগো মাসী, তোমরা বড়োমিয়াদের বাগানে আম আগলাও

আর আমাকে চিনতে পারলে না! আমি যে বড়োমিয়াদের ছোটো জামাই-এর ভাই।'

মেয়েটি খানিকটা হকচকিয়ে গেলো। বললো, 'না বাবা, চিনতে পারিনি তো। তা আপনি কবে এলেন?'

'এসেছিলাম আজই গো মাসী, চলে যাচ্ছি, আর এক কুটুম্ব-গাঁ, জরুরী কাজ আছে কিনা, কাল আবার ফিরে আসবো তোমাদের গাঁয়ে। সুমুদমা (ভাইয়ের বা বোনের শাশুড়ী) বললেন—বাগান দিয়ে যাও দুটো আম নিয়ে, তাই এলাম। তা মাসী, কোন্ গাছটার আম মিষ্টি বলোতো?'

মাসী দেখিয়ে দিতে-না-দিতে টপ করে গাছে উঠে পড়লেন নজরুল। তারপর বেশ কতকগুলো পাকা আম পেড়ে নিয়ে গামছায় বেঁধে বললেন, 'মাসী চললাম, কাল আবার আসবো।'

নজরুল আম নিয়ে দ্রুতপদে সবে পড়লেন। গাড়ী ধরতে বেশ খানিক সময় লাগলো। যখন গাড়ীতে পৌঁছুলেন তখন গাড়ীর সবাই অতোগুলো আম দেখে অবাক। 'হ্যাঁরে, কি করে যোগাড় কবলি এতো আম?'

'মাসী পাতিয়ে আর মিয়াদের জামাই-এর ভই সেজে'—হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন নজরুল।

নজরুলের কিশোর জীবনের এই শ্রেণীর বহু রসালো কাহিনী আছে।···নজরুল ইসলামের দুরন্তপনায় কাহিনীর মধ্যে রস-রঙ্গ আছে, আছে উপস্থিত জ্ঞান ও দুষ্টু-বুদ্ধির পরিচয়, আছে ঠাট্টা আর তামাশার ব্যঞ্জনা। আর আছে সতত সঞ্চরমান এবং সজীব প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। তাতে আর যাই থাক, হৃদয়হীনতার ছবি নেই, ক্রুর আচরণের অভিযোগ নেই।

প্রথম পাঠ অরিন্দম সেন

শৈল আর দুখু—দুই বন্ধু। ভাবও ওদের মধ্যে খুউব। একজনকে ছাড়া আরেকজনের চলে না এক দণ্ড। তাই স্কুল ছুটির পর শৈলর দুখু মিঞার বোর্ডিং-এ যাওয়া চাই-ই। সেদিন বোর্ডিং-এ গিয়ে কি মজা—খাটের উপর পড়ে থাকা বন্দুকটি তুলে নিয়ে জানালার শিক গলিয়ে মনের আনন্দে সদ্‌গতি করতে শুরু করে দিলো শৈল।

পথ থেকেই ফটাস ফটাস আওয়াজ পেয়ে দুখুর বুঝতে বাকি রইলো না—এ নিশ্চয়ই পঞ্চুর কাণ্ড! ঘরে ঢুকতেই দেখে মনের আনন্দে বন্দুক হাতে জানালায় দাঁড়িয়ে শৈল। 'নাঃ, পঞ্চু তাহলে বুঝতে পেরেছে আমি ওর উপর রাগ করেছি।'

উত্তর দিলো শৈল—'তুই রাগ করেছিস তো বয়েই গেছে পঞ্চুর। আসলে সখ মিটে গেছে তাই বন্দুকটা দিয়ে গেছে তোকে।'

দুখু বললো, 'যাক বাবা 'বড়োলোকের পোষ্যপুত্রের শখ মিটেছে ভালোই হয়েছে। এবার আমি আমার শখটা মিটিয়ে নিই খুব ভালো করে।'

বন্দুকটা নিয়ে দুই বন্ধুতে চললো এবার শহরের কাছেই খ্রীষ্টানদের কবরখানায়। আশে-পাশে জনবসতি নেই, এলাকাটা খুব নির্জন। সবুজ গাছপালা আর হরেক রকমের হাজার হাজার পাখীদের কল-কাকলীতে মুখরিত সেই কবরখানা। পাখী উড়তে দেখে শৈল বন্দুকটা দুখুর হাতে দিয়ে বললে—'মার না পাখী এইবার যতো পারিস।'

দুখু কিন্তু কিছুতেই পাখী মারতে রাজী নয়। তার ইচ্ছে সাহেব মেরে দেশ স্বাধীন করা। কবরখানার সারি সারি বেদীগুলিই তার লক্ষ্যস্থল। ভিতরের বড়ো বেদীটি হলো বড়োলাট, ছোটো হলে

ছোটোলাট, আরও ছোটো হলে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও— আরও অনেকে। বেদীর আকার আর পদমর্যাদা অনুযায়ী যেই না সাজানো—ব্যস, একের পর এক সীসের গুলী গিয়ে আঘাত করতে লাগলো।—'কি মজা, দিলাম একটাকে সাবাড় করে।' সে কি উল্লাস দুখুর। মনে হয় রক্ত-মাংসে গড়া এক একটা জ্যান্ত সাহেব নিধন করে চলেছে সে। শৈল কিন্তু সায় পায় না মন থেকে। অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করতে চায়। ওর যুক্তি—এঁদের কি দোষ—ওরা চাকরি করতে এসেছে পেটের দায়ে। দুখু বলে, 'তোকে নিয়ে পারা গেলো না। জানিস না বুঝি, ওরা তো ইংরেজরই প্রতিনিধি। আর ইংরেজ মানেই শত্রু আমাদের। ওদের তাড়াতে হবে সবার আগে আমাদের দেশ থেকে।'

'—কে তাড়াবে ? তুই তাড়াবি ?'

'—আলবৎ তাড়াবো। দিনের পর দিন চেষ্টা করে যাবো। প্রাণের ভয়ে বাপ বাপ করে পালাবে তখন। আর ওদের পালানো মানেই—আমাদের দেশ স্বাধীন।'

এমনি করে ইংরেজ মারার নেশায় মেতে ওঠে দুই বন্ধু। বন্দুকের ছর্‌রা ফুরিয়ে গেলেই নতুন করে ছর্‌রা নিয়ে যায় পঞ্চুর কাছ থেকে। সেদিন হলো কি, ছর্‌রা আনতে গিয়ে দেখে পঞ্চম জর্জের একটা ছবি যুৎসই করে দেওয়ালে টাঙাচ্ছে পঞ্চু। দুখু মিঞার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠলো পঞ্চুর কাণ্ড দেখে। বললে, 'কি রে, হঠাৎ তোর এতো রাজভক্তি কোথা থেকে এলো ?'

পঞ্চু বললে, 'বারে, কতো বড়ো মানুষ, সারা পৃথিবীতে ওর রাজত্ব কতো জানিস ? লেখাপড়ায় ভালো ছেলে হলে হবে কি—বাইরের কোনো খবরই রাখিস না তুই।'

মুখটা চুন করে দুখু বললে, 'ধ্যেৎ নিকুচি করেছে তোর পঞ্চম জর্জ। কালই আমি তোর বন্দুকটা ফেরত দিয়ে যাবো।'

'—বারে, আমি কি বন্দুক ফেরত চেয়েছি যে, তুই বন্দুক ফেরত

দিবি। তোর বন্দুকের শখ, তাই তোকেই তো দিয়ে দিয়ে দিয়েছি একেবারে।'

দুখু বলে, 'বেশ তো, ছর্‌রা ফুরিয়ে গেছে এবার তাহলে ছর্‌রা দাও।'

পঞ্চুও খুশী মনে দিয়ে দেয় ছর্‌রার প্যাকেটটা দুখুকে। ছর্‌রার প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দুখু বললে, 'না আর গোরস্থান নয়। বেদীগুলো সব বড়ো বড়ো, গুলী ছুঁড়লে লাগবে গিয়ে কি বল শৈল? চল, তোদের বাগানের পেঁপেগুলোর সঙ্গে মোলাকাত করা যাক। বন্দুকে হাত বশ করতে হলে পেঁপেই ভালো—তাই না? একবার ফটাস করলেই সীসের ছর্‌রা প্যাক করে বসে যাবে পেঁপের গায়ে। গুলী ঠিক লাগলো কিনা বুঝতেও অসুবিধে হবে না একটুও।'

একদিন গেলো দু'দিন গেলো, ছর্‌রা আর কিছুতেই পেঁপের গায়ে লাগে না। তৃতীয় দিনে কিন্তু গুলী গিয়ে লাগলো ঠিক পেঁপের গায়ে—আর সে কি আনন্দ দুখুর। ঐ গাছটাই নিশ্চয় বড়োলাট হবে। তারপরের গাছটা ছোটোলাট, তারপর ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও এবং আরো অনেকে। শৈল অনুনয় করে, 'দারোগা মেরে লাভ কি? ওরা তো ইংরেজ নয়, ওরা তো এদেশেরই লোক।'

দুখুর সেই এক কথা, 'হোকগে এদেশের লোক। ওরাও বিশ্বাসঘাতক। ইচ্ছে করলে একদিনে সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজের রাজযন্ত্রটাকে অচল করে দিয়ে চলে যাক না।'

বেশ কয়েকদিন জোর কদমে চললো ইংরেজ মেরে তাড়াবার খেলা। এদিকে ছর্‌রাও গেলো ফুরিয়ে। পঞ্চুর কাছে যেতে হবে শুনে দুখু বললো, 'আরে দাঁড়া না, আগে ওর পঞ্চম জর্জকে খতম করি।'

শৈল বললো, 'না না, ও বেচারা অনেক দূরে থাকে। ওকে অহেতুক কেন মারতে যাবে তুমি।'

দুখু বললো, 'ধ্যুৎ, তুই কিছু বুঝিস না। ঐ তো হলো পালের

গোদা। ও ইচ্ছে করলে একদিন সবাইকে ডেকে বলে দিতে পারে—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। আর ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও স্বাধীন।'

তাই যদি হয় আজই সাবাড় করা যাক পঞ্চম জর্জকে। এতক্ষণে সম্মতি পেলো শৈলর কাছ থেকে দুখু। এক চোখ বন্ধ করে তাক করলো দুখু। তারপর—ফটাস্! ব্যস, দিলে লাগিয়ে প্রথম গুলিটাই। তখন দুই বন্ধুর সে কি আনন্দ। আনন্দের আতিশয্যে ধেই ধেই করে নাচতেই শুরু করে দিলো দুই বন্ধুতে। দুখুর উল্লাস ছাড়িয়ে যায় শৈলকে—'খতম! পঞ্চম জর্জ খতম! পঞ্চু তোর পঞ্চম জর্জ খতম। হুররে, ভারতবর্ষ স্বাধীন এবার।'

দুখু মিঞা এমনি করেই পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করবার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যার লেখনী হয়েছিলো বৃটিশরাজের রোষানল স্বরূপ। নিশ্চয়ই এবার তোমরা চিনে ফেলেছো আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। আর শৈল? তিনি হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আমার জীবনে 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি নজরুল এসেছিলেন অনাবিল আনন্দ-আলোকের মতো, তাঁর মমতা-মধুর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছিলো বলে আমি আজ সকলের কাছে পরিচিতা হতে পেরেছি ; নয়তো সেই পরদানশীন খান্দানী ঘরের অন্তরাল হতে বাইরে আসার পথ আমি বুঝি পেতাম না।

ঢাকা থেকে তখন 'অভিযান' নামে একটি পত্রিকা বের হতো। আমার ছোটোমামা নওয়াবজাদা সৈয়দ ফজলে রব্বি সাহেব তখন ঢাকায় পড়তেন। তিনি জানতেন আমার বাল্যের লেখা-লেখা খেলার কথা। ছুটিতে বাড়ী গিয়ে আমার লেখা থেকে তিনি দু'তিনটি কবিতা নিয়ে আসেন। সে কবিতাগুলি 'অভিযানে' প্রকাশিত হয়। তখন নজরুল ঢাকায় মুকুটহীন সম্রাট, ছাত্রমহলে তিনি প্রিয় হতে প্রিয়তম। আমার লেখা তাঁর চোখে পড়ে। হঠাৎ বরিশালে বসে আমি অচেনা হাতের লেখা একখানা চিঠি পাই। লেখকের নাম দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। নজরুল ইসলাম ! তারপর চিঠিতে আলাপ হয়ে গেলো। কবি হলেন আমার দাদু-ভাই। দাদুকে লিখে দিলাম কলকাতা যাচ্ছি। তিনি লিখলেন, এবারে নিশ্চয় দেখা হবে। হয়েও ছিলো। মাসিক পত্রিকায় তখন প্রথম প্রথম আমার লেখা বের হতে শুরু হয়েছে। দাদু এসেছেন এক পত্রিকা অফিসে, শুনে লোক পাঠালাম ; আমার চিঠি পেয়েই তিনি চলে এলেন। আমরা তখন সারেং লেন-এ থাকি। তখনও পর্দার বাঁধন যায়নি, একটু শিথিল হয়েছে মাত্র। আমি গিয়ে তাঁর কদমবুসী করলাম। কী আনন্দে যে তিনি আমাকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন ; বললেন, 'তোমাকে আগে দেখিনি—তুমি এতটুকু ! তোমাকে আমি লুফ্‌ব।' ঘর শুদ্ধ

সবাই হেসে উঠলেন, দাদু অনর্গল আমাকে বলে চলেছেন, 'এতটুকু কেন, বেগম সাহেবা—আরে মিসেস-টিসেস হয়েছো, একটু ওজনে তো ভারী হবে, আগে জানলে একটা দোলনা আনতাম!' আমি প্রথম এই একেবারে বাইরের লোকের সামনে এসেছি যদিও, তবুও তাঁকে পর বলে মনে হলো না, কোনো কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করতে পারলাম না। তিনি কাছে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর ও দোয়া করলেন। আমি ধন্যা হলাম।

এরপরে তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন। একদিন—তখন শীতের দিন, আমি ও আমার বড়ো ভাই সন্ধ্যার আগে বসে দাবা খেলছি। দড়াম করে দরজা খুলে একটা কম্বল গায়ে দাদু এসে পড়লেন। দেখলেন, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। ভাইয়াকে বললেন, 'দাবা খেলছিলে সুফিয়ার সাথে? ও জানে দাবা খেলা?' ভাইয়া ও আমি বললুম, 'এই একটু একটু।' দাদু যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, 'মেয়েরা দাবা খেলে! আমি তো দেখিনি। আমি খেলবো তোমার সাথে—নিয়ে এসো পান।' দাদু দাবা খেলবেন আমার সাথে—শুনেই তো আমার বুক শুকিয়ে গেছিলো—পান আনতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। পান দিয়ে, চায়ের যোগাড় করে এসে দেখি, দাদু ও ভাইয়া দাবা পাত্‌ছেন। ভাইয়া খুব ভালো খেলতে পারেন। দাদু বললেন, 'তুমি ভাবছো তোমাকে ছেড়ে দেবো? এক বাজী খেলে নিই, ততক্ষণ তোমার নমাজ সেরে এসো, খেলতেই হবে।' কিন্তু মগরেব গেলো, এশা গেলো; পেয়ালার পর পেয়ালা চা, বাটার পর বাটা পান জুগিয়ে চললাম—বাজী আর শেষ হয় না।

রাত ১২টা বেজে গেলো; অতো রাত্রে কে আর ভাত খায়। রুটী, গরম পরটা তৈরী করে ভাইয়া ও দাদুকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলাম; কিন্তু তাঁরা পরোটা-গোশত খেলেন, না কাগজ খেলেন, বোঝা গেলো না। সারা রাত কেটে গেলো। পরদিন সকাল ৭টার সময় দেখি দাবার ছক উল্টে দিচ্ছেন আর হো হো করে হেসে ভাইয়ার হাত ধরে

ঝাঁকুনি দিয়ে দাদু বলছেন, 'নাঃ, খেলে সুখ পাওয়া গেলো, জিত্‌তেও পারলাম না, হারালামও না, ড্র হয়ে গেলো—সত্যিই খেলতে জানো ; আমাকে আর এতক্ষণ কেউ বসাতে পারেনি এক কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া।'—বলে আমার কৃশাঙ্গ ভাইয়ার হাতে যে ঝাঁকি দিলেন সেই আনন্দিত ঝাঁকুনির ব্যথা বেশ কয়েকদিন ছিলো।

দুপুর বেলায় খেতে খেতে দাদু বললেন, 'সুফু, তোমার রান্নার তারিফ করবো, না কবিতার তারিফ করবো?' আমি বললাম, 'দুটোরই।' দাদু বললেন, 'তা না করলে তো মিথ্যে বলে কাজীর বিচারের দুর্নাম হবে!'—বলেই বললেন, 'রাত্রে তুমি আমাদেরকে খাইয়ে দিয়েছিলে, না?' আমি বললাম, 'তা কি তোমার মনে আছে?' বললেন, 'মনে পড়েছে। তোমার মতো বোন যার নেই, সে সত্যিই দুর্ভাগা।'

আমাদের কাছে রোজ আসাটা পুলিসের চোখে পড়লো। তাঁরা দাদুর পিছু নিলেন। একদিন দাদু বসে আছেন—এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমাদের কাছে আসেন কবি, তাঁকে দেখতে পাড়ার অনেক লোকই আস্‌তো। দাদু তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি টিকটিকি, জানি ঠিক ঠিকই'—আরো একটা লাইন কী বলেছিলেন আজ আমার মনে নেই। লোকটি মুখ লাল করে উঠে চলে যেতেই আমি এসে বললাম, 'কী করে তুমি চিনলে দাদু?' হেসে দাদু বললেন, 'গায়ের গন্ধে। বড়ো কুটুম্ব যে।' তাঁর এমনি হাজারো পরিহাসের খুঁটিনাটি আজও মনে পড়ে। হাসিতে খুশীতে আনন্দে উজ্জ্বল জীবন আজ কী হয়ে আছে, ভাবলে মন ব্যথায় ভরে ওঠে।

প্রায় দিন দাদুর কবিতা আবৃত্তি ও গান হতো আমাদের বাড়ীতে; ঘরে আর রাস্তায় ভিড় জমে যেতো। তিনিই বিখ্যাত গায়ক কে. মল্লিক সাহেবকে আমাদের বাড়ীতে আনেন। কতরূপে যে তিনি আমাকে জীবনে গৌরব বোধ করার উপকরণ জুগিয়েছেন! ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে দিলীপ রায়, সুভাষ বোস ও গল্পের যাদুকর শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে দাত্থ সগৌরবে বললেন, 'মুসলিম মেয়েরা নাকি লিখতে জানে না, এর লেখা পড়ে দেখবেন, এ আমার বোন।' সুবিখ্যাত গায়ক হরেন ঘোষ বললেন, 'আপনার বোন তো, লিখতে পারবেনই।' দাত্থ বললেন, 'না, ও লিখতে পারে বলেই আমার বোন।' সকলের সামনে লজ্জার চেয়ে বেশী গৌরব বোধ করেছিলাম তাঁর বোন বলে পরিচিতা হতে পেরে।

ছোটো-গল্পে নজরুল

মিহির সেন

কবি নজরুল ইসলাম জনমানসে আজ এক বাঁধ-ভাঙা বেপরোয়া বিদ্রোহী যৌবনের প্রতীক। তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতাই এই ভাব-রূপের নির্মাতা। কিন্তু তাঁর কবিতায় আচ্ছন্ন অনেক পাঠকই হয়তো অবহিত নন যে, সাহিত্যে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশ ছোটো-গল্পের মাধ্যমেই। প্রায় একই সময়ে কাব্য-চচায় হাত দিলেও কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশে বেশ কিছুদিন কুণ্ঠিত ছিলেন তিনি। এবং পাঠকদের কাছেও গাল্পিক হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কবি নিজেও বলেছেন—'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটো-গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।'

নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। গল্পটি করাচী সৈন্য শিবির থেকে প্রেরিত, এবং ১৩২৬এর জৈষ্ঠ্য সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছাপার হরফে প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম রচনা। ঐ বছরই 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য প্রত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় 'হেনা' ও 'ব্যথার দান'। এবং এখান থেকেই তাঁর গল্পের যাত্রা শুরু।

অবশ্য অজস্র ধারায় রচিত কবিতা ও গানের তুলনায় তাঁর গল্পের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মোট আঠারোটি। তাঁর কবিখ্যাতি তাঁকে গল্পে শেষ পর্যন্ত স্থিত থাকতে দেয় নি। এবং এ-কথাও স্বীকার্য, কবি ও গীতিকার হিসাবে তাঁর যে স্ফুরণ ও সিদ্ধি, গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। হতে পারে চর্চার অভাবে; অথবা তাঁর শিল্প-প্রতিভা হয়তো সার্থক আধার হিসাবে কাব্য ও গীতেরই আশ্রয় খুঁজছিলো, তবু একজন অনস্বীকার্য সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক বিচার ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

নজরুলের ছোটো-গল্প বিচারের প্রারম্ভেই এ-কথা স্বীকার করে

নেওয়া ভালো যে, বাংলা ছোটো-গল্পের ক্ষেত্রে তিনি কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে তাঁর পূর্বেই ছোটো-গল্পের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিশালী গল্প-লেখকেরা এসে যাওয়ায় পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য সহানুভূতিও সমালোচকের কাছে প্রত্যাশিত নয়।

কিন্তু নজরুলের গল্প বিচারের নিরিখ ভিন্ন। সাহিত্যের এক শাখায় কৃতী শিল্পীর, অন্য শাখার পরিপূরক রচনা হিসাবে তার পৃথক মূল্যায়ন। শিল্পীর সামগ্রিকতা ও সৃষ্টির পরম্পরা বিচারই যার লক্ষ্য।

আঙ্গিক ও চরিত্র বিচারে নজরুলের গল্পকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়। 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি প্রথম পর্ব-ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্ব—তুলনামূলকভাবে পরিণত বয়সে রচিত 'শিউলি-মালা' গ্রন্থভুক্ত গল্প ক'টি।

নির্মোহ বিচারে নজরুলের প্রথম পর্বের অনেক গল্পেই ছোটো-গল্পের প্রত্যাশিত ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলা যায় না। সার্থক ছোটো-গল্পের জন্য যে পরিধি, পরিমিতি বোধ, সংযম, ভাবঐক্য ও গভীর ব্যঞ্জনা প্রয়োজন, তা অনেক গল্পেই অনুপস্থিত, তা ছাড়াও লেখক বহু গল্পেই নির্মোহ জীবন-দ্রষ্টার ভূমিকায় থাকতে পারেন নি; ভবঘুরে, বন্ধনহীন, ভাবপ্রবণ ব্যক্তি-নজরুলের আত্মক্ষেপণ ঘটেছে সে-সব ক্ষেত্রে। এমন কি হাবিলদার নজরুলের ছায়াও বহুক্ষেত্রে অস্পষ্ট নয়।

এ পর্বের গল্পগুলির বৈচিত্র্য কম। গল্পগুলি একই ভাবধারার বিচ্ছিন্ন ক'টি স্রোত যেন। প্রতিটি গল্পের ভিতর দিয়ে একই উদাস ব্যথিত বিরহীর মূর্ত হাহাকার প্রবাহিত। অথচ বহু ক্ষেত্রেই এ বিরহ বা বিচ্ছেদ যে ঘটনার পরম্পরায় অপরিহার্য ছিলো, তা নয়। কিছু ক্ষেত্রে তা বন্ধন-ভীরু নায়কের স্বেচ্ছাকৃত মনে হয়। অথবা হয়তো, জীবন ও প্রেম প্রসঙ্গে, পাপ-পুণ্য, প্রেয় ও শ্রেয়র প্রশ্নে বিধ্বস্ত দিশাহারা ভাবপ্রবণ নায়কের ক্ষেত্রে এও এক অমোঘ ভবিতব্য!

বিশেষ করে 'অতৃপ্ত কামনা', 'ঘুমের ঘোরে', 'ব্যথার দান' প্রভৃতি গল্প প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য।

নজরুলের প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও গল্পগুলি আদৌ যুদ্ধ বিষয়ক নয়। বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্র এ-সব গল্পে প্রেমাহত পলায়নপর বিবাগী নায়কদের নিভৃত আশ্রয়।

লেখক নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিন বছর করাচীর সৈন্য শিবিরে ছিলেন। এবং সেখাইনেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু। সুতরাং তাঁর তরুণ ভাবপ্রবণ মনে যুদ্ধ যে গভীর রেখাপাত করবে, এবং গল্পে তা প্রতিফলিত হবে, সে তো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবেই বোধ হয় যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃসংশতা বা অমানুষিকতা তাঁর গল্পে আসে নি। যেমন এসেছিলো এরিখ মারিয়া রেমার্ক প্রমুখ ইউরোপীয় সৈনিক-লেখকদের সাহিত্যে।

বরং নজরুলের গল্পে মহাযুদ্ধ যেন কিছুটা ধর্ম-যুদ্ধের গৌরব নিয়ে উপস্থিত। 'ব্যথার দান'এর অনুতপ্ত খলনায়ক সয়ফুল-মুলুকের জবানীতে যা আংশিক প্রতিফলিত—'আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কতো মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান্ ব্যক্তি-সঙ্ঘের একজন।'

অবশ্য লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথম মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সাহচর্যমূলক নীতি স্মরণে রাখলে, খুবই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক বলেই মেনে নিতে হয়।

কিন্তু যতই ত্রুটি থাক, এ গল্পগুলির অনস্বীকার্য আকর্ষণ—কাব্যময়তা, অনাবিল আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা, যা সহজেই

পাঠককে অভিভূত করে। বিশেষ করে ভাষা বহু ক্ষেত্রেই যেন গদ্য-শরীরে নিটোল কবিতা। অথচ প্রয়োজন বোধে এরই ভিতর তিনি অবলীলাক্রমে এব্ড়ো-খেব্ড়ো দিক, হাজার ফ্যাচাং, খামখা ধুমসুনী, মার-হাট্টা হাত, ডুকরে ডুকরে কাঁদা, বোকা ভ্যাবাকান্ত ইত্যাকার আটপৌরে ঘর-চলতি শব্দও ব্যবহার করেছেন।

চেহারা ও চরিত্র বিচারে নজরুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি সম্পূর্ণ পৃথক। এবং নিঃসন্দেহে এগুলিকে সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প বলা যেতে পারে। বিশেষ করে 'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা', 'অগ্নিগিরি', 'শিউলি-মালা' প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য। উচ্ছ্বাস এখানে অনেক সংযত, ভাষা ঋজু, গল্পের গাঁথুনিও অনেক দৃঢ়।

'পদ্ম-গোখরো'য় রুদ্ধশ্বাস রহস্যময়তা ও অতি প্রাকৃত পরিবেশ রচনায়, এবং 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি'র নায়ক হিসাবে আল্লারাখা ও সবুর আখন্দের চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখের দাবী রাখে। লেখক যে ব্যঙ্গ-কৌতুকেও কতো সচ্ছন্দ ছিলেন তারও স্বাক্ষর বহন করছে 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি'। এবং লিরিক-ধর্মী প্রেমের গল্প রচনায় তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ, 'শিউলি-মালা' গল্পটি।

অন্তত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি পড়ে অপূর্ণ প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে মনে হয়, উপযুক্ত চর্চায় নজরুল হয়তো একদিন বাংলা সাহিত্যের একজন কৃতী গাল্পিকও হতে পারতেন!

সে একটা নাটকই বলতে হবে !

নজরুলকে সুরেশবাবু বললেন, 'গাড়ীতে ওঠো।'

কবি নিঃশব্দে গাড়ীতে বসলেন।

সুরেশবাবু ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করতেই পূর্ব নির্দেশমতো গন্তব্য-স্থানে গাড়ী চললো।

কবি বুঝতেই পারলেন না যে, তাঁকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আকাশবাণীর কম্পাউণ্ডে গাড়ী রেখে কবিকে নিয়ে সুরেশবাবু উঠে এলেন তাঁর চেম্বারে। কবি তখন বললেন, 'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ?'

কতকটা প্রত্যয় নির্ভর করে কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, 'এটা অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং এবার থেকে তোমায় রেডিওর জন্যে গান লিখতে হবে।'

কবি কথাটা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আনার জন্য সুরেশবাবু পূর্ব পরিকল্পনা মতন যে এই কাজ করছেন তা তাঁর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। অবশ্য শুধু নজরুলই যে রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়। সে যুগে মর্যাদাসম্পন্ন কোনো সাহিত্যিক রেডিওতে আসা অপছন্দ করতেন। রেডিওর প্রসঙ্গ উঠলেই নজরুল বহুবার বলেছেন : 'আগে কবি-রাজকে এনে 'টক' প্রচার করো তবে আমি যাবো।' শেষের দিকে কবিগুরুও কালিম্পং থেকে বেতারে কথিকা প্রচার করেছিলেন।

উক্ত ঘটনা ১৯৩৮ সালের। কবির সঙ্গে সুরেশবাবুর যোগাযোগ অবশ্য এর বহু পূর্বের। বিদ্রোহী কবিতা পড়ে সুরেশবাবু মুগ্ধ হয়ে-

ছিলেন। একদিন নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে এসে সুরেশবাবু কবির সঙ্গে আলাপ করে যান। তারপর বহুবার বহু আলাপ হয়েছে। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ আলাপ অক্ষুণ্ণ ছিলো। এই সময়ে সুরেশবাবু আইন পাশ করে ওকালতির জন্য মৈমনসিংহে চলে যান। কিন্তু আইন-ব্যবসা জমে উঠলেও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো, ফলে তিনি বেতারে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেই বছরেই Music Director-এর পদে উন্নীত হন। সেই থেকে কবির সঙ্গে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে।

কবি ১৯৩৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে রেডিওতে রইলেন। রেডিওতে যোগাযোগের মূলে যে সুরেশবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাজ করেছিলো সে-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই! এখানে সুরেশবাবুর সক্রিয় সহযোগিতায় কবির সঙ্গীত-জীবনের এক গৌরব ময় নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেলো।

কেবল সঙ্গীত রচনা নয়, বেতারের জন্য কবিকে দিয়ে সুরেশবাবু অনেক কবিতাও রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। অসংখ্য কবিতাবলীর মধ্যে একটি কবিতা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। কবিতাটির নাম 'রবিহারা'। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো ২২শে শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে। এবং যথারীতি বেতার মারফত প্রচারিতও হয়েছিলো। নজরুলের সঙ্গীত জীবনকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতেই। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ সঙ্গীতে এবং রাগের কারুকার্য সূক্ষ্মতম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। রাগ এবং রাগিণীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে এই পর্বের সঙ্গীতগুলি দুর্লভ সৌন্দর্যে উৎকর্ষিত। নজরুল সঙ্গীতের বলিষ্ঠতা ও সুর-বৈচিত্র্যের অন্বেষণে গবেষকদের লক্ষ্য এই পর্বের সঙ্গীতাগুলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

বেতারে কবির জন্য তিনটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিলো : 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা', 'নব-রাগমালিকা'—এই তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীত রচনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'হারামণি' অনুষ্ঠানটি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। রাগ-রাগিণীতে সমৃদ্ধ হয়ে না উঠলে কোনো দেশের সঙ্গীত প্রাচুর্যময় ও শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না। এই সহজ সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বাংলার সঙ্গীতকে রাগ-রাগিণীর প্রাচুর্যে অনবদ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রতিটি সঙ্গীত লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে-যাওয়া সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। এই সকল রাগ-রাগিণীর মধ্যে যথা, অনন্ত গৌড়, মালগুঞ্জ, যুঁই, আহির-ভৈরব, বাঙাল-বিলাবল, আনন্দ-ভৈরব, বসন্ত মুখারি, উমা তিলক, শৃঙ্গার বিরহাগ্নি, লঙ্কাদহন, সারং জৌন-বাহার, রক্তহংস সারং ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে আহীর-ভৈরব শীর্ষক বিখ্যাত নজরুল গীতিটি আহির-ভৈরব সুরে লিখিত। 'হারামণি' অনুষ্ঠান শুরু হবার প্রথমে সুরেশবাবু রাগ ও সুরের বিশ্লেষণ করতেন।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাগ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে মোটামুটি একটি ধারনা গড়ে ওঠার পর সেই রাগে রচিত গানটি কবি নিজে গাইতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হারামণি অনুষ্ঠানের কোনো গান বাইরের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো হতো না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত-গুলি রচনার জন্য কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু রচিত ফার্সী ভাষায় এবং বিপুলতায়তন গ্রন্থ আর নবাব আলী চৌধরী কৃত 'ম আরিফুন্ নাগমাত' বিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থ দু'খানি কবি অতি যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এ ছাড়াও রাগ-রাগিণী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তিনি সুরেশবাবুর কাছ থেকেও পেতেন। এই দ্বিবিধ মূলধন সম্বল করে কবি গভীর রাত্রে

ছিলেন। একদিন নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে এসে সুরেশবাবু কবির সঙ্গে আলাপ করে যান। তারপর বহুবার বহু আলাপ হয়েছে। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ আলাপ অক্ষুণ্ণ ছিলো। এই সময়ে সুরেশবাবু আইন পাশ করে ওকালতির জন্য মৈমনসিংহে চলে যান। কিন্তু আইন-ব্যবসা জমে উঠলেও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো, ফলে তিনি বেতারে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেই বছরেই Music Director-এর পদে উন্নীত হন। সেই থেকে কবির সঙ্গে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কবি ১৯৩৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে রেডিওতে রইলেন। রেডিওতে যোগাযোগের মূলে যে সুরেশবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাজ করেছিলো সে-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই! এখানে সুরেশবাবুর সক্রিয় সহযোগিতায় কবির সঙ্গীত-জীবনের এক গৌরব ময় নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেলো।

কেবল সঙ্গীত রচনা নয়, বেতারের জন্য কবিকে দিয়ে সুরেশবাবু অনেক কবিতাও রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। অসংখ্য কবিতাবলীব মধ্যে একটি কবিতা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। কবিতাটির নাম 'রবিহারা'। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো ২২শে শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে। এবং যথারীতি বেতার মারফত প্রচারিতও হয়েছিলো। নজরুলের সঙ্গীত জীবনকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতেই। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ সঙ্গীতে এবং রাগের কারুকার্য সূক্ষতম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। রাগ এবং রাগিণীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে এই পর্বের সঙ্গীতগুলি দুর্লভ সৌন্দর্যে উৎকর্ষিত। নজরুল সঙ্গীতের বলিষ্ঠতা ও সুর-বৈচিত্র্যের অন্বেষণে গবেষকদের লক্ষ্য এই পর্বের সঙ্গীতাঞ্জলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

বেতারে কবির জন্য তিনটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিলো : 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা', 'নব-রাগমালিকা'—এই তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীত রচনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'হারামণি' অনুষ্ঠানটি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। রাগ-রাগিণীতে সমৃদ্ধ হয়ে না উঠলে কোনো দেশের সঙ্গীত প্রাচুর্যময় ও শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না। এই সহজ সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বাংলার সঙ্গীতকে রাগ-রাগিণীর প্রাচুর্যে অনবদ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রতিটি সঙ্গীত লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে-যাওয়া সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। এই সকল রাগ-রাগিণীর মধ্যে যথা, অনন্ত গৌড়, মালগুঞ্জ, যুঁই, আহির-ভৈরব, বাঙাল-বিলাবল, আনন্দ-ভৈরব, বসন্ত মুখারি, উমা তিলক, শৃঙ্গার বিরহাগ্নি, লঙ্কাদহন, সারং জৌন-বাহার, রক্তহংস সারং ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে আহীর-ভৈরব শীর্ষক বিখ্যাত নজরুল গীতিটি আহির-ভৈরব সুরে লিখিত। 'হারামণি' অনুষ্ঠান শুরু হবার প্রথমে সুরেশবাবু রাগ ও সুরের বিশ্লেষণ করতেন।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাগ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে মোটামুটি একটি ধারনা গড়ে ওঠার পর সেই রাগে রচিত গানটি কবি নিজে গাইতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হারামণি অনুষ্ঠানের কোনো গান বাইরের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো হতো না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত-গুলি রচনার জন্য কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু রচিত ফার্সী ভাষায় এবং বিপুলতায়তন গ্রন্থ আর নবাব আলী চৌধরী কৃত 'ম আরিফুন্ নাগমাত' বিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থ দু'খানি কবি অতি যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এ ছাড়াও রাগ-রাগিণী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তিনি সুরেশবাবুর কাছ থেকেও পেতেন। এই দ্বিবিধ মূলধন সম্বল করে কবি গভীর রাত্রে

একান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়ে হারামণির গানগুলি রচনা করতেন। সঙ্গীত রচনার জন্য কোনো সময় কবিকে এমন তপস্যা নিমগ্ন হতে দেখা যায়নি। অথচ দুর্ভাগ্য, আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত অধিকাংশ গান বর্তমানে পাওয়া যায় না। বেতারে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়েছিলো 'গীতি-বিচিত্রা'। অনুষ্ঠানটি মাসে দু'বার প্রচারিত হতো, পৌনে এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। কবি যতদিন বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিয়মিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে—আশি হতে নব্বুইটি গীতি-বিচিত্রা বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য দেশের আপামর জনসাধাবণ সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো।

'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটিকে সঙ্গীত আলেখ্য অনুষ্ঠান বলা চলে। মূল একটি বিষয় অবলম্বনে দু'টি করে সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। এই অনুষ্ঠানে যে সকল সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান হলো 'কাফেলা', 'কাবেরী তীবে' 'ছন্দসী' ইত্যাদি।

'কাফেলা' আলেখ্যটিতে দেখা যায় এক দল মরুযাত্রী এগিয়ে চলেছে। তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। দিবস সন্ধ্যার বুকে বিলীন হয়ে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে কাফেলার গতিবেগ এবং মেজাজ। বাণী এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কাফেলা সঙ্গীত আলেখ্যটি অপূর্ব। মরুভূমির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আরব দেশ থেকে সংগৃহীত আরবীয় সুর সমৃদ্ধ রেকর্ড থেকে কবি সুর সংগ্রহ করেছিলেন। এই রেকর্ডগুলি গ্রামোফন কোম্পানী কবির জন্য আরব থেকে আনিয়েছিলেন। কাফেলার কয়েকটি গানে আরবী সুর বিধৃত ছিলো, 'কাবেরী তীরে' গীতিনাট্যটি একটি নিটোল ভালোবাসার কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছ'টি গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। নজরুলের বিখ্যাত গান 'কাবেরী নদী জলে কে গো

বালিকা'। এই গানটি গীতিনাট্যের জন্যই রচিত। পরে এটি সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়।

ছন্দসী গীতিনাট্যটি দু'টি অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হয়। 'ছন্দসী'র রচনা ও প্রচার প্রধানতঃ সুরেশবাবুর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে আট-দশটি সংস্কৃত ছন্দকে অনুসরণ করে কবি গান রচনা করেন। সংস্কৃতের যে ক'টি ছন্দকে কবি অনুসরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো—মালিনী, বসন্ত তিলক, তনুমধ্যা, ইন্দ্রজা, মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি। গীতি-বিচিত্রার আর একটি অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো কেবলমাত্র কীর্তনের সুরে। আশি হতে নব্বুইটি অনুষ্ঠানের জন্য কবি কমপক্ষে পাঁচশো গান রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে সমসাময়িক কালে যে স্বল্প সংখ্যক গান রেকর্ড করা হয়েছিলো বর্তমানে সেগুলি ছাড়া আর একটিও পাওয়া যায় না।

'হারামণি' এবং 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠান দু'টি ছাড়াও কবির সঙ্গীত এবং সুরে প্রচারিত হতো 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানটি। 'হারামণি' অনুষ্ঠানে তিনি যেমন অপ্রচলিত বা হারিয়ে যাওয়া রাগ-রাগিণীগুলির পুনঃপ্রচলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, তেমনি 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিলো নতুনতর সুর সৃষ্টির দিকে। নতুন সুরগুলির মধ্যে যেমন, উদাসী-ভৈরব, অরুণ-ভৈরব, শিবানী-ভৈরবী, আশা-ভৈরবী, রেণুকা, অরুণ রঞ্জনী, নির্ঝরিণী, দোলনচাঁপা, ধনকুন্তলা, সন্ধ্যামালতী, মীনাক্ষী, রূপমঞ্জরী প্রধান।

সেই সময় কবি সভা-সমিতি ছেড়েছিলেন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে নিস্তব্ধ গৃহে সঙ্গীত-সুর সৃষ্টির দুরূহ মৌন তপস্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

সারাজীবন বিপুল অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা ও যে সকল শ্রমে সঙ্গীত ও সুর রচনা করেছেন কবি নজরুল—ছোট্ট একটি নিবন্ধে তার সর্বাঙ্গীন আলোচনা অসম্ভব। আমি নজরুলের রেডিওতে যোগদান ও তৎকালীন কিছু সঙ্গীত, সুরের সূচীপত্রের কয়েকটি দিক স্পর্শ করতে চেষ্টা করলাম মাত্র।

নজরুলের কিশোর-মন

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

বৈষ্ণব ধার্মিকেরা মনে মনে যে 'নওল কিশোরে'র কল্পনা করেন, তার বয়স মোটামুটিভাবে সাত থেকে বারো। শাক্ত শাস্ত্রকাররা যে-কুমারী গৌরব কথা লিখে গেছেন, তারও বয়স সাত থেকে বারো। অর্থাৎ সাত থেকে বারো বছর—এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের বলা হয় কিশোর কিশোরী। মনোবিজ্ঞানীরাও এই বয়সকে কিশোরকাল বলে নির্দেশ করেন। ডাক্তারী মতে তেরো বছর বয়সের ঊর্ধ্ব হলেই পূর্ণবয়স্কের কোঠায় ফেলা হয়।

মানুষের জীবনে এই বয়সটা বড়ই আশ্চর্য! মনের তিন-ভাগে তখন কল্পনার নীল সমুদ্রের ঢেউ। যুক্তির শরিকানায় সুধু এক-ভাগ। চাঁদ, সূর্য এমনকি বাঘও তখন মামা। অদেখা মাঠগুলি তেপান্তর, অজানা নৌকাগুলি ময়ূরপঙ্খী, অদৃশ্য পাখিগুলি ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী।

এই মুহূর্তে মনের মধ্যে ডুব দিয়েছি। ষাট বছর বয়সে 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে রবীন্দ্রনাথ যেমন করে ডুব দিয়েছিলেন। বয়স্ক নজরুলও যেমন করে মনের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন। ডুব দিতেই পেয়ে গেলাম হারানো কৈশরকে। সেই সাত কিংবা আট বছরের আমি। রবিঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ'এর কিছু কিছু কবিতা পড়তে পেয়েছি। ছড়ার সীমাবদ্ধ গণ্ডী পেরিয়ে কবিতার সূক্ষ্ম কল্পনার জগতে বিচরণের জন্য রবিঠাকুর ডাক দিয়েছেন। মাকে কেন্দ্র করে আমি সেই অদ্ভুত জগতে আনাগোনা শুরু করলাম। খোকার দপ্তর পেরিয়ে, ছড়ার চৌকাঠ পেরিয়ে, শিক্ষকের নীতিকথার বেড়া ডিঙিয়ে একটা আশ্চর্য রাজ্যের সন্ধানে যাবার সে কী ব্যাকুলতা! দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে আমার তখন মন ভরত না। রাক্ষস, বাঘ, ডাকাত, সিংহের গল্পে যদিও দুর্দান্ত হবার প্রেরণা পেতাম, তবু মন

ভরত না। শেষে আমি নিজেই দশ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করে দিলাম।

নজরুল সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এই সামান্য ভূমিকা লেখার কারণ হলো, বাংলা দেশটা আসলে কবিতার দেশ। এ দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর নিজেরাই কবিতা লিখতে পারে। ভারতবর্ষে আর কোথাও এমনটি নেই। কিশোর-কিশোরীর এমন স্পর্শকাতর মন গুজরাটে কিংবা রাজস্থানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবিঠাকুরের—

'মা, তুই হতিস নীলবরণী,
আমি সবুজ কাঁচা।
তোর হতো, মা, আলোর হাসি—
আমার পাতার নাচা।'

এই কবিতাংশের মাধুর্যটুকু অনেক রাজ্যের কিশোর কেন, তার মাকেও হৃদয়ঙ্গম করানো দুষ্কর হবে।

রবিঠাকুরের মতো নজরুলও বাংলার কিশোর-কিশোরীর জন্য কবিতা লিখে গেছেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা আদর্শের ব্যবধান আছে। কিশোরের সূক্ষ্ম কল্পনাকে গভীরতর সৌন্দর্যের দিকে উদীপ্ত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল চেয়েছেন কিশোরবাহিনীর শক্তিকে গঠনাত্মক ও কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করতে। সুযোগের অভাবে, সংগঠনের অভাবে, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে জাতীয় সম্পদের যেন নিদারুণ অপচয় না হয়। জাতি-গঠনে, দেশগঠনে, কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠনে শিশুর মনের মুক্তি তিনি খুঁজেছেন। শিশুমনে সংক্রামিত করতে চেয়েছেন ভাবীকালের নির্ভীক, সত্যবাদী, আদর্শনিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সংস্কৃতিবান হৃদয়বত্তাকে।

'তুমি হতে পারো রবীন্দ্রনাথ,
নয়তো বিবেকানন্দ।'

শিশুর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ শিশু বা কিশোরের কল্পনাকে নৈর্ব্যক্তিক, নিরাকার আনন্দে পৌঁছে দেবার যে-চেষ্টা করেছিলেন,

এবং কবিতার যে-কলাকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিলো না।

কাব্যের কলাকৌশল প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুল দুর্বল। শব্দযোজনা এবং ছন্দপ্রয়োগে নজরুল বেপরোয়া। নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারে নজরুল উদাস।

কিন্তু নজরুলের যা বৈশিষ্ট্য, সেগুলি তাঁর কিশোরপাঠ্য কবিতা-গুলিতে উপস্থিত আছে। মানুষের অসামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা বিষোদ্গার করে। হিটলার, মুসোলিনীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা! ভারতের ভূতপূর্ব ইংরেজ শাসকদের প্রতিও প্রচণ্ড ঘৃণা! দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! দেশ-বিদেশ ঘোরার জন্য কী ব্যাকুলতা!

'হাঁটু ভেঙে আনবো আমার
বিট্‌লে ভাই ঐ হিটলারে,
উড়ে বামুন করবো তারে,
দেখো আসছে সোমবারে।'

ছন্দ সম্পর্কে নজরুল খুব সাবধানী নন। তা তত্ত্বেও তাঁর 'চিঠি' নামক কবিতার আরম্ভের চার লাইন বড় চমৎকার!

'ছোট্ট বোনটি লক্ষ্মী
ভো জটায়ু পক্ষী!
য়্যাব্বড় তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।'

নজরুলের 'ঘুম জাগানো পাখী' নামক কিশোর-পাঠ্য কাব্যগ্রন্থের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হীরকদ্যুতি চোখে পড়বে! দেখুন, কী সুন্দর এই স্তবকটি:

'আকাশ-খুকির রুপার ঘুঙুর
যাস্ নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ূর,
ময়ূর ভাবে মেঘ-তুষার।'

নজরুলকে আমি দেখিনি। নজরুলকে আমি পেয়েছি।

পেয়েছি আমার বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণায়, যৌবনের স্পর্ধায়—উন্মীলনে আর উজ্জীবনে। জীবনের ধাপে ধাপে নজরুলকে আমি নতুন নতুন করে পেয়েছি, পেতে পেতে নজরুল কখন আমাকে একেবারেই পেয়ে বসেছে।

আমার তখন সেই চোখে-আলো-লাগার হঠাৎ-ভালো-লাগার সময়। মনের মধ্যে একটা-দুটো কুঁড়ির ঘুম ভাঙছে, রং ধরছে।—ঠিক তখনই নজরুলের কবিতা আমার বুকের মধ্যে উঠে এলো। তবে সে-কবিতা প্রলয়ের মন্ত্রোচ্চারণ নয়, বিশ্বরমার স্তবগান।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। কবিতা পড়তে ও চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে ভালো লাগে। আমার এই বিশেষ গুণের কথা কখন কীভাবে হেডমাষ্টার শচীনবাবুর কানে এলো। তিনি একদিন আমাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। আমার কচি গলায় ঝংকৃত হয়ে উঠলো নজরুলের অনামিকা :

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্নসহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া···

শচীনবাবু বাধা দিলেন না, সবটা শুনে বললেন, 'গুড্, এতোবড়ো কবিতা মনে রেখেছো ; কিন্তু এ-কবিতার মানে বোঝো কি ?'

আমি নির্বাক। নিরুত্তর। না, মানে আমি বুঝি না, তার জন্য বিন্দুমাত্র মাথাব্যথাও নেই। ভোরের আবছায়ায়, আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতায় সে এক আশ্চর্য ভালো লাগা।

মনে পড়ে, নজরুলের ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় তারও আগে,

পাঠ্য-বইয়ের পাতায়—সেই যখন পড়ছি, 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ…'। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, টানা টানা বড়ো বড়ো চোখ। বিশাল মুখমণ্ডল পৌরুষে দীপ্ত, মাধুর্যে রমণীয়। সেই ছবি আমার চোখে লেগে রইলো, বুকে বিঁধে গেলো।

আকাশে তখন বোমারুর গর্জন, বাতাসে বারুদের গন্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর। বোমার ভয়ে শহর ছেড়ে আমরা চলে এলাম ছায়ানিবিড় এক গ্রামের নির্জনতায়।

শাপে বর হলো। পেলাম গাছের সবুজ, পাখির ডাক, জোনাকির আলো আর ঝিরঝিরে এক ছোট্ট নদী।

আর নিতান্ত ঘটনাচক্রে হাতে এলো একখানি কবিতার বই—সঞ্চিতা।

উদাস-করা নির্জন দুপুরে নিজেকে বড়ো একা মনে হতো। সঞ্চিতার পাতা ওল্টাতুম। ছন্দ ধ্বনি শব্দ আমার কানে ঝংকার তুলতো, গলায় গুনগুনিয়ে উঠতো। আমার চারদিকের সব কিছুর সঙ্গে, সব ভালো-লাগার সঙ্গে নজরুলের কবিতা একাকার হয়ে যেতো।

তন্ময় হয়ে পড়েছি:

সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা
দিসনে গোলাব ছিটে খাস লো মাথা…

আরও পড়েছি:

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধ্বনি স্মরিছে পতি…

লালসা-আলস-মদ কী তা জানতুম না, তবু সেই ধ্বনি সেই ছন্দ সেই সুর আমাকে মোহাবিষ্ট করে রাখতো, কী এক নেশায় যেন বুঁদ হয়ে যেতাম।

যুদ্ধ থামলো। আমরা শহরের লোক আবার শহরে ফিরে এলাম। আমি তখন পনেরোয় পা দিয়েছি। জগৎ ও জীবনের দিকে অন্য এক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করেছি।

যুদ্ধ থেমেছে। চারিদিকে অনেক ক্ষত, অনেক দাগ, অনেক ধ্বস। নতুন মূল্যবোধ। আর সেই ধ্বংসস্তূপে এক ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের প্রতিক্ষায়···আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মাটিতে রোমাঞ্চ-শিহরণ···নূতনের কেতন ঐ বুঝি ওড়ে।

অগ্নিবীণার ঝংকার যেন নতুন করে কানে বাজলো। বাঁশির সুর জ্বলে উঠলো আমার রক্তস্রোতে, হৃদপিণ্ডে। বুক চিতিয়ে গলার শির ফুলিয়ে বলে উঠি :

বলো বীর
বলো উন্নত মম শির···

মনে হলো : আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। এক হাতের বাঁকা বাঁশের বাঁশরীর মোহন সুরে মুগ্ধ হয়েছি, এবার রণতূর্যের আহ্বানে জেগে উঠলুম।

নেচে উঠলুম। ক্ষেপে উঠলুম।

আমার এক বিদগ্ধ বন্ধু নজরুল-কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন, এ বিদ্রোহ নয়, এক ধরনের বোহেমিয়ানিজম্, এক ধরনের অস্থির এলোমেলোমি। আমি পণ্ডিত নয়, বিচার-বিশ্লেষণে আমার সম্পূর্ণ অনীহা। তবু জানি, ঝড়ের রাতের অগ্রপথিক নজরুলের কবিতায় ঝড়ের ক্ষ্যাপামি, ঝড়ের শব্দ। সেই এলোমেলো ঝড়ের ভীষণতায় অত্যাচারীর বুক কেঁপেছে, অত্যাচারিতের ঘুম ভেঙেছে।

রাষ্ট্রে-সমাজে আজ ভাঙা-গড়ার পালা চলেছে। সাম্যবাদী চিন্তা ও চেতনা সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল নড়িয়ে দিচ্ছে।

নজরুলের কাব্যে, সেই কবে, এদেশে আমরা শুনেছি এক অনাগত বিপ্লবের আহ্বান। নজরুল লিখেছিলেন অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত, গেয়েছিলেন সর্বহারার গান।

নজরুল-কাব্যের ধ্রুবমূল্য নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামান, আমি তার ধারে-কাছে নেই। আমি শুধু বলতে পারি—চোখে জল এলে নজরুলের কবিতা আমার মনে পড়ে, চোখে আগুন ঝরলে নজরুলের

কবিতা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তখনও—বুকে যখন উল্লাস, রক্তে যখন ঢেউ।

আর কাঠবেড়ালি দেখলেই, এই বয়সেও, চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে: কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?

এ দেশের ছোটোরা এই বলে আপসোস করতে পারে যে, নজরুলকে তারা পুরোপুরি পায় নি। পেলে কী সম্পদই না তারা পেতে পারতো!

আজ বড়ো হয়ে আমি ছোটোদের জন্য ছড়া-কবিতা লেখায় হাত দিয়েছি। কিন্তু কতোটুকু মজা ওদের দিতে পেরেছি? ঝিঙেফুলের মিষ্টি কবিতাগুলো বার বার পড়ি আর ভাবি, শিশুর মুখের ভাষা মনের ভাবকে এমন চমৎকার করে আমরা কেন ফুটিয়ে তুলতে পারি না? কী মজাদার সেই সব কবিতা:

> দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙাতে 'আল্‌মানাক'
> গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁথ?

শিশুর মুখের ভাষা কতো অনায়াসে এসেছে নজরুলের কবিতায়:

> এ রাম, তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
> ফ্রকটা নেবে? জামা দুটো?

সম্প্রতি একটি স্মৃতিচারণে নজরুলের অতিখ্যাত শিশু-কবিতা কাঠবেড়ালির জন্মকথা আমাকে চমৎকৃত করেছে। নজরুল তখন কুমিল্লায় শ্রীইন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়িতে। একদিন শুনলেন, সেই বাড়িরই ছোট্ট একটি মেয়ে পেয়ারাডালের কাঠবেড়ালির সঙ্গে কথা বলছে। এই রাগছে, এই ভয় দেখাচ্ছে, এই মিষ্টিকথায় ভোলাচ্ছে। অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলছে, 'তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!' আবার গাল-মন্দ করে অভিশাপ দিচ্ছে—'হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে।' শুনে নজরুল ভারি মজা পেলেন। বেশ মজা করেই লিখে ফেললেন একটি অনবদ্য শিশু-কবিতা।

আসলে নজরুল নিজেই এক চিরশিশু। কবি-বিদ্রোহীর

ভিতরটায় কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এক অবাক শিশু-ভোলানাথ। শিশুর মতো ধরণ-ধারন, শিশুর মতোই অবারিত উল্লাস, অকারণ পুলক।

গোলাম মোস্তাফার ভাষায়—

ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন-রাত।

ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়েকে নজরুল এই বলে নাচিয়ে দিলেন যে, তাকে কলকাতার এ-মোড় থেকে ও-মোড় সব দেখাবেন; গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, সব—সব।

একখানা ট্যাক্সি করে নজরুল সত্য-সত্যই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতা দেখতে দেখতে তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে গেলেন। গোটা কলকাতা চষে বেড়িয়ে সোজা চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তারপর ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে গিয়ে তিনি পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু পকেট তো আর পকেট নয়—গড়ের মাঠ! তাই তো, কী হবে এখন! কী আর হবে, সেই ট্যাক্সি নিয়েই ছুটলেন বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার বিরাট অঙ্কের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।

নজরুলকে আমি দেখিনি।

কিন্তু সত্যিই কি আমি নজরুলকে দেখিনি?

চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, এক হাবিলদার কবি এক পায়ে ঘাস এক পায়ে বিচালি বেঁধে কুচকাওয়াজ করছেন। আবার কখনো দেখি, হুগলির জেলে বন্দী কবি লাল কালিতে কলম ডুবিয়ে লিখছেন কল্লোলের জন্য কবিতা: আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে। গানের আসরে এক কবি-বুলবুলকেও যেন দেখতে পাই। মুগ্ধ শ্রোতার দল ঘিরে আছে কবিকে। কবি গাইছেন গানের পর গান। হারমোনিয়মের রীডের উপর খটাখট্ করে আঙুল চলেছে দুর্দান্ত স্পিডে। কল্লোলের জমজমাট আড্ডায় সব গলা ছাপিয়ে এক

বেপরোয়া কবির কণ্ঠে হঠাৎ উল্লাস-ধ্বনি পারিপার্শ্বিককে চমকে দিচ্ছে : দে গরুর গা ধুইয়ে···! সে-চীৎকার আমার কানে বাজে, সে-ছবি আমি দেখতে পাই।

কিন্তু তারপর ?

হ্যাঁ, তারপর—আজ এই মুহূর্তে, আমার চোখের সামনে স্তব্ধ এক অগ্নিগিরি। স্তব্ধ আর সুপ্ত।

আমি দেখি। চোখের জলে আমার বুক ভাসে।

আর দেখি—

ঘুমিয়ে আছে নীরব হয়ে আমার গানের বুলবুলি।

নজরুলের হাসির গান

সলিল চৌধুরী

গানের ভুবন নজরুল ভরিয়ে তুলেছিলেন স্বরচিত গানে আর সুরে। সঙ্গীতের প্রতিটি বিভাগে ছিলো তাঁর অবাধ পদসঞ্চার। তাঁর ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী গান, দেশাত্মবোধক-মার্চ সঙ্গীত আর পল্লী-বাংলার শ্যামলতা মাখানো বাউল-ভাটিয়ালী-ঝুমুর কীর্তন প্রভৃতি গীতির কথা ভুলবার নয়। একসময় নজরুল এই বাংলাদেশে গানের পুষ্পবৃষ্টি করে গেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিশিষ্ট সুরকার। তাই তাঁর গানে পরিপূর্ণ প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিলেন। নজরুলের নব নব সুরের মাধুর্য আর মূর্ছনায় বাংলাদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো একদিন।

গান লেখা আর সুর তৈরী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিলো না তাঁর। নানা ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। এমন কি সংখ্যায় খুব কম হলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাসির গানও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর 'চন্দবিন্দু' ও 'সুর-সাকী' সঙ্গীত-গ্রন্থের কিছু অংশ হাসির গানের দ্বারাই সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বরচিত হাসির গানে নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সমাজ আর রাজনীতিগত ভুল-ক্রটির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষপূর্ণ হাস্যরসের নির্মম কশাঘাত।

দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কবি নজরুলের যোগাযোগ ছিলো গভীরভাবে। মুক্তি সংগ্রামে নিয়েছিলেন তিনি সক্রিয় ভূমিকা। তাঁকে বহু পীড়ন-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন তিনি। তাই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক চেতনা অন্যান্য কবি গীতিকারের তুলনায় অনেক বেশী। এবং এই কারণেই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা 'প্যাক্ট' নামের কোরাস

গানটি বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। বদ্‌না ও গাড়ুতে প্যাক্ট নিয়ে গানটির শুরু :

'বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুব হাতে বাঁশ নাই।'

এবং শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের এই মৈত্রীর কি অবস্থা হলো, গানটির সমাপ্তি তাই দিয়ে :

বদ্‌না-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি রোল উঠিলো 'হা-হন্ত',
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিলো চির-জিজ্ঞাসা,— করুণ চন্দবিন্দু।'

নজরুল-রচিত সুবিখ্যাত কোরাস গান 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই 'চন্দবিন্দু' গীতি-গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গানের বিষয়বস্তু গানের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা যায় :

'দে গরুর গা ধুইয়ে!
উল্টে গেলো, বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম-জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি।'

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-তামাশার ছবি তাঁর 'চন্দবিন্দু' গ্রন্থেব প্রতিটি হাসির গানের মধ্যেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। লীগ-অব-নেশন, সর্দা বিল, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, বাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতি গানগুলিতে তাঁর গভীর সমাজচেতনা ও রাজনীতিবোধের চিহ্ন বিদ্যমান।

'সুর-সাকী' গ্রন্থের সর্বশেষ কার্তনটি সহজ সরল অনাবিল হাসির গান হিসাবে নজরুল-গীতি-সম্ভারে একটি অনবদ্য নিদর্শন :

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজের লাগি করি ভজন।
আমি মাল্‌পোর লাগি তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন॥

'রাধা-বল্লভী' লোভে পুজি রাধা-বল্লভে,
রস-গোল্লার লাগি আসি রাস-মোচ্ছবে !
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন !'

স্বরচিত গানে আর সুরে কবি নজরুল বাংলার আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলেন। বিচিত্র রাগে বিচিত্রতর অসংখ্য সঙ্গীত তিনি সৃষ্টি করেছেন। তারই মধ্যে তাঁর এই নিতান্ত সামান্য ক'টি হাসির গান উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের মতো দ্যুতিময় হয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, ডি. এল. রায় কি রজনীকান্ত সেনের সঙ্গেই নজরুল ইসলামের নাম উচ্চারিত হবে।

নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি

ফররুখ আহ্‌মদ

ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিলো, ১৯০৫ সালের আগে তার ভিতর কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্তি ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোনো সূর্যের সাক্ষাৎই এ সময় পাওয়া যায়নি।

তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি।

রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েও শুধুমাত্র মৌলিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সেই বেচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হলেও মুমূর্ষু প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তার নিজস্ব তাহ্‌জীব-তমদ্দুনের ক্ষীণ রেখা কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলো তাব নিজস্ব অস্তিত্ব।

ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এই অচলায়তনে প্রথম সাড়া জাগালো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফৎ আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এলো দুকূল-প্লাবী বন্যা।

খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামেব আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেলো সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের যে বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান-আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিলো তার গোড়াপত্তন হয় এ-সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী-ফারসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিলো, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ষড়যন্ত্র যে-ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিলো, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমন কি, জনসাধারণের মধ্যেও এই সাড়া পৌঁছতে দেরী হলো না।

ইসলামের মরমীবাদ ও সুফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণ-শক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।'

অথবা—

'আবুবকর, উস্‌মান, উমর, আলি হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারীগান—লা শরীক আল্লা।'

কবির কাব্য যেমন আশ্বাসের বাণী বয়ে আনলো, তেমনি সে উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে নতুন চেতনায়। এই সঙ্গে ইসলামের মানবতাবোধ, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার কবি-চিত্তে যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলো তার কাহিনী খিলাফৎ আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে যেমন প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তেমনি জেহাদী ফরমান শুনিয়েছিলো।

এই অগ্নি-গীতির সঙ্গে গজল ও কাব্য-গীতির মধুর রসে জনসাধারণের চিত্ত অভিসিঞ্চিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গীতোচ্ছ্বাস একটি অচেতন জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো সম্বিৎ।

বঙ্গ-ভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি-মানস গঠিত হয়েছিলো, তার অশান্ত মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছি আমরা তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে তাঁর দ্বন্দ্ব-মুখর মনের ছাপ।

কাজী নজরুল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের নামটির একটিই অর্থ আছে। আনন্দিত আর অপরিমিত যৌবন। প্রাণদীপ্ত যৌবন কোনো অন্যায়, কোনো মিথ্যা, কোনো বিষাদ, কোনো ভণ্ডামিকে সহ্য করে না—তাই তিনি স্বভাব বিদ্রোহী। 'জয় সত্যম্ মন্ত্র শিখা' তাঁর বুকের ভিতরে জ্বলছে অম্লান আলোকে ; সেই জন্যই 'কারার লৌহ-কপাট' ভেঙে 'রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী' ভেঙে ফেলাই তাঁর সংকল্প,—তা রাষ্ট্রিক সামাজিক আর মানবিক যারই হোক।

যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথ তো এই যৌবনের উদ্বোধনী শোনাচ্ছিলেন বার বার: 'ওরে সবুজ ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' এই তরুণেরা এগিয়ে আসছিলো রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ ধরে, বিদ্রোহী চিন্তার উদ্ধত আধুনিকতায়, সব ফিলিস্টাইন স্থির-স্থবিরতার প্রতিবাদে। নজরুল এলেন তাঁদেরই অগ্নিস্ফুরিত বাণীমুখ হয়ে। 'নূতনের কেতনে' কাল বৈশাখী ঝড়ের দোলা লাগালেন তিনি।

সুতরাং 'লাগলো লড়াই মিথ্যা এবং কাঁচায়।' প্রাচীন চিন্তায় অভ্যস্ত সমালোচক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর নাম কবিতা ?' দেখা দিলো প্যারডি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। ইংরেজ সরকার একটির পর একটি বই বাজেয়াপ্ত করতে লাগলো, কবিকে যেতে হলো জেলে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় ক্ষিপ্ত হলেন রক্ষণশীল হিন্দু, হিংস্র হলেন গোঁড়া মুসলমান। সরল আত্ম-বিশ্লেষণে নজরুল বললেন, 'যাবনা আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি-দাড়ি, নাড়ি কাছা।' খুব স্বাভাবিক। কারণ বিদ্রোহী নবীন বীরের পথ তো পুষ্প বিকশিত নয়। 'মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙা পায়।' বাংলা

সাহিত্যের পথে—তার সংগ্রামী সাধনার স্মরণীতে অগ্রপথিকের রক্তাক্ত পদচিহ্ন রেখে গেছেন নজরুল। সেই পদরেখা বাংলার যৌবনের দিশারী।

আর সেই দুঃখের পথে আর এক পাথেয় নজরুলের গান। বুকভরা, কণ্ঠভরা গান। অপরাজিত প্রাণের আনন্দিত উদার কলোচ্ছ্বাস—রাত্রির সীমান্তে প্রভাতী পাখির কলধ্বনি।

নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

...কাজী নজরুলের সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারা আরো প্রকাশিত হয়েছে 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রবন্ধে। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'এ কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিকতায় নজরুল যেমন অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারায় বলিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র কালের সীমায় আবদ্ধ নেই।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য, সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায় এই সমাজ-বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটলো কি করে? সেকালে আর কোনো কবি ও সাহিত্যিক এমন খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদের কথা বলেন নি। নজরুলের 'ব্যাথার দান'এ লাল ফৌজের ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সমাজ-বিপ্লবী প্রেরণা তিনি সৈনিক জীবনে লাভ করেছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে তিনি গোপনে রুশ বিপ্লবের পত্র-পত্রিকা পাঠ করেছেন এবং অন্যান্যদের পড়িয়েছেন ও আলোচনা করেছেন। এ-সব কথা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' বইতে আলোচিত হয়েছে। স্কুল জীবনে নজরুল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্ক লাভ করেছিলেন; সৈনিক জীবনে তাঁর দেশপ্রেম আন্তর্জাতিকতাবোধ ও সমাজ-বিপ্লবী জীবন দর্শনে বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম প্রথম সংগঠক কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একই বাড়ীতে দীর্ঘদিন বাস করতে থাকেন। স্বভাবতই কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা

হয়েছে। এই সময়েই নজরুলের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। একসঙ্গে দু-জনে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এবং গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজী নজরুলকে কলকাতায় রাখার ব্যবস্থা থেকে পরবর্তী কালে নজরুলের বিবাহের পরেও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কমরেড আবদুল হালিম এই পরিবারের সব সময়ের বন্ধু ছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন: '১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলবো স্থিব করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিলো। রুশ বিপ্লবের উপরে সে যে আগে হতে শ্রদ্ধান্বিত ছিলে. সে-কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই তার সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা। তার সিন্ধুপারের 'আগলভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব।' ১৯৩১ সালের জুন মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাব বিচারাধীন বন্দীরূপে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কমিউনিস্ট-দের আদর্শ ও আশু কাজ বিশ্লেষণ করে আদালতে দাঁড়িয়ে 'আমি একজন কমিউনিস্ট' শীর্ষক যে নির্ভীক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এক জায়গায় তিনি কাজী নজরুলের নাম উল্লেখ ও লেবার স্বরাজ পার্টি গঠনের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন। তবে তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না সে-কথাও বলেছেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্পর্কে কাজী নজরুল যে কতো শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একটা চিঠিতে তার প্রকাশ দেখা যায়। কাজী নজরুল 'আত্মশক্তি' সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখেছেন: 'আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মালো গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা

ভেবে পাইনে!'…'মুজফ্ফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোনো মুসলমান নেতা তো দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না।' (৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

এ-সব থেকে বুঝা যায় কাজী নজরুল শুধু কবি ছিলেন না; সমাজ-বিপ্লবকে রূপায়িত করার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিলো। শ্রমিক কৃষকের সভায়, মৎস্যজীবী সম্মেলনে তিনি কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছেন। যুব-সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন সংগঠনে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে ভলানটিয়ার অধিনায়ক হয়েছেন। সারা বাংলায় রাজনৈতিক সফর করেছেন। ১৯২৩ সালে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, এবং মর্যাদর দাবিতে হুগলী জেলে ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯২৯ সালেব ফেব্রুরারী মাসে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, কমরেড আবদুল হালিম ও ফিলিপ স্প্রাট কুষ্টিয়া কৃষক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কাজী নজরুলের রাজনৈতিক মঞ্চে শেষ দেখা। ২০শে মার্চ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে অনেক ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে।

## মানুষের কবি নজরুল		কাজী মোতাহার হোসেন

সকল কবিই তো মানুষের জন্য কাব্য লিখে থাকেন। তাহলে আর 'মানুষের কবি' বলে কবিকে বিশেষিত করবার তাৎপর্য কি? প্রথমেই এ-কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা সামাজিক কারণে মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরাজ, ধনিক, বণিক, শ্রমিক, আশরাফ, আতরাফ, হানাফী, শাফেরী, হাম্বলী, রাজা, প্রজা, উজির, নাজির ইত্যাদি। কোনো কোনো কবি এইসব শ্রেণীর এক বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য কবে বা মনে মনে প্রধান বলে গণ্য করে কাব্য লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রেণী বিশেষের কবি। আর যাঁরা শ্রেণী বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের জন্য কাব্য লেখেন তাঁদেরকে মানুষের কবি বলা যায়। নজরুল ইসলাম শ্রেণী-প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং সকল মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীর-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এজন্য তাঁকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যাত করা হয়।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত-বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাতের-বিচার ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছো জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ।
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান॥'

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন—

'আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান—
নাহি বড়ো ছোটো—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥

এখানে, যে-সব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের 'বড়ত্ব' নিয়ে ছোটোদের ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই, কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আবার যে-সব ভাগ্যবান বড়ো হয়েও বড়াই করেন না তাঁদের প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধার নমুনা দেখুন—

'মানুষেরে তুমি করেছো বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পাণিতে স্মরি গো সর্বদাই।
বন্ধু গো প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
ওঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া।'

ওমর ফারুকের মানব-প্রীতি কবিকে কী অপরূপভাবে বিমুগ্ধ করেছে, এবং উপরের কবিতায় কী অপূর্বভাবে তা প্রকাশ হয়েছে। হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে নজরুল সব উঁচু-নীচু সমান করে দিতে চান। তাঁর ধর্মই হৃদয়ের প্রেম-ধর্ম, যে-প্রেম মানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন—

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেব নিজ প্রাণ।
এই বন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম গান।
মিথ্যা শুনি নি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

মানব-প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয়-কন্দরে মিলিত হয়েছে—বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী এবং ইসলামের ধর্মের রূপ।

আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক বা কুল-মর্যাদার মিথ্যা অহংকার। কবি এই ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে চান। তিনি 'যুগবাণী'তে লিখেছেন, 'সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু-নীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্বমানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।'

এখানে মনুষ্যত্বের অর্থ হচ্ছে, মানব-প্রীতি আর পুরুষকারের অর্থ বীর-ধর্ম। নজরুলের মধ্যে আমরা একাধারে প্রেমের কোমলতা আর বীরত্বের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ইসলামের ভিতর কবি দেখেছেন এক বিশ্বব্যাপী আজাদীর আহ্বান। তাই তিনি বলেছেন—

'অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক' দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন, ভয়, লাজ
এলো যে কোরাণ, এলো যে রে নবী, ভুলিলি সে-সব আজ?'

কোরাণের এই মুক্তিবাণী—তৌহিদের যা মর্মকথা সেই দিকে কবি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আমার মনে হয় অন্য কোনো কবিই তৌহিদের এই 'অবন্ধন রূপ' এতো স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারেন নি। এইটি নজরুলের একটি বিশেষ দান। বন্ধন-লাজ-ভয় জয় করবার সাধনা যারা করেছেন সেই বীরদের গান নজরুল গেয়েছেন—

'গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
সেদিন নিশিথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,

প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশিথ জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে,
নব-জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।'

নজরুল বর্তমানকে যা পেয়েছেন, তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমান গড়ে তুলবার প্রয়াসী। মানবতার কল্যাণ-রথ সর্বদা সামনের দিকে চালাতে হবে, পিছে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

'যাক্ রে তখ্‌ত তাউস, জাগ্ রে বেহুঁশ
ডুবিল রে দেখ্ কতো পারস্য, রোম গ্রীক রুশ ,
জাগিল তারা সকল, জেগে ওঠ্ হীনবল,
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধুলায় তাজমহল!'

নজরুল আশার কবি—শুধু বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও। নজরুলের প্রেমিকা হচ্ছেন এক 'শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত-সুন্দরী'। সর্বদা তার মিলনের জন্য কবি অগ্রসর হচ্ছেন, এক কূলে নৌকা না ভিড়লেও আর এক কূলে ভিড়তে পারে। সকল কূলই সেই এক প্রেমময়ীর। নজরুলের একটা গান আছে—

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনেব স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥
কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি' জাগে, চায় নব চাঁদের তিথি॥'

এখানে আশাবাদী নজরুলের মনের টান কোন্ দিকে তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভেদাভেদ চূর্ণকারী মানবতার কবিকে আমরা ভালোবাসি। কবি বহুবার বলেছেন, 'শ্রদ্ধা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু ভালোবাসাই দুর্লভ'।

তাঁর আশা ধ্বনিত হয়েছে পূজাবিণীর কয়েকটা লাইনে—

'ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পাবে নাই, তুমি নেবে
তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন অবহেলে,
শুধু ভালোবেসে।'

কবিব এ-আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্য যে-কোনো কবিব চেয়ে মানুষের কবি নজরুলকে যে তার গুণে-ভরা স্বদেশবাসী অনেক বেশী অন্তবঙ্গ বলে অনুভব করে থাকেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কাজীদার স্মৃতিকথা

সরযূবালা দেবী

কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁর কবিতা, গান, বিশেষ করে দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে। তখন কবির 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি আমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতো। তারপর তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা তো দেশপ্রেমের উন্মাদনায় ছোটো-বড়ো সকলকেই পাগল করে দিয়েছিলো। এ ছাড়া তাঁর 'এতো জল ও কাজল চোখে', 'শুকনো পাতার নূপুর পায়', 'রুমঝুম ঝুমঝুম' এই সব গান—নিজের মনে মনে গুন্‌গুন্ করে গায়নি এমন কেউ সে যুগে ছিলো না বললেই হয়।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'রক্তকমল' নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময় কবি নজরুল ইসলামের কাছাকাছি আসবার সুযোগ ঘটলো আমার। স্বরচিত কবিতা পড়ে যাঁকে খুব গম্ভীর ভারিক্কী বিরাট মানুষ বলে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, কাছে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর সহজ সরল অন্তরঙ্গ ব্যবহারে। দেখা হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কখন যে ঐ দেশজোড়া বিখ্যাত মানুষটি আমার 'কাজীদা' হয়ে উঠলেন, তা জানতেই পারলাম না।

কাজীদার কথা মনে হলেই আজও কানে ভাসে তাঁর প্রাণ-খোলা উদার হাসি—যে হাসির দ্বারায় এক মুহূর্তেই অপরিচিত জনকে নিজের নাম ও খ্যাতির বেড়া ভেঙে একেবারে যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে স্থান করে দিতেন। কাজীদা ছিলেন যেমন আনন্দময়, তেমনি স্নেহপ্রবণ। যখন যেখানে থাকতেন হাসিতে আনন্দে একেবারে আসর সরগরম করে রাখতেন।

প্রবোধ গুহ ও অনাদি বসুর মনোমোহন থিয়েটারে তখন 'রক্তকমল' মঞ্চস্থ হবার কথা হলো। এই নাটকের জন্য কাজী

নজরুলের কাছে আমায় গান শিখতে হবে শুনে আমি তো ভয়ে লজ্জায় প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! ভাবলাম, আমি গানের কি জানি যে, এতোবড়ো একজন মানুষের কাছে গান শিখতে যাবো! সে-কথা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকেও জানালাম। ওঁরা আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, তুমি কবির কাছে গিয়েই দেখ না—'

এর পর কাজীদার কাছে না গিয়ে কোনো উপায় রইলো না। তাঁকে দেখে কিন্তু আমাব মনের ভয় কেটে যেতে দেরী হলো না মোটেই। কখন যে তাঁর কোলের কাছে বসে মজার মজার গল্প শুনতে শুরু করে দিয়েছি, সে খেয়ালই নেই আমার তখন। এই কথা আর গল্পের মাঝখানে 'রক্তকমল' নাটকের একখানি গান গুন্‌গুন্‌ করে ক'বার গেয়েই কবি বললেন, 'একবার আমার সঙ্গে গাও তো দেখি—'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গাইতে শুরু কবে দিলাম। তখন তিনি উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বহুত আচ্ছা। তুমি তো খুব সুন্দর গাও, তবে এতো ভয় পাচ্ছিলে কেন?'

রক্তকমলে মমতার ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। ঐ ভূমিকার জন্য কাজীদা পাঁচখানি গান লিখে সুর করে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে গানগুলি স্টেজে বেশ উতরে গিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। তারপর নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'মহুয়া' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক এলো আমার কাছে। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। কাজীদা ঐ নাটকে আমার জন্য সাত-আটটি বাগপ্রধান গান লিখেছিলেন। এর সব ক'টি গান স্টেজে উঠে আমাকে গাইতে হবে শুনে আমি বেঁকে বসলাম একেবারে, 'ও আমি কিছুতেই পাববো না। আগেরগুলি মোটামুটি সাদা-মাটা সুরের গান ছিলো—তাই চালিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ-সব রাগসঙ্গীত গাইতে হলে তো রীতিমতো তালিমের দরকার, গলা সাধতে হয়। একি খেলার কথা নাকি?'

এই কথা শুনে কাজীদা হা হা করে হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'বাঃ বাঃ, সরযূ দেবী

দেখছি সত্যিই বেশ বড়ো হয়ে গেছেন, কেমন বড়ো বড়ো কথা দিব্যি গুছিয়ে বলছে দেখ! আমরা কথার বেসাতি করি, আমাদেরও তো এতো কথা মাথায় আসে না।'

কাজীদার এই কথা আর হাসিতে আমার সমস্ত আপত্তি ভেসে যায় যেন। আমি যতো বলি, 'না, হবে না।' উনি ততোই জেদ ধরে বলেন, 'হ্যাঁ, হতেই হবে, না হলে আমার নাম পালটে দেবো। তোমায় কিচ্ছুটি করতে হবে না—লাফাতে হবে না, ডিগবাজী খেতে হবে না, একপায়ে দাঁড়াতেও হবে না, শুদ্ধু আমার সঙ্গে গাইবে আর হাসবে। ওঃ হো, তুমি তো জর্দা খেতে ভালোবাসো—আচ্ছা দেখ, তোমায় কি সুন্দর জর্দা খাওয়াচ্ছি।' বলে তিনি নিজের হাতে পানের বাটা থেকে পান সেজে জর্দা দিয়ে আমার মুখে পুরে দিলেন। জীবনে কতো জর্দা, কতো পান খেয়েছি, কিন্তু কাজীদার হাতের সেই স্নেহ মাখানো পানের স্বাদ যেন আজও ভুলতে পারিনি। আর শুধু কি পান খাওয়ানো? নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে মাত্র তিন দিনের মধ্যে ঐ অতোগুলি রাগপ্রধান গান একেবারে পাখী পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে দিলেন কাজীদা। সে-সব গানের সুরও তৈরী করেছিলেন তিনি অপূর্ব।

কাজীদার সেই সব গান গেয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বিদগ্ধ দর্শকের প্রশংসা আর আশীর্বাদ অর্জন করেছি আমি। এর জন্য ঐ একটি মানুষ—কাজীদার কাছে যে আমি কতো ঋণী তা বলে বোঝানো যাবে না।

কাজীদা আমাকে বড়ো দাদার মতো উৎসাহ দিয়েছেন, স্নেহ করেছেন। তিনিই আমার মনে এই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন যে, আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

আজ সে সব দিনের কথা ভাবতে চোখে জল আসে, এমনভাবে স্নেহ করবার, ভালোবাসবার মতো আপনজন তো জীবনে খুব বেশী আসে না।

কাজী নজরুল ইসলামের দেশপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। অগ্নিবীণার কবিকে এক নজরে ভাঙনের কবি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সৃজন-প্রলয়ের সংগমিত পূর্ণ দৃষ্টি তাঁর পূর্বাবধি প্রকাশিত। একদিকে তিনি বলেন—

'মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।'

অন্যদিকে শোনান—

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত॥'

আবার একই পংক্তিতে দু'টি কথা—

'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস',

কিংবা,

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য!

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কবির কবিতায় ভাঙন-গড়নের সমন্বয় ফুটে উঠেছে। 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে', 'প্রলয়োল্লাস', 'রক্তাম্বর-ধরিত্রী মা', 'আগমনী', 'জাগৃহি', 'তূর্যনিনাদ', 'মরণ-বরণ,' 'যুগান্তরের গান' প্রভৃতি কবিতা তার দৃষ্টান্তস্থল।

নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর সাম্যবাদী সুর। মানুষকে মনুষ্যত্বের নিরিখে যাচাই করতে চেয়েছেন তিনি, বাইরের কোনো মিথ্যা পরিচিতির তকমা দিয়ে নয়। খোলসকে অস্বীকার করে অন্তরের পরিচয়কে ভালোবেসেছেন কবি। মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদকে তীব্রতম ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে চোখের

জলে মনের জ্বালায় প্রকাশ করেছেন বার বার। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া'—এমন কবিতা বাংলা সাহিত্যে চমকপ্রদ নিশ্চয়ই। গভীর সুর যেখানে, সেখানে কী অসীম আন্তরিকতা—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র!'

তাঁর চোখে নর ও নারীর পার্থক্য নেই, সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে উঠে বলেন—

'গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

মহাভারতের ভীষ্মও এই কথা বলেছিলেন অনেক হাজার বছর আগে। কিন্তু আধুনিক কবি চেনেন আধুনিক জগৎকে, এখানকার স্বার্থ, লোভ ও মনুষ্যত্বহীনতাকে। তাই এগিয়ে বলেন—

'ভেঙে ফেল্ ঐ ভজনালয়ের যতো তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।'

নজরুলের জাতীয় কবিতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক চেতনা। ···জনগণের প্রতি আন্তরিক দরদই তাঁকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। নজরুল জনতার কবি। কণ্ঠে তাঁর—

'গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিলো যারা ফসলের ফরমান।'

শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের মুঠিতলে ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয়, তাদেরই 'জীবন বন্দনা' কবি রচনা করে গেছেন। তাদের হয়ে অভিযোগ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন।···

নজরুল-কবিতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি অকুণ্ঠ দরদ ও পক্ষপাতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি যৌবনকে, প্রাণকে সকল বাধাবন্ধনের জরা-শাসনের অতীত বলে মনে

করতেন। সত্যরক্ষার ও যৌবনের যাচাইয়ের জন্য তিনি নিজেকে ও সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন—'আয়' বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।' এবং 'যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।' আপাত-অন্ধকারের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন আগামী আলোর দিনকে। হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘাতকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত করতে চেয়েছেন—

'করুক কলহ—জেগেছে তো তব্—বিজয়-কেতন উড়া!
লেজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া!'

নজরুল-রচনার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—সহজ স্বাভাবিক ও দৃঢ় বলিষ্ঠতা। যাঁর নিজের জীবনে কোনো ছন্দ ছিলো না, তাঁর কাব্যও কোনো বাঁধাধারা বিধিবিধান মানতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'পাগলামি! তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।' নজরুল সেই মূর্তিমান পাগলামি, তাঁর কাব্য প্রাণের মাতন। দেশের বুকে যখন সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, কবির কাব্যে তখন চরম অসাম্প্রদায়িকতা। ইসলামী পুরাণ আর হিন্দু পুরাণের যতো বীর আর অবতার, দেব আর দেবী তাঁর কাব্যে একই পংক্তিতে পাশাপাশি প্রতিবেশী; সংস্কৃত শব্দ ও ফার্সী শব্দ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

কাজী সাহেবের কথা

যূথিকা রায়

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমি প্রথম দেখি ১৯৩৩ সালে বরাহনগরে, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্তর বাড়ীতে। ওখানে প্রতি রবিবার আমি জ্ঞানবাবুর কাছে গান শিখতে যেতাম।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে আমার গান রেকর্ড করবার জন্য আমার বাবার খুবই ইচ্ছা ছিলো। বাবার এই ইচ্ছা জ্ঞানবাবু জানতে পারেন, আর তিনিই আমার গান শোনাবার জন্য কাজী সাহেবকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন একদিন।

কবি নজরুল সেদিন আমার গান শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন, আর আমার গান যে রেকর্ড করার উপযুক্ত সে-কথাও বলেছিলেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

আমি প্রথম তাঁর গান রেকর্ড করি ১৯৩৬ সালে—'ওরে নীল যমুনার জল' আর 'তোমার কালো রূপে থাক না ডুবে সকল কালো মম'—এই গান দু'খানি। এ ছাড়া 'মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী' আর 'বনের তাপস কুমারী আমি গো'।

তারপর আমি কবির অনেক গান রেকর্ড করেছি। নানা ভাবের গান। ভক্তিমূলক, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, আধুনিক ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কাজী সাহেব দু'খানি ভক্তিমূলক গান রচনা করেছিলেন। গান দু'টির প্রথম কথা এই—'পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার' ও 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর'। ঠাকুরের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবির লেখা এই গান দু'টি আমি রেকর্ড করি ১৯৩৭ সালে।

ঘরোয়া মানুষ হিসাবে তাঁকে আমার খুবই সহজ সরল সুন্দর

নিরহঙ্কার আনন্দময় শিশুর মতো মনে হয়েছে। আনন্দে-উল্লাসে যখন কবি হাসতেন, সেই হাসির তরঙ্গে যেন আকাশ বাতাস ভরে উঠতো। এমন প্রাণখোলা হাসি আমি আর কোথাও শুনিনি। তাঁর এই সরল সুন্দর ও উদার স্বভাবের দু'একটি ঘটনা বলছি।

দমদমে, গ্রামোফোন ষ্টুডিওতে যখন আমি রেকর্ড করতে যেতাম, কাজী সাহেবও প্রায়ই আসতেন রেকর্ডিংএর সময়। সারা ষ্টুডিও ঘরে মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন আর নানাভাবে আমাদের উৎসাহ দিতেন। যখন টেষ্ট রেকর্ড শোনা হতো, কবি কনট্রোল-রুম থেকে ছুটে এসে গ্রামোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে একমনে শুনতেন। যেখানে তাঁর ভালো লাগতো আনন্দে-মাথা নেড়ে বাঃ বাঃ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করতেন। তাঁর এই আনন্দ-উৎসাহে আমাদের সকলের উৎসাহ আরও অনেক বেড়ে যেতো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা কাজে সফল হয়ে উঠতাম!

একবার আমার মা কবিকে বলেছিলেন, 'যূথিকা ছোটো মেয়ে, ওকে আপনি ছোটো মেয়ের গাইবার মতো গান দিলে ভালো হয়।' কাজী সাহেব এ-কথা শুনে মাকে তাব বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন।

মা যখন কবির বাড়ী যান, তখন তিনি তাঁর অনেকগুলি গানের খাতা মায়ের সামনে এনে বলেন, 'এই আমাব সমস্ত খাতা আপনাকে দিলাম, এর ভেতর থেকে যে গানগুলো পছন্দ হয় আপন।র মেয়ের জন্যে নিতে পারেন।'

তাঁর এই উদার মনোভাব ভোলবার নয়।

অনেক সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর ঘরে বসে কবির গান লেখা ও সুর তৈরী করার সুন্দর দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কবি যখন তন্ময় হয়ে বসে সুর করতেন বা গান লিখতেন, তখন মনে হতো কোনো সাধক সৃষ্টির আনন্দে ভাবের ঘোরে কোথায় যেন ডুবে আছেন। সে পরিবেশ ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিঃশব্দে সে দৃশ্য দেখে কবির প্রতি আমার প্রণাম জানাতাম।

আমাদের ছাত্র নজরুল

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি তেইশ বৎসর বয়সে মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি।...নজরুল কলিকাতায় আমাকে জানায় যে, সে আমার স্কুলের ছাত্র এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে।

আমি শুনিয়া আনন্দিত হই ও গৌরব বোধ করি।

তখনকার দিনে 6th Classএ নজরুল পড়িত! ছোট্ট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম।

সে বড়ো লাজুক ছিলো, হেডমাষ্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত। ছোটো ছেলে কাছে আসিতে সাহসী হইত না, সে নিজেই আমাকে এ-কথা বলিয়াছে।

শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলো। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালোবাসিত।

সে স্কুলে বেশীদিন ছিলো না। বোধহয় 4th Class (Class —vii)-এ উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।

ছাত্র-জীবনে নজরুল

কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস

কাজী নজরুল ইসলামের ছাত্রজীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। নির্মম দারিদ্র্য আর চঞ্চল শিশু-প্রতিভার সঙ্ঘর্ষের ফলেই এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে গরীব মধ্য-বিত্তের ঘরে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। জন্মলব্ধ প্রতিভার অধিকারী শিশু নজরুল ইসলাম চুরুলিয়ার সেই কাজী-পরিবারে যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন পরিবারটি অসহ দারিদ্র্যের চাপে অত্যন্ত বিব্রত—এতো বিব্রত যে, এই নতুন অতিথির ভাগ্যকে আশীর্বাদ করার মতো সাহস-ভরসাও আর তার ছিলো না। তাই নবজাত শিশুর ডাকনাম রাখা হলো 'দুখু মিয়া'।

কাজী নজরুল ইসলামের বাপের নাম কাজী ফকির আহমদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। তাঁর জন্মের তারিখ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। বাপের স্নেহ তিনি বেশীদিন ভোগ করতে পারেন নি। ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র হঠাৎ তাঁর বাপ এন্তেকাল করেন। কাজী নজরুল ইসলামের বয়স তখন মাত্র আট বছর। কিন্তু তাঁর হাতেখড়ি তাঁর বাপের কাছেই হয়। কাজী ফকির আহমদের ধর্মীয় কেতাবাদি বেশ ভালো পড়া ছিলো। তিনি তাঁর গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁর ছেলেকে কোরাণ শরীফ পাঠ আর কিছু মসলা-মসায়েল শেখান। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী শিশু নজরুল ইসলাম বাপের কাছ থেকে সবক নিয়ে চটপট তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। ফলে বেশ কিছু ধর্মীয় শিক্ষা অতি শৈশবকালেই তিনি লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর—অকস্মাৎ এতে ছেদ পড়লো, বাপের মৃত্যু ঘটলো। ফকির আহমদের মৃত্যুতে কাজী-পরিবারে দারিদ্র্য আরও ভয়াবহ আকারে দেখা দিলো।

বাপের মৃত্যুর পর শিশু নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তবে ভর্তি হলেন। তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম কবি প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন। চাচার কবিতা বিকাশ-ব্যাকুল শিশু-প্রতিভাকে স্পর্শ করলো। সেই স্পর্শে নজরুলচিত্তের সুপ্ত কবি চঞ্চল হয়ে উঠলো—চাচার কবিতার অনুকরণে বালক নজরুল ইসলাম কবিতা লিখতে শুরু করলেন। তাঁর চাচা তাঁকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিতেন। কাজী নজরুল ইসলাম মক্তবে পড়েন আর কবিতা লেখেন।

এলো ১৩১৭ সাল। নজরুল ইসলামের বয়স দশ বছর পূর্ণ হলো। মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ করলেন। কিন্তু আর পড়বেন কি করে? দুরন্ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাজী-পরিবারের চাকা অচল হয়ে গেছে। অতএব দশ বছরের বালক কাজী নজরুল ইসলামকে রোজগারের দিকে মন দিতে হলো। গ্রামের সেই মক্তবের তিনি শিক্ষক হলেন আর পাড়ায় পাড়ায় মোল্লাগিরী শুরু করলেন। কিন্তু গ্রামের মক্তবের শিক্ষকতা আর মোল্লাগিরীর রোজগার কী-ই-বা হয়? যৎসামান্যই রোজগার হতো। তাই দিয়ে বিধবা মা কায়-ক্লেশে সংসার চালাতে চেষ্টা করতেন।

এই নির্মম দারিদ্র্য বালক কবির প্রতিভাকে কিন্তু পিষে মারতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে লেটোর পালাগান সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিলো। এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে তার জনপ্রিয়তা অব্যাহত আছে। লেটোর দলের অভিনয়ের জন্য বালক নজরুল ইসলাম নাটক রচনায় মন দিলেন। সেই সব নাটক আর তার গান পল্লীবাসীর কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। লেটোর দলের অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাটক, এ-অঞ্চলের অন্যান্য পল্লী-নাট্যকারের নাটকের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃতি পেলো। গ্রামে বালক নাট্যকারের নাম-ডাক পড়ে গেলো। সেই বালক বয়সেই নিজের গানে নিজেই পল্লী ঢংএ সুর

দিয়ে গাইতেও তিনি পারতেন। ফলে তাঁর গ্রামের লেটোর দলে ওস্তাদের আসন গ্রহণ করার জন্য তাঁর ডাক পড়লো। তিনি তা গ্রহণও করলেন। লেটোর দলের ওস্তাদ হয়ে গান ও অভিনয় শেখাতে লাগলেন। এ থেকে যেটুকু তাঁব রোজগার হতো তার চাইতে ঢের বেশী হতো হুল্লোড়।

চির-চঞ্চল নজরুল অকস্মাৎ একদিন এই ওস্তাদী ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। সংসারের নির্মম দারিদ্র্যের হাহাকার থেকে পালিয়ে হাঁফ ছাড়ার জন্য আসানসোল টাউনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক রুটির দোকানে পাঁচ টাকা মাইনেয় চাকুরী নিলেন। ময়দা মেখে আর রুটি সেঁকে বালক নজরুল ইসলামের দিন কাটে।

কিন্তু তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনে আবাব এলো এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। ১৩১৯ সালের কথা। আসানসোলের ভারপ্রাপ্ত দারোগা কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ গান-বাজনার সমঝদার ছিলেন। একদিন তিনি এক ঘরোয়া গানের মজলিসে বালক নজরুল ইসলামের গান শোনেন—হয়তো কবি তাঁর স্বরচিত গানই গেয়েছিলেন। সেই গান শুনে নজরুলের প্রতিভার প্রতি দাবোগা সাহেব আকৃষ্ট হন। রুটির দোকানের কাজ ছাড়িয়ে তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর বাসনা দারোগা সাহেবের মনে জাগে। তিনি নজরুলের কাছে রুটির দোকানের কাজ ছাড়ার প্রস্তাব করেন এবং তাঁকে জানান তাঁর লেখাপড়ার ভাব তিনি নিতে চান। নজরুল এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হন। দারোগা সাহেব তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ীতে ময়মনসিংহ জেলায় ত্রিশাল থানার কাজীরশিমলা গ্রামে। দারোগা সাহেব নজরুলকে পাশের গ্রাম দরিরামপুরের ইস্কুলে ভর্তি করে দেন। দারোগা সাহেবের বাড়ী থেকে দরিরামপুর প্রায় দু'মাইলের পথ। রোজ দু'মাইল দু'মাইল—চার মাইল হেঁটে ইস্কুলে যাওয়া-আসা নজরুলের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তিনি দারোগা সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাঁর বাড়ী থেকে দরিরামপুর গ্রামে চলে

'আসেন এবং সেখানে মৃধা বাড়ীতে জায়গীর থেকে ইস্কুলে পড়তে থাকেন।

তাঁর এই ইস্কুলে পড়ার কাহিনীও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোত্থেকে তিনি একটা ভাঙা হারমোনিয়াম যোগাড় করেছিলেন। ইস্কুল থেকে পালিয়ে সেই হারমোনিয়াম নিয়ে তিনি প্রায়ই দুপুরবেলা বড়ো রাস্তার ধারে একটা আম গাছের নীচে বসে গানের মজলিস বসাতেন আর গ্রামের রাখাল ছেলেদের নিয়ে হৈ-হল্লা করতেন। খেলা-ধুলো, বাঁশী বাজানো, বঁড়শী নিয়ে মাছ মারা—এই সব আমোদ-উৎসবে তাঁর দিন কাটতো, ইস্কুলে হাজির হবার সময় বড়ো একটা পেতেন না। মাঝে মাঝে মর্জি-মাফিক ইস্কুলে উদিত হতেন। কিন্তু এ তো আকাশে চাঁদের উদয় নয় যে, সবাই উৎফুল্ল হয়ে অভিনন্দন জানাবে! ইস্কুল-পলাতক ছাত্রকে হঠাৎ ইস্কুলে উদিত হতে দেখে মাষ্টাররা তাঁকে কী প্রাণান্তকর অভিনন্দন জানাতেন তা বর্ণনা করা অনাবশ্যক মনে করি। কিন্তু এই পলাতক ছাত্রই ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হতেন। পরীক্ষার আগে অবিরাম দিন কয়েক পড়ে পাঠ্য বিষয় একেবারে মুখস্থ করে ফেলতেন। অপূব তাঁর মেধা ছিলো।

বছরখানেক দরিরামপুর ইস্কুলে পড়ে তিনি আবার ফিরে গেলেন আসানসোলে নিজ গ্রামে. কিন্তু গ্রামে বসে বৃথা আর সময় নষ্ট করলেন না। সোজা চলে গেলেন রানীগঞ্জে। তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন, সেই সাহায্যের উপর নির্ভর করে তিনি সিয়ারসোল রাজ ইস্কুলে ভর্তি হলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বালক নজরুলের মেধা এবং তাঁর বাংলা রচনার চমৎকারিত্ব ইস্কুলের মাষ্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ইস্কুলের বাংলার পণ্ডিত মহাশয় তাঁর লেখার অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তাঁরই চেষ্টায় সিয়ারসোল রাজ এষ্টেট থেকে নজরুল ইসলাম একটি বৃত্তি পান। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সিয়ারসোল রাজ ইস্কুলে পড়ার সময় নজরুল ইসলামের গদ্য রচনাই মাষ্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঐ

সময়ে লিখিত তাঁর কবিতা সম্পর্কে তেমন কিছু খবরাখবর পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে যে, সিয়ারসোল স্কুলে পড়ার সময় তিনি গদ্য রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন—কবিতা বড়ো একটা লিখতেন না।

১৯১৭ সাল। নজরুল ইসলাম দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। বাঙালী সৈন্যবাহিনীতে বাঙালীদের রিক্রুট করা হচ্ছে। কাজী নজরুল ইসলাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর অন্তর্নিহিত শৌর্য ও পৌরুষ তাঁর কানে কানে তাঁকে বার বার বললে, এ সুযোগ ছেড়ো না। নাম লেখাও বাঙালী পল্টনে, পুরুষ-বাচ্চা ছুটে যাও লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। নজরুল ইসলাম মনস্থির করে ফেললেন। ইস্কুলের লেখাপড়া চিরতরে সাঙ্গ হলো। নাম লেখালেন বাঙালী পল্টনে। কৈশোর শেষ হতে না হতেই নজরুলের ছাত্রজীবন শেষ হলো, শুরু হলো সৈনিক জীবন।

আজ যাঁকে বেশি প্রয়োজন ছিলো

পরিমল গোস্বামী

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৈন্যের পোশাক ছেড়ে বাংলাদেশে যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। এই বয়সের এক তরুণ যুবক কবিতায় এক নতুন বিদ্রোহের সুর এনে দারুণ আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত যুদ্ধ-ক্লান্ত ইউরোপ ঠিক এই সময়ে, (১৯১৮তে বা পরে) শান্তির বাণী, যুদ্ধবিরোধী বাণী শুনতে যখন উদ্‌গ্রীব, সেই সময়ে এই চির-আধমরা বাংলাদেশে কবি নজরুল আনলেন সকল শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করার বাণী। 'বিদ্রোহী'র রচনা সময়ে (১৯২১) কবির বয়স একুশ বছর মাত্র।

এই সময়ে কবি আপন শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'—এই 'সহসা'র তাৎপর্য কি? এ কি যুদ্ধের শিক্ষা নিতে নিতে মনের কোনো অবস্থান্তর? এ রকম হওয়া অসম্ভব নয়। রণক্ষেত্রের মাঝখানে তখন তিনি। রাইফেল ও অন্যান্য শিক্ষা সমাপ্ত, তখন তিনি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। এ সময় করাচীতে থাকতে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুরতাব ছবি কি তাঁর কল্পনায় ফুটে ওঠেনি? কবির মনটি তো যুদ্ধের শিক্ষা নিতে নিতে নষ্ট হবার নয়। হয়তো কখনো তাঁব মনের গহনে অত্যাচারী বর্বর মানুষের ছবি নাড়া দিয়ে থাকবে। যুদ্ধে শত্রু হত্যার ক্ষমতা কবি লাভ করেছেন, আত্মশক্তি তাঁব মনে জেগে উঠেছে এবং তাঁর স্পর্শচেতন কবি-মন সে নবলব্ধ শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতে কি করবেন তারও একটা আভাস তাঁর মনে চকিতে দেখা দিয়েছে এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিবেশে তা হয়তো মিলিয়ে গেছে। তারপর তা আবার

নতুন করে জেগে উঠেছে দেশে ফিরে আসার পর। এই সমস্ত উপলব্ধি এবং কল্পনা মিলিয়ে তাঁর বিদ্রোহী কবিতার জন্ম। অবশ্য এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

তিনি সৈনিকের শিক্ষা পেয়েছেন, যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়নি তাঁকে, কিন্তু সৈনিকের আদর্শ, সৈনিকের বৃত্তি তাঁর রক্তে মিশেছে। তিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন, 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমাব খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!'— এবং এই চেনার অর্থ যুদ্ধের বর্ম তিনি গা থেকে আর খুলবেন না, যুদ্ধ চলবে এখন দেশেব ভিতরে যাবা অত্যাচারিত তাদের পক্ষ নিয়ে, অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে। এবং যতদিন না এই অত্যাচারের অবসান তিনি ঘটাতে পারবেন, ততদিন তাঁর সংগ্রাম শেষ হবে না।

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

এই শপথের মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তরের গভীরতম দেশ থেকে এর প্রেরণা। এবং পড়তে বসলে এর ধ্বনি পাঠকের মনকে আনন্দে গর্বে উদ্বেল করে তোলে। এর তেজ আগুনের মতো পাঠকমনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, এ যেন যুদ্ধের বিউগল ধ্বনি, কবির সঙ্গে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। এ জাতীয় কবিতা সব সময়েই প্রেরিত কবিতা, ইনস্পায়ার্ড কবিতা, এর বোল আনাই অন্তরের সুর। এই প্রেরণার মুহূর্তে একমাত্র কবির মর্মবাণীই ধ্বনিত হওয়া সম্ভব।

বিদ্রোহী কবিতা কবির প্রথম আত্মোপলব্ধিজাত কবিতা। এ কবিতা তাঁর মনে প্রবেশের প্রথম দরজা। কবি কোন্ বাণী নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন তার পরিচয় আছে এ কবিতায়। তাঁকে এখন আর কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারবে না, সকল প্রথা ও আচারের ঊর্ধ্বে তিনি, যোদ্ধা তিনি, বিরাট শক্তিধর তিনি, আত্ম উপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধে মহীয়ান তিনি—তাই তিনি সদা উন্নতশির ঋজুদণ্ডী। তাই তিনি বলতে পারেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। তাঁর স্থান সবার ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর আত্মশক্তি-বিশ্বাস-জাত দ্বিধাহীন সমালোচনার অধিকার—

'তোদের জাত ভগীরথ এনেছে জল
জাত-বেজাতের জুতো-ধোয়া।'

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে চাবুক এটি। ঠিক এই সুরেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতিকে এককালে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তিনি এই অর্থহীন আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বলেছিলেন—'ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন-রাত ঘামতে চায় তাদেরই নাম হতভাগা ; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো।'...

সমাজকল্যাণ বিষয়ে মনে আগুনের জ্বালা না থাকলে এমন ভাষা আসতেই পারে না।

কাজী নজরুল সুস্থ থাকলে আজকের দিনে আবার তাঁকে তাঁর অসমাপ্ত কাজে ফিরে পাওয়া যেতো সন্দেহ নেই। তাঁকে আজ অবশ্যই তাঁর প্রতিভা কোনো প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করে করে সংসার চালাতে হতো না। বাজারের জন্য গান লিখতে হতো না, এ-কথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে। আজ তাঁর সুস্থ থাকার প্রয়োজন ছিলো সব চেয়ে বেশি। দেশে যে ভেদবুদ্ধি মাথা তুলেছে, আবার যেমন অস্পৃশ্যতা একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে, তাতে আমার বিশ্বাস তিনি সুস্থ থাকলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে অন্তত সাম্প্রদায়িক বিভেদের মাঝখানে সেতু রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জীবিত

থাকতেই আজ রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে—'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীতহারা।'—বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য।

আজ বাংলা দেশেরই কণ্ঠ রুদ্ধ। যাঁরই বেঁচে থাকা যখন অত্যন্ত জরুরী বোধ হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে আমরা হারিয়েছি। কর্মরত অবস্থায় অকালে সবার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। কবি নজরুলও ঠিক তেমনি—তাঁর কাল ও কাজ অপূর্ণ রেখে জীবন্মৃত হয়ে রইলেন। যে জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা, সেই জড়ত্ব আগে তাঁর মগজকে আক্রমণ করলো! বাংলা দেশের ভাগ্যদেবতা পরিহাসপ্রিয় সন্দেহ কি!

বিজ্ঞাপন রচয়িতা নজরুল

আবদুল আজীজ আল্-আমান

'মোসলেম ভারত'এর যুগে কবির আর একটি স্বরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—'বিজ্ঞাপন রচয়িতা' নজরুলের স্বরূপ। 'ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্' বাংলার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কিশোর কবিকে তাঁদের নির্মিত হারমোনিয়ামের একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিতে বলেন, কবি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যান এবং লেখেন আট লাইনের এই মনোরম বিজ্ঞাপন :

কি চান? ভালো হারমোনী?
কাজ্ কি গিয়ে—জার্মানী?
আসুন, দেখুন এইখানে
যেই সুরে যেই গানে
গান না কেন, দিব্যি তাই
মিলবে আসুন এই হেথাই!
কিনবি কিন্
'ডোয়ার—কিন'।

সে সময় পার্কসার্কাস এলাকায় 'বাহাদুর' নামে আর একটি বাদ্য-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ছিলো। ডোয়ার্কিনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও কবির কাছে ছুটে এলেন। একই অনুরোধ—তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নির্মিত 'বাহাদুর' হারমোনিয়ামের বিজ্ঞাপন লিখে দিতে হবে। কবি এবারেও লিখলেন আট লাইনের কবিতা—'বাহাদুর'এর চমৎকার বিজ্ঞাপন :

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান তো কিনুন 'বাহাদুর'!
দু'দিন পরে বলবে না কেউ—'দুর-দুর'!
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর!!

করতে চান কি মনের প্রাণের আহা দূর ?
একটি বার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর' !
যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরীন ভরাট
বাহা সুর।
চিনুন, কিনুন 'বাহাদুর' !!

এ দুটো বিজ্ঞাপনই 'মোসলেম ভারত'এর অনেকগুলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিলো। আমি দ্বিতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দু'টি একত্রে দেখেছি। নজরুল কোনো এক কেশ তৈলের উপর একটি সুন্দর বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন—কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তখনো কাজীদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ হয়নি। তা না হলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করছিলাম না। কাজীদার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই নলিন'দার (নলিনীকান্ত সরকার) কাছে তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলি শিখে নিয়েছিলাম পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

দেশের তরুণ-যুবক সকলের মুখেই তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম।···

দূর থেকে কাজীদার মূর্ত বিদ্রোহের আভা, আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে মানুষকে নতুন-চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই সব বাণী আমার সেই কিশোর মনেও এসে ধাক্কা দিলো, এক অনাস্বাদিত সাড়া জাগালো সারা মনে প্রাণে।

তাই কাজীদার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার সঙ্গীত সাধনার পথ প্রদর্শক জেনেও কাজীদার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়ার কথা মনে হলো না। শুধু কাজীদার সুরে সুর মেলাবার জন্য তাঁর জ্বালাময়ী দেশাত্মবোধক গানগুলিই শিখে নিলাম নলিন'দার কাছে। সেই বয়সেই আমি নানা জলসায় সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গাইছি। এবার গাইতে শুরু করলাম কাজীদার এই সব গান।···

তারপর একদিন হঠাৎই তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

কার সঙ্গে ?

কার সঙ্গে আবার, যাঁর হাত ধরে অনেক নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন কাজীদা, সেই নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে।

ব্যস, হয়ে গেলো ; ওই একদিনই সঙ্গী করে পথ চিনিয়ে নিয়ে-

আসার অপেক্ষা। তারপর কাজীদা নিজেই নিলেন স্থায়ী আসন করে আমাদের বাড়ীর এই গানের ঘরোয়া-দরবারে।

আর এ আসন শুধু আমাদের বাড়ীর গানের দরবারেই নয়, আমাদের মনেও।

এতোদিনে, দূরের মানুষ কাজী নজরুল ইসলাম, ঘরের মানুষ কাজীদা হলেন আমার।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু' বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি যেন আমাদের আঁধার ঘরে এসেই অগ্নিসেতু বেঁধে দিলেন।

শুধু একটি হারমোনিয়াম পাওয়ার অপেক্ষা। তারপরেই চললো তাঁর গান, গান আব গান। সুরের আকাশ ভরিয়ে দিলেন কাজীদা তাঁব উদাত্ত দরাজ ভরাট গলার আওয়াজে।

কাজীদা এলে সারা পাড়ার মানুষ জেনে যেতো যে, ওদের বাড়ী কাজী নজরুল ইসলাম এসেছেন। যেন একটা অদৃশ্য ঝোলায় কবে অপর্যাপ্ত হাসি আব আনন্দের রঙমশাল নিয়ে আসতেন কাজীদা। জীবনের অফুরন্ত আনন্দস্রোতে তিনি নিজেও গা ভাসিয়ে দিতেন, আর সঙ্গী হয়ে যাবা থাকতো তাদেরও নিয়ে চলতেন ভাসিয়ে।

কতোদিন দেখেছি একটি হারমোনিয়াম আর পান-জর্দা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়ে আর গান শুনে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। কোথায় ভেসে গেছে তাঁর জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আর প্রয়োজনীয় কাজ। একাই একশো হয়ে কাজীদা সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন।

নিজের আলোয় অপরকে উদ্ভাসিত করতে পারেন, এমন যে ক'জন মানুষের সান্নিধ্যে আমি এসেছি, কাজীদা তাঁদের শিরোমণি।

বহুদিন আমি ভেবেছি, এতো মুক্তি-প্রতীক আকাশের মতো নির্মম হাসি-আনন্দ কাজীদা কোথা থেকে আহরণ করে আনেন? কোথা থেকে নিয়ে আসেন এতো হাসির ঝর্না-ধারার টুং টাং ছন্দ?

বাল্যস্মৃতির একপাতা

কাজী সব্যসাচী

আজও স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে 'বিদ্যাপতি'র নতুন রেকর্ডগুলো বাবা বাড়ীতে নিয়ে এলেন, সেদিন সমস্ত পালাটা শুনেছিলাম। আমি আর নিনি (ছোটো ভাই কাজী অনিরুদ্ধ) স্কুলের ছুটির পর খেলতেও যাইনি, আর কেন জানি না, গান শুনে, অভিনয় শুনে, খালি কেঁদেছিলাম।

আজ বাবার লেখা সেই 'বিদ্যাপতি' পালা আমাদের কাছে নেই। থাকলে, আজও বার বার শুনতাম আর কাঁদতাম। কী অপূর্ব গান, কী অপূর্ব দরদী অভিনয়! অদ্ভুত সঙ্গীত-পবিচালনা। দারুণ ভালো হয়েছিলো সাউণ্ড এফেক্ট।

ভুলবো না—কিছুতেই ভুলবো না।

'বিদ্যাপতি' পালাতে বিদ্যাপতি হয়েছিলেন ধীরেন দাস, গানে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। রানী লছমী—প্রভা দেবী, গানে—হরিমতি দেবী। রাজা শিব সিংহ—রবি রায়, ধনঞ্জয়—রঞ্জিত রায় এবং 'অনুবাধা' হয়েছিলেন সরযূবালা দেবী, তাঁর কণ্ঠের গানগুলিও গেয়েছিলেন হরিমতি দেবী। বিজয়া কে হয়েছিলেন তা এখন আর মনে করতে পারছি না।

একমাত্র সরযূবালা দেবী ছাড়া এঁদের কেউই আজ আর নেই—কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, সেই গান সেই অভিনয় আমার হৃদয়ে বার বার ঝংকৃত হতে থাকবে। যাঁবা নেই, তাঁরা আমার কাছে আবার ফিরে আসবেন।

নজরুলের ধূমকেতু

আবদুল হালীম

···নজরুলের 'ধূমকেতু' বাংলার সাহিত্যাকাশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বাংলার তরুণ সমাজ ও সাহিত্যসেবীদের ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতনই বিস্মিত করে দিলো। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ জানালেন—

'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে উড়িয়ে দেরে
তোর বিজয় কেতন।'

'ধূমকেতু' অফিসে কবিকে ঘিরে আমাদের মজলিশ বসতো। কবি ও সুসাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার, কবি যতীন বাগচী, যতীন সেনগুপ্ত প্রমুখ নজরুলের অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও 'ধূমকেতু' অফিসে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু আমাদের মতো ছন্নছাড়া ভবঘুরে বাঁধনহারাদেব মজলিশ জমে উঠতো নজরুলকে কেন্দ্র করে। নৃপেন চ্যাটার্জি, শান্তি সিংহ, অমরেশ কাঞ্জিলাল, দুদু মিঞা এবং আরো অনেকে আসরে যোগ দিতেন। পবিত্রদা, নলিনী সরকার (গায়ক) নলিনী সেনগুপ্ত (নাট্যকার) হাস্য-রসিক দাদাঠাকুর (কবি শরৎ পণ্ডিত) 'ধূমকেতু'র আসরে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁদেরও ছিলো অফুরন্ত ভালোবাসা, প্রগাঢ় উৎসাহ। নজরুল তাঁর কবিতা ও গানে আমাদের সবারই অন্তরে প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগাতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ·তো দরাজ গলায় নজরুলের গান, নয়তো 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা' প্রভৃতি বিপ্লবী কবিতার আবৃত্তি। বিদ্রোহীর ভঙ্গিমায় 'বিদ্রোহী'র আবৃত্তি নজরুলকে বিপ্লবী নায়করূপে মূর্ত করে তুলতো। কবির সুডৌল বলিষ্ঠ

দেহ, বড়ো বড়ো বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ, মাথায় রুক্ষ দোলায়মান লম্বা চুল ; সহাস্য মুখ, দীর্ঘ ঢিলা পিরান, পীত শিরস্ত্রাণ গৈরিক বেশ, হাতে বেণু কবিকে মহিমান্বিত করে তুলতো, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে নজরুলের এতটুকু ক্লান্তি ছিলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, গান ও কবিতায় কাপের পর কাপ চা শেষ হচ্ছে। নজরুলের মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটছে, কলহাস্যে মজলিশ মুখরিত, আহার নেই নিদ্রা নেই কবি তাঁর ছন্দ দোলায় গান ও কবিতা রচনা করে চলেছেন, শত কোলাহলের মধ্যেও তাঁর লেখনী স্রোতের মতো বেগবান—কতো বিনিদ্র রজনী তাঁর এইভাবে কেটে যেতো। ছিলো না তাঁর এতটুকু জাড্য বা ক্লান্তি।

নজরুলের একমাত্র নেশা ছিলো চা ও পানএর। বিদ্রোহী কবি 'ধূমকেতু'র মারফতে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। তাঁর বিপ্লবী কবিতা, তাঁর অমর কণ্ঠের গান, তাঁর সুর-লহরী, তাঁর আবৃত্তি বাংলার বিপ্লববাদী তরুণদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা, দেশপ্রেরণা, আত্মবিস্মৃতি ও উন্মাদনার সৃষ্টি করলো। অজ্ঞাত কুলশীল নজরুল তখন আর শুধু সৈনিক কবি হাবিলদার নজরুল নন, তিনি তখন তরুণ বাংলার 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল। নজরুলের 'ধূমকেতু'র স্থান ছিলো বাংলার অগ্নিঋষি বারীন ঘোষের 'বিজলী' ও উপেনবাবুর 'আত্মশক্তির'ও উপরে।...

কবি-কথা

গোপাল ভৌমিক

রবীন্দ্র কাব্যের ঐতিহ্যে মানুষ হলেও আমার জীবনে নজরুল ইসলামের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো ১৯৩৪-৩৫ সালে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্রনাথ তখনও দেদীপ্যমান সূর্য। তবু এরই মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতার কিছুটা ভিন্ন সুর, তাঁর তেজোদীপ্ত প্রকাশভঙ্গী, তাঁর ভাব ও ভাষার স্বকীয় বলিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম আমার মতো অনেক তরুণের মনেই যে আগুন জ্বালিয়েছিলো—এ বিষয়ে সংশয় নেই। তাঁকে সশরীরে দেখার একটা উদগ্র আগ্রহও ছিলো মনে মনে। কিন্তু সে আগ্রহ মিটতে সময় লেগেছিলো আরও অন্ততঃ সাত-আট বৎসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—তখন শিক্ষাজীবন শেষ করে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকায় সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগ দিয়েছি। এই সময় মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে দৈনিক 'নবযুগ' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কিছুদিনের জন্য কবি নজরুল ইসলাম এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর কোনো কোনো সম্পাদকীয় পুরোপুরি কবিতাতেই তিনি লিখতেন। সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

সেই সময় তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। বলা বাহুল্য তাঁকে প্রথম দেখেও আমার আশাভঙ্গ হয়েছিলো। কবিতা পড়ে তাঁর একটা মূর্তি নিজের মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলাম। আমার কল্পনার সঙ্গে তাঁর বাস্তব দেহাবয়বের মিল ঘটলেও তাঁর পোশাক আশাক দেখে আমার মন ভরেনি। তাঁকে যে সময় আমি প্রথম দেখি, তখন তিনি গেরুয়া রঙের পোশাকধারী। এ যেন বিপ্লবী কবির দলে এক ত্যাগব্রতী সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর রূপ। সুতরাং

আশাভঙ্গ হওয়া আদৌ বিস্ময়কর ছিলো না। পরে অবশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কবিজীবন পড়ে তাঁর জীবনে বহু সংগ্রাম, বহু বেদনা ও বহু রূপান্তরের কথা জেনেছি।

নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভা বহুমুখী ও বিচিত্র পথগামী হলেও সে যুগে তরুণ সমাজের কাছে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিলো বিপ্লবী কবি বলে। আর তাঁর জীবনে এটা শুধু কথার কথা ছিলো না এবং তিনি শুধু কাব্যরচনাতেই বিপ্লবী ছিলেন না—বিপ্লব ছিলো তাঁর ধমনীতে। তার মূল্যও তাঁকে জীবনে দিতে হয়েছে। সে জন্য অবশ্য তিনি অনুতাপ করেন নি কিংবা সাময়িক লাভের লোভে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি গেয়েছেন: 'বলো বীর। বলো উন্নত মম শির।' এ শুধু কবিতার কথা নয়—এ তাঁর অন্তরের কথা এবং নিজের জীবনে তিনি বার বার এই স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অনেক বাধার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, খামখেয়াল ও দারিদ্র্য ছিলো তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু বেপরোয়া নজরুল ইসলাম সে জন্য কুণ্ঠিত ছিলেন না এবং সে জন্য কোনোদিন কারও কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি।

এই একটি ক্ষেত্রে নজরুলের জীবন ও কাব্য এক। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁর কবিতাগুলিকে নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না—তিনি ছিলেন দেশসেবক ও সমাজ সংস্কারক। পরাধীন দেশের অসহ দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা, আমাদের সমাজের নানা জাতীয় ভণ্ডামি; ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে নানা ধরনের শোষণ প্রয়াস নজরুল ইসলামের কবি মনকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো এবং তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ফণিমনসা', 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের উদ্দীপনামূলক ও ঝাঁঝালো কবিতাগুলিতে। এগুলি নিছক কবিতা নয়—এগুলি কবির জীবনের তাজা রক্ত দিয়ে লেখা। কবির ভাষায় বলতে গেলে

বলতে হয় : 'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা। তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।' কবির উক্তির মধ্যে আদৌ কোনো অতিরঞ্জন নেই। পূর্বেই বলেছি নজরুল শুধু কবিতায় বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনেও বিপ্লবী এবং এই বিপ্লবের উন্মাদনায় দেশমাতৃকার সেবা করতে গিয়ে দারিদ্র্যের অসহ যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নিতে তিনি যেমন কুণ্ঠিত হন নি তেমনই কারাবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। একাধারে বিপ্লবী সত্তা ও স্পর্শকাতর কবিমনের অধিকারী নজরুল ইসলামকে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তাঁব বহু কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের জোয়ার বেশি এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন হৃদয়াবেগপ্রবণ মানুষ। মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য দেখে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক ছিলেন না—সে অবস্থার সম্মুখীন হলে দুঃখ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অভাব মোচন করতে গিয়ে নিজের শেষ সম্বল পর্যন্ত তিনি অকাতরে দান করতেন।

কবিতা এবং গানই ছিলো প্রাণোচ্ছল নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ জীবনের একমাত্র সহায়। তিনি কবিতাকেই নিপীড়িত জনগণেব সংগ্রামে তাঁর হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। এ কাজ ভালো হয়েছিলো, কি খারাপ হয়েছিলো, তার সূক্ষ্ম বিচার করবেন আজকের এবং ভাবী যুগের সাহিত্য সমালোচকগণ। আমি এখানে শুধু আমার উপলব্ধ একটি সত্যকে তুলে ধরছি। একমাত্র বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে নয়, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেও নজরুল ছিলেন একমাত্র জনগণের কবি এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ নিজের নাতিদীর্ঘ কবি-জীবনে জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে উঠেছিলেন তিনি। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের কথা যেভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, ইদানীং কালের আর কোনো কবির কবিতায় তার পরিচয় আমরা পাই না। যতদিন পৃথিবীতে দারিদ্র্য দুঃখ থাকবে, নিপীড়ন নির্যাতন থাকবে এবং সামাজিক বৈষম্য অনাচার প্রভৃতি থাকবে, ততদিন নজরুল ইসলামেব এই সব কবিতার আবেদনও কমবে না—এই আমার বিশ্বাস।

নজরুলের জীবন শুরু হয়েছিলো আরো পাঁচটা দরিদ্র গ্রাম্য বালকের মতো ছন্নছাড়া বাঁধনহারা জীবনবোধ দিয়ে। লেখাপড়া শেখবার সুব্যবস্থা তাঁর হয়নি। গ্রামের মক্তবের মৌলভীর কাছে আরবী ফারসী শিক্ষা দিয়েই শিক্ষার গোড়াপত্তন। তাই তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যে আরবী ও ফারসী শব্দের বয়ন ও চয়নে চমকিত হতে হয়। সুনিপুণ গাথায় মনে হয় কবি যেন বাংলা ভাষাকে আরব্য পারস্যের গোলাপের আভরণে এক মিষ্টি সুষমায় আমোদিত করেছেন।

'চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এলো ভোবের দরদালানে
পাতার জাফ্‌রি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলস্তানে।'

নজরুলের কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়েছিলো অতি শৈশবেই। তখনকার চুরুলিয়ার 'গোদাকবি'রা তাঁকে 'ব্যাঙাচি' কবি বলে ডাকতেন আর সেই এগারো-বারো বছর বয়সেই 'লেটো' দলে ভিড়ে তিনি খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন। অনেক সময় দলের হয়ে আসরে নেমে তাকে হাসি গান ও কৌতুকে আসর জমাতে হতো। নজরুল ছিলেন হাসির রাজা। ছেলেবেলা থেকেই তিনি রঙ্গপ্রিয়, নির্দোষ হাসি কৌতুকে তখনকার দিনে তার জুড়ি ছিলো না।

সেই সময় তরজাগানে আরবী-ফারসী-উর্দু-ইংরাজী মিশেল দেওয়া ছিলো পৌরুষের পরিচয়। আর 'ব্যাঙাচি' কবি নজরুল ছিলেন পাঁচমিশেলীর যাদুকর। সেই ছোটোবেলাতেই তিনি 'লেটোগানের' আসরকে মাতিয়ে তুলতেন—হাসির হুল্লোড়, তুফান উঠতো আসরে। আসর হতো জমজমাট :

'রব না আর কৈলাসপুর
আই অ্যাম ক্যালকাটা গোইং।

যতো সব ইংলিশ ফেসেন
আহা মরি কি লাইটনিং।'

অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী পাল্লাদারকে লক্ষ্য করে তাঁর ব্যঙ্গ গীতি—

'ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার মস্ত বড়ো mad,
চেহারাটাও monkey like দেখতে ভারি cad.
Monkey লড়বে বাবর কা সাথ্
ইয়ে বড়া তাজ্জব বাত।
জানে না ও ছোট্ট হলেও হামভি lion lad.'

সত্যই তিনি 'সিংহশাবক'। আশ্চর্য হতে হয় কিশোর-কবির আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায়, যে আত্মপ্রত্যয় তাঁকে অস্থির উদাস করেছে। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে দূর থেকে দূরান্তরে। নজরুলের কবি প্রতিভার প্রথম বিকাশ ঘটেছিলো 'লেটো' গানে কিশোর বয়সে। দুঃখের কালকূটকে দূরে সরিয়ে হাসি-গানের স্ফূর্তিতে স্ফুরণ ঘটেছিলো এক কবিসত্তার। আর যে অসামান্য লোকোত্তর প্রতিভা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তা হলো করাচীর সেনানিবাস।

নজরুলের কাব্য, প্রতিভার অধিকারে বলশালী হলেও আসল স্বতঃস্ফূর্ততা ঘটেছে সঙ্গীতে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলেই ধরা পড়ে নজরুল প্রতিভা প্রধানতঃ সঙ্গীতমূলক। কাব্য ও সঙ্গীতের মূল প্রেরণা এক। সম্পর্ক নিকটতর। কবির কাব্য তাঁর ভাবাবেগের বাণীমূর্তি, আর সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি। নজরুলের জীবনে দুটোই সার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে।

হাসির রাজা নজরুলের হাসির গানের জুড়ি মেলা ভার। হাসির নামে ভাঁড়ামি না থাকলে যে সুরুচি সম্পন্ন হাস্যরস সৃষ্টি হতে পারে, নজরুল তাঁর গানেই তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত এঁকেছেন। নজরুল তাঁর হাসির গানের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর হাসির গানের বইগুলির মধ্যে দু'টি বই-ই আমাদের খুব বেশী পরিচিত। এই বই

দু'টির মধ্যে হাসির গানের সমস্ত দিকগুলির বিশদ পরিচয় মেলে। প্রথম গ্রন্থটি চন্দ্রবিন্দু, যেটি প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্প্রাপ্য হয়েছিলো তদানীন্তন বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে। এই সঙ্গীত গ্রন্থের গানগুলির কিছু গান রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গে ভরপুর। আর দ্বিতীয়টি 'সুর ও সাকী' মানবিক প্রেম ও ধর্ম সম্বন্ধীয় মধুররসে রঙ্গপ্রধান।

ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে হিন্দু মুসলমানের মিলন অথবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়। নজরুলের কবিমানসের দৃঢ়তা সেখানে সুস্পষ্ট। তাই চন্দ্রবিন্দুর গানগুলিতে হাসিঠাট্টায় ইয়ার্কি ও বিদ্রূপের সুরে বার বার কবিআত্মা প্রতিধ্বনিত—

'বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে নব প্যাক্টের আসনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।
... ...
আঁট-সাঁট করে গাঁটছড়া বাঁধা হলো টিকি আর দাড়িতে
বজ্র-আঁটুনি ফস্‌কা-গেরো ? তা হয় হোক্ তাড়াতাড়িতে
... ...
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হেঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব প্যাক্টের পুণ্যে।
... ...
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা মন্দির পানে হিন্দু।
আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু।'

'সস্তা দরে দস্তা মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা পচা,
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আস্‌লে 'যুদ্ধ দেহির খোঁচা'।
গুণীরা খায় বেগুন পোড়া
বেগুন চড়ে গাড়ী-ঘোড়া,
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে।'

'ভ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,
রাজা আংরেজ হারাম-খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।'

'কাফ্রি চেহেরা ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে
ভীষণ বম্ব্ চাষ করে ওরা
অস্ত্র আইন বাঁচাতে!'

'ডিম গোলাকার গোল টেবিল
করবে সার্ভ্ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে, অতঃ কিম?'

'বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে।
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি
মা হবেন আজ ডোম্‌নীরে॥'

নজরুলের চন্দ্রবিন্দুর গানগুলি সরস ব্যঙ্গদীপ্ত অভিব্যক্তির পরিচায়ক এবং দ্বিতীয়ার্ধের গানগুলিতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপতীব্র শ্লেষ ও প্রচ্ছন্ন চাপা ঝাঁঝের সাক্ষাৎ মেলে।

উপভোগ্য কৌতুকরস সৃষ্টিতে নজরুল ছিলেন দক্ষ কাবিগর। তাঁর ব্যঙ্গ গানের সুর-নৈপুণ্যতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। অসামান্য সুরের ইন্দ্রজালে শ্রোতাকে হারিয়ে দিয়েই কবি তৃপ্ত। হৃদয় আবেগকে উথলে দিয়ে কবিমন আত্মদীপ্তিতে ভাস্বর।

জাতি তাঁর গানের প্লাবনে প্লাবিত হতে পারতো। তাঁর ব্যঙ্গ-রসের চাবুকে জাতির প্রাণাবেগ উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তির পথ খুঁজতো।

সেখানেই তিনি অনন্য। আর কোনো কবির পক্ষে জাতির অন্তরের গভীরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। কারণ, কে না জানতো—নজরুল ছিলেন মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় যোদ্ধা। তাই তাঁর ঘোষণা—

'বোমা মেবে মেবে পায়নাকো খুঁজে
আজও উদবে 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভ্য ষাঁডেব
সহিত হানিবে টক্কর ?'

তাঁর হাসির গানের দ্বিতীয় গীতিগ্রন্থটি 'সুর সাকী' ; মানব-প্রেম ও ধর্মীয় ভাবধারায় লঘুবসের ব্যঙ্গপ্রধান গ্রন্থটিতে আর এক নজরুলের পরিচয়। এখানে কবির হাস্যরসাত্মক প্রখরতা কম হলেও বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য, অন্তরের সজীবতা ও ভাবপ্রবণতা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর এই লঘুবসের গানগুলি স্পর্শাতুর প্রাণে আনে চপল দুষ্টুমির ছোঁয়া। হৃদয়কে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করে মনকে মাতিয়ে তুলতে সক্ষম।

নজরুল প্রাণবন্ত কবি—হাসি তাঁর বলিষ্ঠ। দুঃখেব বোঝা বুকে নিয়ে তিনি হেসেছেন ; সে হাসি তাই সহানুভূতিশূন্য নয়। তাঁব ব্যঙ্গের চাবুক অন্যের উপরই শুধু বর্ষিত হয়নি, নিজেও পেয়েছেন তার জ্বালা। তাঁর সমগ্র শিল্পী সত্তাকে বিচার করলে দেখা যায় হাসিই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র—কোথাও তা উচ্ছ্বসিত, কোথাও অন্তঃসলিলা। সেই আবেগ উচ্ছল হাসির শতধারায় তাঁর হাসির গান সমৃদ্ধ। এই হাসির গানের জন্য বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস-বিভাগে সার্থক শিল্পীরূপে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

সাধক কবি নজরুল

রমা চৌধুরী

দেশের গৌরব, পরম শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সাধক। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক সাধকদের মতই তিনিও জগতের ও জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর ধর্ম দর্শনমূলক কাব্যকৃতির প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে এই সত্যটি প্রকটিত হয়ে রয়েছে মধুরতম মহিমায়। কী স্থির বিশ্বাসভরে, কী ধীর আনন্দ উচ্ছ্বসিত অন্তরেই না তিনি বারংবার বলেছেন গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে :

(মা) একলা ঘরে ডাকবো না আর
দুয়ার বন্ধ করে।
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকবো মা সেই ঘরে।

কিংবা

আয় অশুচি আয়রে পতিত,
এবার মায়ের পূজা হবে।
যেথা সকল জাতির সকল মানুষ
নির্ভয়ে মা'র চরণ ছোঁবে

*　　　*　　　*

(মা) সিংহ-আসন হতে নেমে
বসেছে দেখ্ ধূলির তলে।
(মা'র) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে
সবার ছোঁওয়া তীর্থজলে।

*　　*　　*

দীনের হতে দীন অধম যথা থাকে
ভিখারিণী বেশে সেথা দেখেছি
মোর মাকে।
(মোর)　অন্নপূর্ণা মাকে ॥
অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে
মাকে খুঁজি
(মা)　ফেরেন ধুলির পথে
যখন ঘটা করে পূজি ॥

কী অপূর্ব এই সার্বজনীন উদার ভাব। এই তো হলো প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারার অনুসরণ,—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকে, জীবের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করা, আরাধনা করা, সেবা করা।

কিন্তু কাজী নজরুল কেবল সাধারণভাবে ভারতীয়ই ছিলেন না, ছিলেন সেই সঙ্গে বিশেষভাবে বাংলার ভাবসাধনার উত্তরসাধক। বাঙালীর ধর্ম ও জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। বাঙালীব এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো জগজ্জননীকে অতি অনায়াসেই—'ঘরের দেখা, ঘরের মা' রূপে পাওয়া, গৌণ অর্থে নয়, রূপক অর্থে নয়, জ্ঞানের দম্ভে বা নিছক কবির কল্পনাতেও নয়—মুখ্য ও আক্ষরিক অর্থেই সেই পাওয়া সত্য ও বাস্তব। জগজ্জনীনকে নিজের মায়ের মতো একান্তভাবে পাওয়ার আকুতিই চিরকাল বাংলার কবি ও সাধকদের অনুপ্রাণিত করছে। বস্তুত এই 'মা'ই ছিলেন নজরুলের অধ্যাত্ম-সাধনাপুত জীবনের সর্বস্ব—তাঁর অন্য সব কামনা বিলীন হয়ে গিয়েছিলো মায়ের জন্য তাঁর আকুল আকুতির মধ্যে। এই ছিলো তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

কী আকুলভাবেই না তিনি বলছেন বারংবার ক্ষুদ্র শিশুটির মতই—

'(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরে চাই।

স্বর্গ আমি চাই না মাগো
কোল যদি তোর পাই।
মা, কি হবে সে মুক্তি নিয়ে
কি হবে সে স্বর্গে গিয়ে
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
আর প্রয়োজন নাই॥'

'মাগো আমি তান্ত্রিক নই
তন্ত্র-মন্ত্র জানি না, মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা
ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা।
* * *
শিশু যেমন অনায়াসে
জননীরে ভালোবাসে,
তেমনি সহজ সাধন মোর
তাতেই পাবো তোর দেখা মা॥'

এই রকম সহজ সাধনারই তো বিশেষ প্রয়োজন আজ আমাদের। কারণ, আজও তো আমরা বিবিধ-বিচিত্র, বাহ্যিক আচার-বিচার, ক্রিয়া-কলাপ, তন্ত্র-মন্ত্রের কুটিল-করাল-কঠিন 'বেড়া-জালে' আবদ্ধ হয়ে বৃথাই পথ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি, বিভ্রান্ত হয়ে। পরমপ্রাপ্তি রয়েছে আমাদের অনধিগম্য। ফলে বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ আমাদের নিজেদের মনের অশান্তি অস্থিরতা; পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবেই বাইরের জগতের বিবোধ-বিদ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বসেবার মাধ্যমেই যে একমাত্র বিশ্বদেবতাকে লাভ করা যায়—বিশ্বমানব আবদ্ধ হতে পারে এক সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সহজ' সাধনাই যদি আজ আমরাও বরণ করতে পারি সর্বপ্রাণমন দিয়ে, তবেই তো হতে পারে আজ আমাদের পরমধন লাভ নতুবা নয়।

আজ দেশ ও জাতির এই চরম দুর্দিনে আমরা ভক্তিনম্র চিত্তে, আমাদের প্রিয় সাধক কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে করুণারূপিণী জননীর কাছে প্রার্থনা করবো :

'নামতে নারি তাদের কাছে
সবার নীচে যারা
যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।
অপমানের পাতালতলে
লুকিয়ে যারা আছে
তোর শ্রীচরণ বাজে সেথায়,
নে মা তাদের কাছে।'
'যেথা রুগ্ন ছেলে বক্ষে ধরে
নিশীথ জাগিস্ একলা ঘরে
যেথা দুঃখী পিতার সাথে
কাঁদিস উপবাসী রয়ে
(মোরে) যা মা সেথায় লয়ে।
শ্রমিক চাষার তরে যথা
আঁধা-খাদে-মাঠে
ক্ষুধার অন্ন নিস্ মা বয়ে
নে মা তাদেব হাটে—
(মোরে) নে মা তাদের হাটে॥'

নজরুল চরিত্রের দু'একটি দিক

আয়নুল হক খাঁ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমার সমসাময়িক এবং প্রায় সমবয়সী। কবি যখন কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিলো। নজরুলের নেতৃত্বে যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবি যুবক কলকাতায় ধর্মীয় গোঁড়ামীর এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমরাও কিছুটা যোগ ছিলো। মাসিক 'সওগাত' ছিলো এঁদের আন্দোলনের মুখপত্র। কবি তখন হরিঘোষ স্ট্রীটে থাকতেন এবং মাসিক সওগাতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রীটে সওগাত অফিসে কবি প্রায় আসতেন, সেখানে আড্ডাও বসতো, আমিও সে আড্ডায় প্রায়ই যোগ দিতাম। কবির সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর চরিত্রের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে, তাব দু-একটি এখানে নিবেদন করছি।

কবির ছিলো গতির প্রতি সীমাহীন আসক্তি। তিনি পারতপক্ষে ট্রামে যাতায়াত করতে চাইতেন না, বলতেন, 'ট্রাম টিকির টিকির করে থেমে থেমে চলে এটা আমার অসহ্য লাগে। ট্যাক্সি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে তখন আমার মনও যেন এক অজানা দেশে পাড়ি দেয়, আমি তখন সংসারের অভাব-অনটনের কথা একদম ভুলে যাই।'

সওগাতেব কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কবিকে বেশী টাকা দিতে পারতেন না, প্রত্যহ দশ টাকা, পনেরো টাকা—এইভাবেই দিতেন। ট্যাক্সিতে যাতায়াতেই কবির প্রায় তিন-চার টাকা খরচ হয়ে যেতো।

কবির বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রও প্রায়ই সওগাত অফিসে আড্ডা দিতে আসতেন। তাঁদের উভয়েরই ফুটবল খেলা দেখার নেশা ছিলো

অসাধারণ। ফুটবল খেলার মরসুমে তাঁরা দুই বন্ধু এবং কখনো কখনো আরও দু-একজন ট্যাক্সি করে ময়দানে খেলা দেখতে যেতেন। খেলার পর আবার ট্যাক্সি করেই কবি বাড়ী ফিরতেন। হয়তো সেদিন কবি সওগাত অফিস থেকে দশ টাকা পেয়েছেন তার অর্ধেকের বেশী যাতায়াত ও খেলা দেখতেই খরচ হয়ে গেলো। বাড়ীতে সেদিন হয়তো 'অদ্যভক্ষ ধনুর্গুণঃ', কবির সেদিকে খেয়াল নেই। সে সময় প্রধানতঃ সওগাতে লিখেই তাঁকে সংসার চালাতে হতো। আমরা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি ট্যাক্সিতে এ টাকাটা অপব্যয় করেন কেন? এ টাকাটা বাঁচলে আপনার সংসারের অভাব কিছুটা দূর হতে পারে।'

তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আপনাদের কাছে অপব্যয় মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা মনে হয় না। অনাহারে থেকেও ট্যাক্সিতে চড়ে প্রচুর আনন্দ পাই।'

গতির প্রতি কবির এই আসক্তির চরম পরিণতি লাভ করলো এর আরও কিছুদিন পর। আমরা শুনলাম, কবি নিজেই একটা মোটর গাড়ী কিনেছেন এবং একদিন তা দেখতেও পেলাম। আরও শুনলাম, কবি তাঁর ভালো ভালো কবিতাগুলির কপিরাইট ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিকের কাছে বিক্রি করে এই মোটরের টাকা সংগ্রহ করেছেন। এই কবিতাগুলি পরে 'সঞ্চিতা' নামে ঐ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ লাইব্রেরী হাজার হাজার খণ্ড সঞ্চিতা বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হয়েছে। লোকেরা খেয়ালী কবির এটাকে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম নিদর্শন বলে মনে করলেন। কিন্তু শিশুর মত সরল কবি তাঁর ঈপ্সিত আশা পূর্ণ হওয়াতে পরম আনন্দ-লাভ করলেন। কবি ভাড়া বাড়িতে থাকেন, ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না, তাঁর নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কোনো আয়ের পথ নেই, অথচ কবি চমকালো মোটর গাড়ী চড়ে পরম আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু এ আনন্দও কবি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেন নি। কিছুদিন পরেই আর সে গাড়ীতে চড়তে দেখিনি। বোধ হয় হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

কবি চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁর চক্ষুলজ্জা, অন্য কথায় তাঁর মনের উদারতা। কবির বাড়ীতে আত্মীয়-অনাত্মীয়, ভক্ত ও তিন-চারজন বেকার বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত থাকতো। তাদের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা কবিকেই করতে হতো। কবি কখনো তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বলতেন না। এছাড়াও কবির বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে গিয়ে আড্ডা জমাতেন। আহারের সময় হলেই কবি তাঁদের সবাইকে নিয়ে খেতে বসতেন। কোথা থেকে এদের খাবারের ব্যবস্থা হবে সে হিসাব কবির নেই। কবির শাশুড়ী ছিলেন একজন সুনিপুণা গৃহিণী, তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ঠিক করে ফেলতেন। কবির বেহিসাবী আচরণের জন্য তাঁর শাশুড়ী অনেক সময় বেশ বিব্রত হয়ে পড়তেন।

কবির দু'টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। কবির উল্লেখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কবিকে কম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। বৈষয়িক দিক থেকে এগুলিকে চারিত্রিক দুর্বলতা বলা হয়ে থাকে। দুর্বলতাই হোক বা চারিত্রিক উদারতাই হোক, কবি নজরুল আমাদের সকলেব প্রিয়। ইংরেজ কবি তাঁর দেশ সম্বন্ধে বলেছিলেন 'with all thy faults I love thee Still.'

আমরাও আমাদের কবি সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলতে পারি।

'কাজীদা'র গান শেখানো

বরদা গুপ্ত

কাজীদা তাঁর স্বরচিত গানে শুধু সুর যোজনা করেই থেমে থাকেন নি, নিজে সেই গান অক্লান্ত পরিশ্রমে শিখিয়েছেন সঙ্গীত-শিল্পীদের।

গান রচনা ও সুর যোজনা ছাড়া এই শেখানোর কাজে যে সময় তাঁর খরচ হয়েছে, সেই সময়গুলি অন্যত্র অন্যভাবে ব্যবহৃত হলে কাজীদা বাংলা দেশের কাব্য-সাহিত্য ভাণ্ডারে আরো অনেক মূল্যবান রত্ন জমিয়ে রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি।···

কাজীদার এই গান শেখানোর পদ্ধতি আর সঙ্গীত-শিক্ষা গুরু হিসাবে তাঁর ব্যবহারটি অনুকরণযোগ্য। অনুকরণ যোগ্য এই জন্যে বলছি যে, গান শেখাতে বসে কাজীদা যে অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত অধ্যবসায় আর বুক-ভরা ক্ষমা স্নেহ মায়া মমতায় নিজের দরাজ হৃদয়টি ভরিয়ে রাখতেন, তা যদি অন্য সকল শিক্ষকদের পক্ষে রাখা সম্ভব হতো, অনুকরণ করতে পারতেন কাজীদার এই প্রকৃতিটি, তাহলে তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারতো সহজে, অনেক নির্ভয়ে আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে পারতো।

কাজীদা যাকে গান শেখাতেন, তাকে বুক-ভরা ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতেন। কথায় গানে গল্পে হাসিতে শিক্ষার্থীর মনটিকে করে নিতেন খোলা মেলা নির্ভয়। শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে কাজীদার জুড়ি ছিলো না। 'ওর দ্বারায় এ কাজ হবে না, এ গান ও গাইতে পারবে না'—এ ধরনের কথাকে কোনোদিন কোনো সময়েই কাজীদা আমল দেননি। যা সম্ভব নয়, তা তিনি সম্ভব করেছেন। যে যা পারবে না, পারবার কথা নয়,—তাকে দিয়ে তাই করিয়ে মনে অটুট আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন।

কোনো শিক্ষার্থী হেয় হয়, মনে দুঃখ পায়, অপমান বোধ করে, এমন ব্যবহার কাজীদাকে কোনোদিনই করতে দেখিনি।

গান শেখানোর কাজে ছিলো তাঁর অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত অধ্যবসায়।

একদিন দেখলাম কাজীদা একটি দুরূহ সুরের গান একজন শিক্ষার্থীকে শেখাতে বসেছেন, কিন্তু শিক্ষার্থী সেই ধরনের গান শেখার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই কাজীদা তাকে বার বার একই লাইন গেয়ে শোনানো সত্ত্বেও, সঠিকভাবে সুর আনতে পারছে না। এমন কি, কাজীদার গাওয়া সুরের কাছাকাছিও যেতে পারছে না।

এতোবার এতোভাবে বোঝানো সত্ত্বেও শিক্ষার্থী অকৃতকার্য!

কাজীদা কি এবার বিরক্ত হলেন?

না।

শিক্ষার্থী নিজের অকৃতকার্যতায় যতো ভীত হয়, লজ্জিত হয়, অপমানিত বোধ করে, কাজীদা ততোই যেন নিজের প্রাণখোলা হাসি বিলিয়ে দিয়ে তাকে সাহসী করে তোলেন, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

'—আরে, কি হলো, দেখছো কি? গাও গাও, এ তো খুব সহজ গান! আচ্ছা, আবার একবার আমি গাইছি—শোনো।'

কাজীদা আবার গাইলেন। তারপর গান থামিয়ে শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন,—'কি, হচ্ছে না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও।'

শুরু হলো গান। কাজীদার গলার সঙ্গে গলা মেলালো শিক্ষার্থী।

এমন একদিন নয়। বহুদিন, বহু জায়গায়, বহু পরিবেশে আমি দেখেছি।

কাজীদার এই গুণটিও, তাঁর অন্য অনেক গুণের মতো অনুকরণ-যোগ্য নয় কি?

আমাদের মা
কল্যাণী কাজী

মাকে প্রথম দেখি আজ থেকে প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর আগে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের একটি বাড়ীর এক অপরিসর কক্ষে শুয়ে থাকতে। প্রথম দর্শনেই মধুর হাসি হেসে তিনি কন্যা স্নেহে আমায় আপন করে নিলেন। পরবর্তী জীবনে কখনও কোনো অবস্থার মধ্যেই— সুদিনে কি দুর্দিনে—তাঁর সেই মুখের হাসি ম্লান হতে দেখিনি। এই পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা কালক্রমে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হলো। আমি এ বাড়ীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করলাম। উত্থান-শক্তিহীনা এই মহিলার কর্মক্ষমতা দিনে দিনে আমায় বিস্মিত করেছে। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের সবটুকুই তিনি নিজের হাতে করতে ভালোবাসতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে সেটা কি করে সম্ভব? উত্তরে বলবো, প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ সে দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন না। তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেলেও উর্ধাঙ্গ সক্ষম ছিলো। স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট প্রশস্ত এক চৌকির একধারে তিনি শুয়ে থাকতেন। তাঁর নির্দেশে চৌকিটিকে দরজার সাথে সমান্তরাল করে এমনভাবে রাখা হয়েছিলো, যাতে কোনো কিছুই তাঁর নজর এড়িয়ে না যেতে পারে। আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনের জায়গা ছিলো মায়ের পাশের এই জায়গাটুকু। এই চৌকির উপর পাশ ফিরে শুয়ে তিনি মাছ তরকারী কুটতেন। কোনো কোনো সময় ষ্টোভে চা বা অন্যান্য রান্নাও তিনি করতেন। পরবর্তীকালে তাঁকে নাতি-নাতনীদের জন্য সোয়েটার বুনতে বা ছেলেদের জামায় বোতাম লাগাতেও দেখেছি। যতদিন বেঁচে ছিলেন বেশির ভাগ দিনই তিনি নিজের হাতে বাবাকে খাইয়ে দিতেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁর হাত-মুখ-ধুইয়ে সযত্নে তোয়ালে

দিয়ে মুছিয়ে দিতেন, তিনি খাবার পরিবেশন না করলে বা তাঁর সামনে বসে না খেলে আমাদেরও তৃপ্তি হতো না আর তিনি নিজেও তৃপ্ত হতেন না। লোক খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর সাথে একমাত্র অন্নপূর্ণারই তুলনা করা চলে। যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় যে লোকই এসেছেন—মা তাঁদের কখনও না খাইয়ে ছাড়েন নি।

টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ সবই তিনি রাখতেন। কোনো কোনো সময় আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি হতো। ফলে, আর্থিক সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। তবুও কখনও তাঁকে ভয় পেতে বা ভেঙে পড়তে দেখিনি। ধীর স্থিরভাবে তিনি এই সমস্যার সমাধান কি করে যে করতেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়।

মাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগতো সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি চুল বেঁধে মাথায় ও কপালে এয়োতীর চিহ্ন এঁকে সান্ধ্য শঙ্খধ্বনির সাথে সাথে শুভ্র শঙ্খবলা পরিহিত দুই হাত একত্রিত করে প্রণাম জানাতেন তাঁর ইষ্ট দেবতাকে সকলের মঙ্গল কামনা করে। মায়ের মুখে শুনেছিলাম যে, তাঁর মা ছিলেন একাহারী নিষ্ঠাবতী বিধবা। সবাইকে খাইয়ে তারপর পূজা সেরে শুদ্ধাচারে তিনি স্বপাক অন্ন-গ্রহণ করতেন। তিনি নিরুদ্দিষ্টা হওয়ার পর ঠাকুরকে তুলে রাখা হয়েছিলো। মৃত্যুর আগের বছর মা বললেন, 'দেখ্ শরীরটা প্রায়ই ভালো যাচ্ছে না, কবে আছি কবে নেই, তুই একটু পুজোর ব্যবস্থা কর।' তখুনি তাঁর কথা মতো সব ব্যবস্থা করা হলো। তিনি সারাদিন উপবাস করে রইলেন। পূজা শেষ হলে সকলকে প্রসাদ দিয়ে তিনি সামান্য প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন।

শিশুদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিলো অপরিসীম। নাতি-নাতনীরা ছিলো তাঁর নয়নের মণি—জীবনের জীবন। যখন আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান কাজী অনির্বাণ ও আমার ভাশুরের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া খিলখিলের জন্ম হয় তখন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

কি যে করবেন আনন্দের আতিশয্যে কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা চিন্তা করে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তো। তিনি বলতেন, 'দেখ্, এদের জন্যে আমার কতো কি করবার আছে—কিন্তু আমি তার কিছুই করতে পারি না—।' কিন্তু আমি জানি, তাঁর এ-কথা ঠিক নয়। তিনি শুয়ে শুয়ে আমার ছেলেকে দুধ খাওয়াতেন, স্নান করিয়ে দিতেন এমন কি তার বিছানা-পোশাকও বদলে দিতেন। তাঁর কাজ খুব পরিষ্কার ছিলো, বাচ্চাদের খাবার পাত্রগুলো তিনি বার বার সাবান দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে, গরম জলে ধুয়ে তবে তৃপ্ত হতেন। তরকারীতে খোসা বা মাছের গায়ে আঁশ লেগে থাকলে তিনি বার বার জল পরিবর্তন করে ধুতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর খুব রুচিজ্ঞান ছিলো। বাচ্চাদের পোশাক তৈরীর ব্যাপারে তিনি এমন নির্দেশ দিতেন যাতে বাচ্চাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয়ে দেখতে সুন্দর হয়। আমাদেরও বলতেন কোন্ অনুষ্ঠানে কি রকম পোশাক পরে যেতে হয়। পোশাকে বা অলঙ্কারের জাঁকজমক তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মধুর ব্যবহারের জন্য—আমরা যারা আত্মীয় তারাই কেবল নয়—বাইরের বহু লোকও তাঁকে মা বলে ডেকে তৃপ্ত হতেন। ছেলেরা প্রায়ই বাড়ী থাকতেন না। কবিকে দেখার জন্য বাঙালী অবাঙালী বহু লোক আসতেন। তাঁদের আপ্যায়নের সব ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হতো। ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ববোধে তিনি ছিলেন অনন্যা।

তিনি যে সঙ্গীত-রসিকা ছিলেন, এ-কথা অনেকেই জানেন—কিন্তু প্রচার-বিমুখ এই মহিলাটি যে সুগায়িকাও ছিলেন এ-কথা অনেকেই জানেন না। একবার বাড়ীতে Tape Recorder কেনা হলে আমরা জোর করে মাকে দিয়ে একটা গান গাইয়ে Tape করে-

ছিলাম। গানটি ছিলো কবিগুরুর—'হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো'। সেদিন গানের বাণী, সুর কণ্ঠে একাত্মীভূত হয়ে গিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারিনি। কবির জন্মদিনে কবিকে যেমন শিল্পীরা গান শোনাতে আসতেন, আবার অন্য ঘরে গিয়ে মাকেও গান শুনিয়ে যেতেন। জন্মদিন ছাড়া অন্য দিনেও বহু শিল্পী এসে মাকে গান শুনিয়ে তাঁর মন্তব্য চাইতেন। তাঁর শ্রবণ শক্তি ছিলো খুব তীক্ষ্ণ। বেতারে ছেলেদের কোনো অনুষ্ঠানের সামান্যতম ত্রুটিও তাঁর কান এড়িয়ে যেতো না। তিনি বর্তমান আধুনিক গানের বাণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে প্রায়ই আক্ষেপ করতেন। আবার অনেক গানে বাবার গানের কথার সাদৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

আমি গান শিখি, এটাই ছিলো তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তিনি অকালে আমাদের ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর ছত্রছায়া থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আমি তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। আজ প্রতি মুহূর্তে মনে হয় শুয়ে শুয়ে তিনি কি করে সংসারের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান অনায়াসে করতেন, যেখানে সচল থেকেও সামান্য ব্যাপারে আমরা মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলি।

বাবার সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ ছিলো অসাধারণ। গভীর রাত্রে সবাই যখন সুপ্তির কোলে নিমগ্ন, তখন তিনি একা খেলে চলেছেন হয় লুডো—নয় তাস—নয়তো চাইনীজ্ চেকার। উদ্দেশ্য, বাবাকে রাতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দেওয়া। কারণ, বাবা ঠিক এক-নাগাড়ে ঘুমোতেন না।—মাঝ-রাতে ঘুম থেকে উঠে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেন। তাই মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম ঠক্ ঠক্ করে ঘুঁটির আওয়াজ হচ্ছে—আর থেকে থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠছে—'এদিকে এসো—বাইরে যেয়ো না। শোনো, শুয়ে পড়ো।' মাকে কোথাও না নিয়ে গেলে বাবাও যেতেন না। আমার স্বামীর মুখে শুনেছি, যখন বাবাকে

বলেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো—তখন যতক্ষণ না মাকে সাথে নিয়ে যাওয়া হলো, ততক্ষণ তিনি এক পা-ও নড়েন নি। মা মারা যাবার পর যখন আমার ভাশুর বাবাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন তখন যাবার সময় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বাবা ও মা একঘরে থাকতেন। ভাশুর যখন বললেন, 'বাবা, চলো যাই।' তিনি কিছুতেই নড়ছিলেন না—। বোধহয় ভাবছিলেন—'আমার সঙ্গে চিরদিন যে থাকত,—সে কোথায় গেলো!' অবশেষে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি তু'পা এগোলেন বটে—কিন্তু বার বাব পিছন ফিরে শূন্য চৌকির উপরে কাকে যেন খুঁজছিলেন। সে দৃশ্য দেখে চোখের জল সেদিন রোধ করতে পারিনি।

কবির জন্মদিনে তাঁব কথা বেশী করে মনে পড়ছে। এখন জন্মদিনটা এক যান্ত্রিক নিয়মের পর্যায়ে চলে গেছে। সবাই আসেন —কবিকে প্রণাম করেন—চলে যান। কিন্তু বাড়ীর প্রাণ-প্রতিমা বিহনে সবই নিষ্প্রাণ মনে হয়। তিনি বেঁচে থাকতে কিন্তু এমনটি হতো না। কবির জন্মদিনের এক মাস আগে থাকতেই বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়ে যেতো—ভীড় লেগে যেতো বাড়ীতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের। কবির ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিসে তাঁর নির্দেশে লাগতো নতুনত্বের ছোয়া। বহুদিন পরে আত্মীয়ের বাড়ীতে আত্মীয় এলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি আনন্দের স্পর্শ লাগতো প্রতিটি মানুষের মনে। তাঁরা তখন নিছক কবিকে দেখতে আসতেন না।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, তিনি যেন অলক্ষ্যে থেকে আমাদের এই আশীর্বাদ করেন, আমরা যেন তাঁর মতো অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে সংসারের সব দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে যেতে পারি।

তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক!

টুকরো কথা

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩০ সাল। ১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গল বার। মেদিনীপুরের নজরগঞ্জের দিকের অসমাপ্ত ইদ্‌গাতে একজনকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিলো, লোকের ভিড় বেশ। একজন ফকির সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জনতা দাবী জানালো, গজল গাইতে হবে।

কি আর করেন, সম্বর্ধিত ব্যক্তিটি গজল গান ধরলেন :

'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'

জনতার কণ্ঠে গানের অকুণ্ঠ প্রশংসা। কিন্তু ফকির সাহেব প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'ইদগামে এ গান বিলকুল ঠিক নেহি, খুদা রসুল।'

সঙ্গে সঙ্গে গায়ক গেয়ে উঠলেন :

খুদা রসুল, খুদা রসুল।
এ নহে ঝুট্, এ নহে গুল্।
এই দিলের প্রসাদী ফুল।
করো না ভুল। করো না ভুল।

জানো কে এই গায়ক? ইনিই বুলবুল কবি নজরুল

'কাঠবিড়ালী। কাঠবিড়ালী! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবী নেবু? লাউ?
বেরাল বাচ্চা? কুকুরছানা? তাও?'

ছোট্ট শিশুদের মনের মতো এই সুন্দর কবিতাটি লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এরূপ আরো কতো কবিতা যে তিনি লিখেছেন, তার লেখা-জোখা নেই। তিনি কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গল্প লিখেছেন: শুধু ছোটোদের জন্যই যে তিনি লিখেছেন, তা নয়। বড়োদের জন্যও তিনি অনেক কিছু লিখেছেন আর সে লেখায় এমন জোর যে, কথায় কথায় আগুন ছোটে। মানুষের মনের কথা যেন তিনি টেনে বের করে কাগজের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্যই সকল মানুষ তাঁকে সমান ভালোবাসে।

তের শ' ছ' সালের এগারই জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইস্‌লাম পৃথিবীর মাটিতে প্রথম পা রাখেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহম্মদ। আর মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁরা বাস করতেন।

ফকির আহমদ সাহেব ছিলেন খুব মুসুল্লী মানুষ। হরদম তিনি নমাজ-রোজা আর তস্‌বীহ্-তেলাওয়াৎ নিয়ে মশ্‌গুল থাকতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছেই ছিলো 'পীর-পুকুর' নামে এক মস্ত দীঘি। তার পাড়ে হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক পীর সাহেবের মাজার শরীফ আর একটি মস্‌জিদ। এই মাজার আর মসজিদের খেদমত করেই ফকির আহমদ সাহেব সারাদিন কাটিয়ে দিতেন।

নজরুল ইসলাম ছোটোবেলায় ছিলেন খুব দুষ্টু। তাঁর দুষ্টুমীর জ্বালায় গাঁয়ের সবাই যেন ভয়ে কাঁপতো। কতো রকমের দুষ্টুমীই

যে তাঁর মাথায় খেলতো, তা আল্লাহ্‌ই জানেন। পাখীর ছানা পাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের 'পাকা ধানে মই' দেওয়া পর্যন্ত কোনো দুষ্টুমীতেই তিনি পিছ্‌পাও ছিলেন না। বাবার কড়া শাসনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁব দুষ্টুমীর গতি মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের তিনি ছিলেন সর্দার।

তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি কবে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কিছু কিছু ফাবসী আর কুরআন শরীফ পড়েছিলেন। দুষ্টু ছেলেদের একটা মজা এই যে, দুষ্টুমীতেও তারা যেমন ওস্তাদ আবার পড়াশুনায়ও তারা হয় সব চাইতে ভালো। নজরুল ইসলামের বেলায়ও এই কথাটি সত্য। দশ বৎসব বয়সে যখন তিনি মক্তবের পড়া শেষ কবলেন, তখন দেখা গেলো, তিনি যেটুকু শিখেছেন, তার মধ্যে কোনো গলদ নেই। কোনো ফাঁকি নেই। এই বয়সেই তিনি উর্দু আব ফাবসী এমন সুন্দরভাবে উচ্চাবণ কবতেন যে, তা শুনে সবার তাক্ লেগে যেতো। তাঁব খোশ্ এল্‌হানে কুবআন শবীফ তেলাওয়াৎ শুনে বড়ো বড়ো মৌলবী-মওলানা সাহেবান্ খুশিতে তাঁর পিঠ চাপ্‌ড়াতেন।

মক্তবেব পড়া শেষ করলেন তিনি দশ বৎসর বয়সে। এই সময়ে তাঁর পড়াও গেলো বন্ধ হয়ে। কাবণ, তাঁবা বাবা মাবা গেলেন। তাঁব দুঃখিনী মা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদেব নিয়ে অকূল সাগবে ভাসলেন। গবীবের সংসার—খেতেই কুলায় না, তাকে পড়াবে কে? এক বছর পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করলেন। এই সময় তিনি গ্রামে মোল্লাকীও করতেন। আর মস্‌জিদে ইমামতীও করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁব অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। অভিভাবকহীন নজরুল লাগাম-ছেড়া ঘোড়াব মতো যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে লাগলেন; কিন্তু এই অল্প বয়সে দিশেহারা হয়ে কোথায় যাবেন?

তাঁর এক চাচার নাম কাজী বজ্‌লে করীম। তিনি ফারসীতেও

ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর ছায়া নজরুলের জীবনেও পড়েছিলো। তিনি ছোটো বয়সেই নানা রকমের ফারসী বাঙ্‌লা মেশানো কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা বেশ ভালো হয়ে যেতো। পাশের গ্রামে 'লেটো' গানের একটা দল ছিলো। তারা যাত্রাগানের মতো এক রকম পালা-গান করতো। মাঝে মাঝে নজরুল তাদের জন্য পালা গান লিখে দিতেন। এতে তাঁর দু'পয়সা রোজগারও হতো। এই অল্প বয়সেই তিনি পালা-গান লিখে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর গানের আদরও খুব বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর মনে ছিলো আগুনের কুণ্ড। তিনি গ্রামের ঐ ছোট্ট জায়গায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন গ্রাম থেকে পালিয়ে তিনি আসানসোলে চলে গেলেন। পালিয়ে তো গেলেন, কিন্তু যান কোথায়? পেট বড়ো দারুণ জিনিস। একদিন তার আহার না যোগালেই চোখে আঁধার দেখতে হয়। তাই তিনি 'পাঁচ' টাকা মাইনেয় ময়দা-মাখার কাজ নিলেন ওখানেই একটি রুটির দোকানে।

মজলিশী লোক্—যেখানে যান, সেখানেই তাঁর মজলিশ জমে ওঠে। তিনি দিনের বেলা ময়দা মাখেন আর রাত্রে অবসর সময় সুর করে পুঁথি পড়েন, গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে তোলেন, বাজনা বাজিয়ে পাড়া তোলপাড় করেন। এই সকল কারণে অনেকেরই নজর তাঁর উপর পড়লো।

আসানসোলে কাজী রফিজউদ্দীন নামে একজন পুলিশ সব্ ইন্স-পেক্টর ছিলেন। তিনি নজরুলের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন: একে লেখাপড়া শেখাতে পারলে কালে হয়তো এ খুব বড়ো কাজ করতে পারবে। তিনি নজরুলকে নিজের দেশে নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ী ছিলো ময়মনসিংহ জেলায় কাজীরশিমলা গ্রামে। এর কাছেই দরিরামপুর হাই স্কুল। সেখানে তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলে নজরুল মাত্র এক বৎসর পড়লেন।

তারপর সেখানের হেডমাষ্টার বদলী হয়ে যাওয়ায় নজরুলের মন ওখানে টিক্‌লো না, তিনি রানীগঞ্জে গিয়ে সিয়ারসোল হাই স্কুলে ভর্তি হলেন।

হাই স্কুলে ভর্তি তো হলেন। কিন্তু তাঁর অশান্ত মন স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলো না। তিনি স্কুলের বই ছেড়ে বাইরের বই পড়েন, পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। এমনিভাবে হ-য-ব-র-ল আর গোলমালের মধ্যে তিনি ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠলেন।

তখন পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দলে দলে লোক পল্টনে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছে। নজরুলও 'বাঙালী পল্টন'এ নাম লিখিয়ে একদিন করাচী চলে গেলেন।

নজরুলের ভিতর আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি ছিলো অসীম। তাই ছেলেবেলায় যখন তিনি দুষ্টুমী করতেন, তখন ছিলেন দুষ্টু দলের সর্দার। মোল্লাকী করার সময় তিনি হয়েছিলেন মস্‌জিদের ইমাম। আর পল্টনে যোগ দিয়েও তিনি কি ক্ষুদে পল্টন হয়ে থাকতে পারেন? সেখানেও সকল পল্টনের উপরে হাবিলদার হয়ে সকলের মাথার মণি হয়ে রইলেন।

পল্টনের দলে একজন ফারসী জানা মৌলবী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে তিনি ভালো ভালো ফারসী কবিতার বই, বিশেষ করে হাফিজের বইগুলি পড়ে নিলেন। আর বাংলা ভাষায় দিতে লাগলেন তারই রূপ।

বাংলা ভাষায় এর আগে যে-সব গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা হতো, নজরুলের লেখা হতে লাগলো তার চেয়ে অন্য ধরনের। তাঁর ভাষা নতুন, বলার ভঙ্গী নতুন। বাংলা দেশের সবাই এই নতুন লেখার সাথে পরিচিতি হয়ে চম্‌কে উঠলো।

তারপর নজরুল লড়াই থেকে ফিরে এসে তাঁর লেখার মারফৎ সারা দেশে যে আগুন ছড়ালেন, তাতে যুবকের দল পাগল হয়ে উঠলো, বৃদ্ধেরা কুঁজো পিঠ সোজা করে জোরে জোরে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। সারা দেশ নবজীবনের পথে পা বাড়ালো।

জাতের নামে বজ্জাতি

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

কবি নজরুল হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই বহুবার বহুভাবে আঘাত পেয়েছেন। কেননা, কোনো সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁকে ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করেনি। নজরুল যে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মের মধ্যেই সত্যরূপ দেখেছিলেন হিন্দু আর মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রতিই যে ছিলো তাঁর সমান শ্রদ্ধা, এ কথা অনেকেরই জানতে আর বুঝতে অনেক দেরী হয়েছিলো।

আর এই দেরী হওয়ার জন্যেই কবিকে আঘাত হানতে, ব্যথা দিতে মানুষ দ্বিধা বোধ করেনি।

একবার কবি নজরুল আইনসভার প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যখন ভোট প্রার্থী হয়ে একজন মৌলভীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন সেই মৌলভী তমিজউদ্দীন কবির মুখের উপরেই বললেন, 'আপনি তো একজন কাফের। তাই আপনার মতো কাফেরকে আমরা কেউই ভোট দেবো না জানবেন।'

কবি হাসলেন। তারপর সেই হাসি মুখেই বললেন, 'আপনি আমাকে কাফের বলছেন, এজন্যে আমি মোটেই দুঃখিত হচ্ছি না, কেননা, এর থেকেও অনেক রূঢ় আর কঠিন কথা আমার শোনা অভ্যেস আছে।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে আপনি যদি আমার দু'একটা কবিতা শোনেন, ভারী খুশি হই।' এই বলে কবি তাঁর 'মহররম' কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

কবিতা শুনে মৌলভী আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা বুঝতে পারলেন কবি নজরুলের ইসলামধর্মের প্রতি অনুরাগ কতোখানি। তাই এই কবিতার আবৃত্তি শুনতে শুনতে তাঁদের সকলেরই চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রু ঝরতে লাগলো।

আর একবার কবির এক হিন্দু-বন্ধুর বিয়েতে তিনিও বরযাত্রীদের সঙ্গী হলেন। যাঁর বিয়ে, সেই বন্ধুটি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। কবি তো ববযাত্রীদের সঙ্গে বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। দেখলেন নানা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়নেব ব্যবস্থা হয়েছে খুব।

যথা সময়ে বরযাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে কবি নজরুলও খেতে বসলেন। কিন্তু ঐ আনন্দ মুখর বিয়ে বাড়ীটি যেন হঠাৎ স্তব্ধ মূক হয়ে উঠলো।

কিসের একটি চাপা অসন্তোষ জেগে উঠলো যেন সকলের মুখে চোখে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছেন, কিন্তু কেউই যেন ঘেঁষতে চাইছে না তাঁদের কাছে। এতে বরযাত্রীরা অপমানিত বোধ করলেন, হলেন লজ্জিত।

কি হলো, কি ব্যাপার, কিসেব জন্য এই হঠাৎ ছন্দপতন? —সকলের মুখে চোখেই এই প্রশ্ন।

তখন কন্যাপক্ষের একজন এগিয়ে এসে সবিনয়ে জানালেন, 'দেখুন, আপনাদের দলের মধ্যে নাকি একজন মুসলমান আছেন, তাই ব্রাহ্মণবাড়ীর মেয়েরা আপনাদেব খাবার পরিবেশন করতে চাইছেন না।'

তখন বরযাত্রীদেব মনে পড়লো নজরুলের কথা। নজরুল যে মুসলমান এ-কথা যেন ভুলেই যান তাঁরা। কিন্তু নজরুল তো তাঁদের প্রাণের বন্ধু বাংলার আদরের কবি। কবির আবার জাত কি?

কবি নজরুলের কানেও গেলো সে-কথা।

কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তখন এ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। চলেছে প্রচণ্ড বাদ প্রতিবাদ।

কবি নজরুলের মনে হলো এ যেন জাতের নামে বজ্জাতি। অন্যায়-অবিচারের এই আঘাত কবি সইতে পারলেন না। তাই সকলের অগোচরে তিনি লিখলেন একটি কবিতা। এ তো কবিতা নয়, যেন আগুনের ফুল্‌কি।

জাতের নামে বজ্জাতি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি লিখলেন তাঁর অগ্নিজ্বালা প্রতিবাদলিপি।

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া!
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতের জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান্!
এখন দেখিস ভারত জোড়া
পচে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া!

কবির বজ্রকণ্ঠে এই কবিতা শুনে বিয়ে বাড়ীর আবহাওয়া ধিক্কারে ভরে উঠেলো। ছোটো বড়ো সকলেই নিজেকে অপরাধী মনে করে কবির কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। জাতের দোহাই ভুলে ভক্তি আর শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন সকলে।

সত্যই বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ভয়ঙ্করের আবির্ভাব,—একটি ধূমকেতুর আত্মপ্রকাশ। তাই ধূমকেতুর উদয়ের মতোই এই ঘটনা একান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। লোকের বিশ্বাস, ধূমকেতু স্রষ্টার একটি অলক্ষুণে সৃষ্টি ; কেননা সে সাথে করে নিয়ে আসে দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাক ও মহামাবী। সে যে তাব সাথে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাও নিয়ে আসে, আব অনাগত সুন্দবের আগমনী গানও গেয়ে যায়, তাব কথা কেউ বড একটা ভাবতে চায় না। বাংলা-সাহিত্যে নজরুল শুধু ধূমকেতুব মতো আবির্ভূত হয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন না, 'ধূমকেতু' নামে কাগজ বের করে ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় প্রলয়-নাচন নেচে চললেন। মানুষ তাঁব এই অদ্ভুত ও আকস্মিক তাণ্ডব-নৃত্য দেখে অবাক হলো। কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ কবলেন।

লক্ষ্য কববাব বিষয় হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথ নজকুলকে আশীর্বাদ করলেন পবাধীন জাতিব মুক্তিব স্বপ্নদ্রষ্টা কবিরূপে নয়, বরং পবাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামেব অগ্রপথিকরূপে। ববীন্দ্রনাথেব মতো এমন একটা বিরাট প্রতিভা তাঁব গগনস্পর্শী প্রতিষ্ঠার পর্বত-শিখরে বসে একটি শিশু-প্রতিভার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।—এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনও ঘটেছে বলে আমাব জানা নেই।

মোদ্দা কথা, কবি রবীন্দ্রনাথের পাশে কবি নজরুল ইসলাম ভাস্বর হয়ে দেখা দিলেন। এতে এক অপূর্ব দৃশ্যের মহিমময় মূর্তি ফুটে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যাকাশে তাঁর কাব্য-কলার শুভ্র-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-জাল বিস্তাব করে যে সৌন্দর্যের মদির-মায়া ছড়িয়ে রেখেছিলেন, একই আকাশে তারই পাশে নজরুল তাঁর ধূমকেতুর জ্বালা ও ঝোলা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন—

'গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

* * *

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিক্-দিগন্ত জুড়ে,
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিণীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।

* * *

গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে।
যাহাদের কারাবাসে,
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে।
গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।'

বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবে জাতি আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেলো, 'তাজা-বতাজার' গান গেয়ে 'নব-নবীনের' চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলো। রবীন্দ্রনাথ জাতিব 'মূঢ়-ম্লান মুখে ভাষা', আর 'নির্জিত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তোলার' তাগিদ অনুভব করেছিলেন ; এবার তার ভার পড়লো বাংলার চারণ-কবি নজরুলের উপর।

'মরণ-বরণ-পণ' করে নির্যাতিত ও পরাধীন জাতির সৈন্যাপত্য গ্রহণ করলেন নজরুল। বিদেশী 'বিধির বিধান' ভাঙার অভিযান শুরু হলো। 'বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি' লাগলো। তাতে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিলো বেশী ; কেননা 'বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের'। হলোও তাই। নজরুল কারাবরণ করলেন, অনশন ব্রত গ্রহণ করতেও কসুর করলেন না। তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় দীপক-রাগিণী বেজে উঠলো, 'বিষের বাঁশী'তে সুর সংযোজিত হলো, সর্বোপরি দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিলো। এই সময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নামক নাটিকাটি 'শ্রীমান কাজী

নজরুল ইসলাম—স্নেহভাজনেষু' বলে নজরুলকে উৎসর্গ করলেন। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে বিশ্বকবি কর্তৃক জাতীয় জাগরণের উদ্‌গাতারূপে বাংলার কবি নজরুলের গৌরবময় স্বীকৃতি।

অতঃপর, কবি নজরুল নির্যাতিত, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির হয়ে কবিতা ও গানে, ধারণা ও ধ্যানে, কথা ও কাজে যে অনল-উদ্‌গীরণ শুরু করলেন, তার কাছে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্‌গার, আর ধূমকেতুর দিগন্ত-জোড়া ধূম্রজালও হার মানলো। এ সময়ের নজরুল ছিলেন মহাবিদ্রোহী নজরুল। তাঁর দুর্দান্ত বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছিলো একদিকে সেকেলে সংস্কার, প্রাচীন-চিন্তাধারা ও আগেকার সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আর অন্যদিকে বিদেশী শাসনের কঠোর বন্ধন-মুক্তির অনুকূলে। 'যারা তেত্রিশ-কোটি মানুষের মুখের গ্রাস্ কেড়ে' খাচ্ছিলো, কবির 'রক্ত-লেখায়' অচিরে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলো। তারা দিব্য-চক্ষে দেখতে পেলো :

'মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান ;
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।'

ধূমকেতু-ধর্মী মহাবিদ্রোহী নজরুল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমন সুন্দরও বটে। গড়ার জন্য ভাঙার, সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। নজরুলও ধ্বংসের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন সৃষ্টির জন্য। তাই তাঁর 'এক হাতে' ছিলো 'রণ-তূর্য' এবং 'আর হাতে' ছিলো 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী'। তিনি জাতিকে শুধু ভাঙার গান শোনালেন না, তার কাছে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন :

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর—প্রলয় নূতন-সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন—জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বেয়েও আসছে হেসে ,
মধুর হেসে ;
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর !!

তোরা জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

জাতি নজরুলের আগমনে জয়ধ্বনি করলো। চিরসুন্দর নবীন মোহনবেশে মধুর হেসে সৃষ্টির উল্লাস বুকে নিয়ে নেমে এলো। নতুন জীবন লাভ করলো জাতি, স্বাধীন হলো দেশ। আমাদের এ স্বাধীনতায় কবির দান কতখানি, তা এখন যাচাই করে দেখার সময় এসেছে।

কারাজীবনে কবি নজরুল

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামেব এক বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ঐ সময়ে রাজনৈতিক কয়েদীদের কোনো শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম ছিলো না। যাকে পাবতো তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করতো। পরে বিচার-প্রহসনের দ্বাবা দণ্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিতো। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতেও কোনো শ্রেণী-বিভাগ না করেই তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিলো। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজেব, আর ঐ কাপড়েরই গামছার মতো গা-মোছা চাদর, বিষম কুট্‌কুটে খোঁচা খোঁচা লোমেব কম্বল সহ এই অপরূপ পোশাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদিতে ছেড়ে দিলো।

কবি কলকাতাব জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিলো কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবিব আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জেলার অহিংস, বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্র সমাজের একটা বড়ো অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে 'হুগলী বিদ্যামন্দিরে' স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলো। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গম্‌গম্ করছিলো। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ চৈ করে কাটাতো। বাইরে থেকে

ছাত্রের দল হুগলী ব্রীজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখতো এবং নানারকমে উৎসাহিত করতো। বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক্ তাঁর দল নিয়ে হুগলী ব্রীজের উপর থেকে তাক বুঝে কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি-সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। কবি স্ববোধ রায়, সিরাজুল হক্, হামিদুল হক্, জনার্দন প্রভৃতি এই সব কাজের নতুম নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপারটা যাতে করতে না পারে তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ নানারূপ বাধার সৃষ্টি করতো। বন্দীরাও তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে জড়িয়ে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় হাব মানলো তখন সাদা পোশাকে পুলিশের আড়কাঠি নিযুক্ত করতে বাধ্য হলো, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বাধা দেবার শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তখন ব্রীজের উপরে বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করলো কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এততেও ঠেকানো গেলো না। সেজন্য ব্রীজের দক্ষিণদিকের অনেকটা জায়গা ঢেউ টিন দিয়ে খুব উঁচু করে বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলো। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করে, *কিন্তু বিদ্যামন্দিরের* নেতাদের *নিষেধে* তারা হাত গুটিয়ে নিলো।

যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সব চেয়ে ওঁচা। এর 'জেলর' যেমনি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত হতো। চোর-ডাকাত, পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও সে লোকটা সেই ব্যবহার করতো। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না, কলম পেন্সিলও অফিসে জমা নিয়ে নিতো তারা জোর করে। এই সব ব্যাপারে কবি নজরুলের মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই সময় হুগলী জেলের সুপারিন্টেডেন্ট এক ইংরেজ। নাম তার 'আর্সটন'।

রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই কারণে অকারণে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখতো। কবি নজরুল এই ইংরেজ জেল সুপারটির নাম রেখেছিলেন হর্সটোন (Horsetune) মানে পিচেশ-কণ্ঠী। কবি একে চটাবার জন্য 'সুপার বন্দনা' নামে একটা গান লেখেন। গানটি এই—

'তোমারি জেলে পালিছো ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে,
রেখেছো সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছো শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি,
ঠুল ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

কবি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছো স্নেহে' গানটির লালিকা অর্থাৎ প্যারডি। 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা' কথাটির একটা ব্যাপার আছে, তা এই যে, হুগলী জেলে কি সাধারণ কয়েদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড়ো করে একটা তরকারির বাগান করা হয়েছিলো, শুনেছি এখনও হয় (বোধহয় রাজনৈতিক কয়েদীদের আর খাটতে হয় না) কিন্তু তখনকার দিনে ভালো ভালো তরকারী, ভালো ভালো ফুলের

থোকাগুলো জেল কর্তৃপক্ষের ঘরে চলে যেতো; আর বুড়ো ডাঁটা, কপির শুক্‌নো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা-ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ, কুমড়ো আর তরকারীর খোসা প্রভৃতিতে কয়েদীদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা হতো। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের বরাদ্দের মধ্যে কাঁটা ও হাড় দেখা যেতো, বাকী বস্তুর গতি যে কী হতো তা কয়েদীরা সবাই বুঝতো। আর তরকারির খোসা, ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সান্‌কি থেকে সান্‌কিতে ঢেলে দিয়ে যেতো ফালতুরা, তার রং ছিলো কালো; আস্বাদের তো কোনো বালাই ছিলো না। জেল জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিলো পরম পদার্থ 'লপসী'। কবি নজরুল ঐ অ-পদার্থকেই 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপসী শোভন' বলেছেন।···সুপার আর্সটনের চেহারাটা ছিলো লিকলিকে, গায়ের রংটা ছিলো বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটা লাইনের ভিতর তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন 'শুল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ।' যাঁরা তাকে দেখেছেন তাঁরা এর রসটা বেশ ভালো করেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেবপুঙ্গব ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো কি করবে ঠিক করতে পারতো না।

'ভাঙার গানে' এই গানটি আছে। তার ফুটনোটে কবি এই কথা কয়টি লিখেছেন—

'হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিলো। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়োকর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিতো। কারণ বন্দীদের কাছে দৈনিক আনন্দবাজারের কী যে কদর ছিলো এখনকার লোকেদের তা বোঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন) বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিলো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ষ্টার্টার

স্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্ত পত্রিকাকে সরবরাহ করতো। সরবাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল ভোগও করেছে অনেকে। বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলোই নিত্যব্যবহার্য সাবান-সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেলো।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও বন্ধ করে দিলো আর্সটন। আগেই আহারের সম্বন্ধে বলেছি, এবার বিহারের কথা বলবো। পূর্বে নতুন নতুন এসে সকালে বিকালে জেলের উঠোনে, মাঠে বেড়াতে দিতো বন্দীদের। কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দিয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিলো তাদের এক একটা ধরে কোথাও দু'জনকে, কোথাও একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিলো। বিহার মানে বেড়ানো বা বাইরের হাওয়া লাগানোও বন্ধ হয়ে গেলো; বন্দীর সঙ্গে বন্দীরা কথাও বলতে পারতো না। কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না; তিনি গান ধরতেন—

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।'

গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠতো। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতো। কবি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাত-কড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে 'সেলে' বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিলো। কবি তখন 'শিকল পরার গান'খানি রচনা

করে হাত-কড়া সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন—

'এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল্,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল !
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল।'

বন্দী-জীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম পেন্সিল—তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত বাধা সত্ত্বেও রচনা করে সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য, উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে সংক্রামিত করে যেতে লাগলেন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে। এই সময় বিখ্যাত 'সেবক' কবিতাটি রচনা করেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিলো। তিনি লেখেন—

'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কি রে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়ায় ?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?'

এই প্রশ্ন বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন কবি। ক্রমে জেলের অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো। যতরকম ফন্দী ছিলো, সকলের উপর প্রয়োগ করতে লাগলো জেলর আর জেল-সুপার। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমনীয় সাধারণ কয়েদীরাও। এরই প্রতিবাদের জন্য মিলিতভাবে সবাই অনশন-ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সকলে

প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলেন। এই সময় বোধহয় কবি নজরুল 'মরণ-বরণ' গানখানি রচনা করেন।

'এসো এসো ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভয় করো গো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন ভরা চরণ॥'

এই সময় 'বন্দী-বন্দনা' নামে আর একটি গান লেখেন। ভোর-বেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের 'ফাইলে' দাঁড়াতে হতো। স্কুলে ড্রিলের সময় প্রথমে এসেই যেমন দাঁড়াতে হয় সেই রকম দাঁড়ানোকে ফাইল বলে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড্ জমাদার গুণতো। গোণা হয়ে গেলে জেলর তার বিরাট ভুঁড়ি দুলিয়ে মূর্তিমান নির্বোধের মতো সেখানে ঢুকতো। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠতো, 'সরকার সেলাম'। এই 'সরকার সেলাম'টা কবি ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিট হয়ে গেছে।···ভোরবেলার এই ব্যাপরটির সঙ্গে উপরিউক্ত 'বন্দী-বন্দনা' গানটির যোগাযোগ ছিলো। এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। গানটি এই—

'আজি রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।

ওরা দু'পায়ে দলে গেলো মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেলো শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝ পশে ছেয়ে
উতল কলরোলে !!
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দীকারা, সেথা
কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর দলে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে ॥'

এর পর শুরু হলো অনশন ধর্মঘট। এবং বন্দীরা জোর গলায় জানিয়ে দিলেন, 'সম্মানজনক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামবে না।' প্রথম প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপর চরমে পৌঁছালো। কর্তৃপক্ষ আর আঁচল দিয়ে আগুন চেপে রাখতে পারলো না। 'সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে। এই অনশন ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলাদেশ ও নিখিল ভারতের নরম-চরমপন্থী নেতারা, ছাত্র যুবকরা এমন কি সাধারণ লোকেরাও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত হয়েছিলেন। কবি নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা করবেনই, কিছুতেই রোখা যেতো না। এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত পা মাথা চেপে ধরে চামুণ্ডার দল জোর করে নল দিয়ে খাওয়ানোর জন্যই বেশীরভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, শুধু তাই নয় কারুর কারুর জীবন-সংশয়ও হয়েছিলো। সকল বন্দীর জন্য, বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠে। সভা সমিতি, প্রস্তাব পাশ—নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড়ো বড়ো

নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে পাঠান। কবি 'মরণ-বরণ' গান লিখে সকলকে মৃত্যু-ভয়শূন্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন—এই তাঁর জিদ। পরে স্বয়ং বিশ্বকবি তার-বার্তায় জানালেন:—"Give up hunger strike, our literature claims you.—Rabindranath."

এবার কবি একটু বিচলিত হলেন। কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার এ-কথা বিশ্বকবি স্বীকার করলেও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকরা স্বীকার না করে দেশসেবকদের কাছে হেয় হয়েই আছেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেন, এবং নজরুল-বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দেন। পুস্তকখানি নিয়ে পবিত্রবাবু হুগলীতে আসেন।

পবিত্রবাবুর হাত থেকে বসন্ত নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন, কবিগুরু বসন্ত নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম, কল্যাণীয়েষু' লিখে নীচে তাঁর নাম কালি দিয়ে সই করেছেন।

কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা ও বসন্ত নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন। জেলের সাথীরাও মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন—অবশ্য অনশন ধর্মঘট চালু রেখে। এমন সময় বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবী মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করলে। তখনও চির অবিশ্বাসী বৃটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনশন ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সঙ্গে বিরজাসুন্দরী দেবী, গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, কবি সুবোধ রায়, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেলের গেটে

এসে উপস্থিত হলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি নজরুল মা বলে ডাকতেন। 'সর্বহারা' নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন এঁকে। তাতে লিখেছিলেন—

'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার !
তুমি কোনোদিন কারো করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী ! যেন কোন্ পথ-ভূলে আসা
ভিন্-গাঁর ভীরু মেয়ে ! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায় ?'—'

বিশ্বকবির তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরীব বহু সাধ্যসাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবী মিটাবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুর রস পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।

অনশন ভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবীই মিটিয়ে দিলো, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিতো।

এরপর কবি নজরুল বহরমপুর জেলে বদলি হয়ে যান। কবি উক্ত জেলে যেতেই জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবসন্ত ভৌমিক একটি হারমোনিয়ম তাঁকে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়ম পেয়ে নজরুলের আনন্দ আর ধরে না। নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন-রাতই প্রায় গান গাইতেন, আর মনের সুখে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। হুগলী জেলেব সংগ্রামের পর নজরুল বহরমপুরে আনন্দেই ছিলেন।

১৯০৬ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরকে বাংলার বিপ্লবী যুগের প্রভাত কাল বলা যেতে পারে।...আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। ঐ পরিবেশের চাপে আমরা অনেকেই তখন ভয়ানক-রকম ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছি। বর্তমান 'আজাদ' সম্পাদক, বন্ধুবর আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আমি তখন আরো কতিপয় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিলেতী মানুষ, বিলেতী পোশাক ও ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে ছেলেমানুষী প্রতিবাদ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করে দিয়েছি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও পরাধীনতার লজ্জা আমাদের তরুণ-বুকে খুবই ব্যথা দিচ্ছিলো। এই মানসিক অশান্তির আগুনে আমরা তখন সান্ত্বনার পানি-ছিটা দিচ্ছিলাম জাতীয় প্রেরণা-দ্যোতক ছোটো ছোটো ঐতিহাসিক নাটক লিখে এবং নিজেরাই সেই সব নাটক অভিনয় করে।

আমাদের গ্রামে 'মিলন সমাজ' বলে একটা ক্লাব ছিলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এসে ঐ ক্লাবের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমরা অভিনয় করতাম। নিজেদের লেখা বইয়ের নাম-ভূমিকায় নিজেরাই অবতীর্ণ হতাম, এবং তৎকালীন জনপ্রিয় যাত্রার দলের প্রধান অভিনেতার অনুকরণে গলা কাঁপিয়ে অভিনয় করতাম। ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তেমনি এক অভিনয়ের আয়োজন করি। শামসুদ্দীনের লেখা নাটকের নাম-ভূমিকায় সে নিজে এবং আমার লেখা নাটকের নাম-ভূমিকায় আমি নিজে অভিনয় করি। অভিনয়ের শেষে পাশের গ্রাম দরিরামপুর হাই স্কুলের ছাত্রবন্ধুরা আমাদের মোবারকবাদ দিতে আসে। তাদের সাথে ছিলো নাদুসনুদুস ঝাঁকড়া চুলওয়ালা হরিণ-চোখা একজন সহপাঠী। তার মুখে ছিলো হাসি

ও চোখে ছিলো মেয়েলোকের লজ্জা। বন্ধুরা পরিচয় করিয়ে দিলো—নাম কাজী নজরুল ইসলাম, বাড়ী বর্ধমান। নোঙ্গরছাড়া জাহাজের মতো ঘুরে ঘুরে সে এই ঘাটে এসে লেগেছে। সে সুন্দর কবিতা লিখে স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় পড়ে শোনায়। মাষ্টাররা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের না-পড়া কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

বন্ধুরা আরো বললে, নজরুল পড়াশোনার ধার ধারে না, দিন-রাত দরাজ গলায় গান গেয়ে বেড়ায়, পাড়ার ছেলে-বুড়ো তার গান শোনার জন্য পাগল। বাড়ীর ছেলেপেলে নষ্ট হয়ে যায় বলে কোনো লোকই তাকে বেশীদিন জায়গীর রাখে না। ফলে মাসে মাসে একে জায়গীর বদলাতে হয়। বন্ধুরা কিন্তু এ-ও বললে, যদিও নজরুল ইসলামের সাথে বই-পুস্তকের সম্পর্ক খুব কম, ত্রৈমাসিক-ষান্মাষিক পরীক্ষার কিন্তু সে বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের এইসব তারিফের শিলাবৃষ্টির নীচে নিরীহ লাজুক নজরুল ইসলাম অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো, লজ্জা-জড়িত গলায় মাঝে মাঝে বলতে লাগলো, কিছু না, ওসব মিথ্যা কথা, বিশ্বাস করবেন না। আমরাও সহপাঠীদের নজরুল-স্তুতি অধিকাংশ অবিশ্বাস করে নজরুলের অনুরোধ রক্ষা করলাম। বন্ধুরা যতক্ষণ আমাদের নাটকের অভিনয়ের তারিফ করতে লাগলো, ততক্ষণ নজরুল একবার শামসুদ্দীনের দিকে আর একবার আমার দিকে চেয়ে দু'একবার মাত্র বললেন, 'বই দুটো কি আপনারা নিজেরা লিখেছেন ?'

অধিক রাত্রে ওঁরা বিদায় হলেন, আমরা ঘটনাটা স্বভাবতঃই ভুলে গেলাম।

১৯১৯ সালের এক ছুটিতে বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে একদিন শামসুদ্দীন ও আমি মাসিক কাগজপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ 'মুসলিম ভারতে' কি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ঠিক মনে নেই, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে একটি রস-রচনা পড়লাম। একসঙ্গে

দুজনে উঠে বসলাম বিস্ময়ে। প্রশ্ন করলাম, 'কার লেখা এটা?' তখন লেখার শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিলো। লেখার শেষে দেখলাম হাবিলদার—কাজী নজরুল ইসলাম, করাচী বন্দর। কোনো মুসলমান ভালো বাংলা লিখতে পারে এ-কথা তখন অবিশ্বাস্য ছিলো। 'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মোশাররফ হোসেন লিখেছেন, এটা সেকালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কাজেই আমরা একাধিকবার সেই লেখা পড়লাম। কে এই নজরুল ইসলাম হতে পারে? বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেরই নাম তখন আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। অবশেষে দুই বন্ধুতে একমত হলাম, যদি সত্যই এই লেখক মুসলমানই হয়ে থাকে, তবে সে একদিন বাংলা সাহিত্যের একটা দিকপাল হবেই। আমরা তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে, এ আমাদের পাশের গাঁয়ের লাজুক, হরিণ-চোখা সেই নজরুল ইসলাম।

১৯২২ সাল। জীবনে প্রথম কলকাতায় এলাম। বন্ধু শামসুদ্দীন আগে থেকেই কলকাতার বাসিন্দা। তারই মেহমান হলাম। ছাত্রজীবন থেকেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মেম্বার ছিলাম। লেখক হিসাবে এই সময়ে কিছুটা পরিচয়ও লাভ করেছি। কাজেই কলেজ ষ্ট্রীটে সমিতির অফিসে সাহিত্যিক বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করাবার আয়োজন হলো। পথে যেতে যেতে শামসুদ্দীন বললো, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসেছে হে। বিরাট প্রতিভাশালী লোক, বড়ো রসিক। তোমার সাথে বনবে ভালো। হাসির আওয়াজে সে আসমান ফাটায়। আরো শুনে খুশী হবে—এ সেই দরিরামপুর স্কুলের নজরুল ইসলাম।'

আমি তাঁকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। শামসুদ্দীন বললো, 'আজকের সভায় সে আসবে।'

সভায় গিয়ে অন্যান্য সবার সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয়

হলো। মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা কাটখোট্টা লোক। কবি বলে পছন্দ হলো না; কিন্তু দেখলাম ১৯১৩ সালের সেই ভাসাভাসা হরিণ-চোখ আগের মতোই আছে। তাতেই আকৃষ্ট হলাম। সভা শুরু হলো। বন্ধু শামসুদ্দীন আমার তারিফ করে বক্তৃতা করলেন, কিন্তু উপসংহারে চিমটি কাটলেন, বললেন, 'এই নতুন বন্ধুটি সম্পর্কে আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, তিনি যা গল্প বলবেন তার বারো আনা বাদ দিয়ে মাত্র চার আনা আপনারা বিশ্বাস করবেন।'

সভাশুদ্ধ সকলেই আমার দিকে চেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো। অন্যান্যের বক্তৃতার পর আমার জবাবের পালা। আমার মতো অযোগ্য লোকের অতশত তারিফ করায় সকলকে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়ে উপসংহারে আমি বললাম, 'বন্ধুবর শামসুদ্দীন আমার কথার বারো আনা বাদ দিয়ে মাত্র চার আনা বিশ্বাস করতে আপনাদের পরামর্শ দিয়েছেন; আমি সরলভাবে আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাতেও আমার দু'আনা নেট মুনাফা থাকবে।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেলো। এ ওর গায়ে ধাক্কা মেরে হাসতে লাগলো; কিন্তু সেই সমবেত হুল্লোড় ছাপিয়ে ছাদ-ফাটানো গলাটি শোনা গেলো, সেটা ছিলো নজরুল ইসলামের। তিনি আসন থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে এমন জড়িয়ে ধরলেন যে, আমি তাঁর গায়ের অসাধারণ শক্তিতে বিস্মিত হলাম। সেই থেকে নজরুলের সাথে প্রাণে প্রাণে এমন যোগাযোগ হয়ে গেলো আমার যা বাকী জীবনে অর্থাৎ বাকী সাহিত্যিক-জীবনে আর তা ছিন্ন হলো না।

স্বাধীনতালাভের জন্য দেশে তখন প্রবল আন্দোলন।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিয়েই শুনেছি, ইংরেজরা আমাদের রাজা, আর আমরা তাদের পরাধীন প্রজা। কৈশোরেব প্রান্তসীমায় এসে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিষিদ্ধ বইগুলি পড়ি। সরকার যে বইগুলি বাজেয়াপ্ত করেন, সে বইগুলিই তখন আমাদেব পড়ার প্রবল নেশা। মেটসইনি, গ্যারিবল্ডি, সিনফিন আন্দোলন অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন্ দেশ কিভাবে চেষ্টা করছে, তার ইতিহাস জানার যেমন আগ্রহ, অপর দিকে তেমনি 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (বিপ্লবী নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা), ক্ষুদিরাম প্রভৃতি বিপ্লবীদের জীবনী লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়ি। সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন এ-সব বই পড়ার জন্য হাতে তুলে দেয়। কার বই, কোথা থেকে আসে, সে-সব খবর রাখি না।

আমি তখন ছিলাম রানাঘাট পি. সি. এইচ স্কুলের ছাত্র।

এইভাবে, এই আবহাওয়ায়, সবে মাত্র যখন যৌবনে পদার্পণ করছি, সেই সময় একদিন পবিচিত হয়ে উঠলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মন্ত্র-শিষ্য কৃষ্ণনগরের স্বর্গত হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে। নদীয়া জেলায় তিনি তখন ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ছাত্র অবস্থায় একটু-আধটু লিখতে পারতাম বলে হেমন্তদা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

সাল তারিখ আজ আর মনে নেই, একদিন তাঁর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ কাজী নজরুলকে নিয়ে রানাঘাটে এলেন। কাজী নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর 'বিষের বাঁশী' আর 'ফণিমনসা' তখন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। 'বিষের

বাঁশী' তার আগেই আমি লুকিয়ে পড়ে নিয়েছি। শুধু পড়া নয়, এই বইয়ের কয়েকটি কবিতাও তখন আমার কণ্ঠস্থ হয়ে আছে।

রানাঘাটে, সেই কবিকে সামনে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম, আমাদের রানাঘাট বাজারের চাঁদনিতে কবি তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন, শোনাবেন গান গেয়ে। এ খবর শুনে কবি-কণ্ঠের গান ও কবিতা শুনতে যাবার প্রবল আগ্রহ হলো আমাদের। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ জানালো, পুলিশ গান গাইতে দেবে না। কবিকে গ্রেপ্তার করবে।

সংশয় সন্দেহ আর ভয় নিয়ে তবুও গেলাম।

লোকে লোকারণ্য।

কবি গান গেয়ে শোনালেন। আবৃত্তি করলেন 'বিদ্রোহী'।

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হলো। কিন্তু না, ইংরেজের লাল পাগড়ী কবি বা উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করলো না সেদিন।

হেমন্তদার সঙ্গে কবি আবার কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন।

এরপর আমি কলকাতায় এসেছি।

'লাঙল' কাগজে কবির 'সাম্যবাদী' আর অন্যান্য কবিতা বেরিয়েছে। গভীর আগ্রহ সহকারে সে-সব কবিতা পড়েছি। শুধু পড়া নয়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি।

লাঙলের সেই কবিতাগুলি একত্র করে 'সাম্যবাদী' বইটি প্রকাশিত হয়। আজও মনে আছে, লাল মলাটের ছোট্ট সেই বইটির কথা। এ বইটিও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের রচনার প্রতি বরাবরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ ছিলো।

একসময় কবি উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির পাশের গলি সীতানাথ রোডে থাকতেন। তাঁর বাড়ীর খুব কাছাকাছি

থাকতেন কবি-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার। আমি নিজে তখন একটু আধটু সাহিত্যচর্চা করি, তাই কবি সাহিত্যিকদের খবর রাখায় তখন আমার প্রবল আগ্রহ।

কবির বাড়ীর কাছাকাছি, বিবেকানন্দ রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে তখন প্রায়ই আমি যেতাম। দেখতাম, কবি তাঁর বাড়ী থেকে বেরুতেন চকোলেট রঙের মস্ত বড়ো এক টুরার গাড়ীতে চড়ে। হুড্ ঢাকা গাড়ী।

কবির সেই সৌম্য মূর্তি দেখে দেব দর্শনের আনন্দ পেতাম।

বিবেকানন্দ রোডের বন্ধুটির কাছে শুনতাম, কবি নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যান। 'কলগীতি' নামে তিনি একটি রেকর্ডের দোকানও করেছেন বিবেকানন্দ রোডে।

সে সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ছায়া'র পৃষ্ঠায় কবির ঐ দোকানের একটি ভারী মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো ঃ

কলগীতি

১৬ বিবেকানন্দ রোড

আমাদের দোকানের বিশেষত্ব কলগীতির যাঁরা নিয়মিত খরিদ্দার হবেন তাঁদের বাড়ীতে পাঁচটি কোম্পানীর প্রতি মাসের সমস্ত রেকর্ড শুনে পছন্দ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের অর্ডারি রেকর্ড ইত্যাদি আমাদের লোক গিয়ে বাড়ীতে দিয়ে আসবে।

কাজী নজরুল ইসলাম
স্বত্বাধিকারী।

তা এতো করেও কবি সে দোকান বেশিদিন টেঁকাতে পারেন নি। আসলে তিনি তো আর ব্যবসায়ী ছিলেন না।

আমি তখন মিনার্ভা থিয়েটারের পাশে ফকির চক্রবর্তী লেনে আমার মামার বাড়ীতে থাকতাম।

চিৎপুর রোডের বিষ্ণু ভবনে ছিলো তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর

রিহার্সাল-রুম। প্রায়ই দেখতাম সেই বাড়ীর নিচে চকোলেট রঙের বিরাট গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতাম, কবি এসেছেন গানের মহলায়।

এর কয়েক বছর পরে বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে আমি যোগদান করি। তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়।

সাত বছর 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় চারকী করার পর লীগ্ মন্ত্রিসভার আমলে, আমার পক্ষে আব ওখানে চাকরী করা সম্ভব হলো না। তাই ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলাম।

ঠিক এই সময় ফজলুল হক সাহেব দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। 'নবযুগে' আমিও যোগ দিই।

হক সাহেব কবি নজরুলকে এই পত্রিকার সম্পাদক করে নিয়ে আসেন। এতোদিন পরে, দূরের মানুষটিকে কাছে পেয়ে আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হলো, তাঁকে 'কাজীদা' বলে সম্বোধন করার অধিকার লাভ করলাম। আমার দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

নবযুগে অল্পদিনই আমি কাজ করেছি। সেই অল্পদিনের পরিচয়ে আমি বুঝেছিলাম কবি নজরুল শুধু দুর্বারই নন, ভেঙেচুরে শুধু চুরমারই করেন না, সেই সঙ্গে স্নেহের পরশে ভাঙাকে আবার জোড়া লাগাতেও পারেন। সে সময় তাঁকে কবিতায় সম্পাদকীয় লিখতে দেখেছি! বড়ো বড়ো খবরের হেডিংগুলি পর্যন্ত অনেক সময় তিনি দিতেন কবিতার লাইন দিয়ে!

সবিস্ময়ে তখন ভেবেছি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কবি শুধু ব্যতিক্রম বা অনিয়মই নন, তিনি একক এবং অদ্বিতীয়।

কবি আজ স্তব্ধ। মুখর কবি আজ মূক। তাঁর সঙ্গীতের সুর-নির্ঝর আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হলেও, কবি-কণ্ঠে আর

ধ্বনিত হয় না — তবুও, ধ্যানমগ্ন কবিকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন আজও বলছেন

'আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
. আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না !
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল

(যেন) বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম যমুনায় করে ঝলমল ॥

কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে

পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহজাহানে

শ্বেত-মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর

উঠিছে অবিরল ॥

কেমনে জানিল শাহজাহান? প্রেম পৃথিবীতে মরে যায়!

(তাই) পাষাণ-প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়!

(যেন) তাজের পাষাণ-অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতার পানে

অতৃপ্ত প্রেম, বিরহী-আত্মা যেন অভিযোগ হানে

(বুঝি) সেই লাজে বালুচরে মুখ লুকাইতে চায়

শীর্ণ যমুনা-জল ॥

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী ফার্সীর চর্চা হয়েছিলো বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বাংলার মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমানকরা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর দরবেশের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড়ো কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন নি।

ততুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে…খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তা মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে।…

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ-সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না।…তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরেব সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি জনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং 'আমপারা'র সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী।...

কাজী রোমান্টিক কবি। বাংলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে বহুলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ইরানের গুল-বুল্‌বুল্‌, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে ক্রমশই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, গাইড-বুক টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন।...

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সাহেবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ আয়দ রকিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর্‌।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান শওদ্‌ রুজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর্‌॥

কাজী সাহেবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়'এর অনুকরণে 'শাতিল আরব, শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিলো (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাংলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই, কবিকে যারা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে সুন্দরী-ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম-সহচরী ব'লে—ইরানের বিদ্রোহী-আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

কবির মর্যাদা

পারমিতা সেন

কবি নজরুল ঢাকা শহরে রয়েছেন। খবর পেলেন ঢাকার নবাব পরিবারের বিশিষ্ট সম্মানী লোকেরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান। বাংলাদেশের বিপ্লবী কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে তাঁরা বিশেষ অনুরোধ করে নজরুলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

নজরুলও যেতে সম্মত হলেন।

কবি আসছেন শুনে নবাবজাদারা এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তাঁকে স্বাগত জানাবাব আয়োজন করলেন।

শান্ত সুন্দর বুড়ীগঙ্গার জলের বুকে ভাসলো বিবাটাকাব বজরা। বাংলার বিদ্রোহী দুলালকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বজরার চাকচিক্য গেছে বহুগুণ বেড়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে বাজকীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে এলেন একে একে খান্‌বাহাদুরের দল। কবি নজরুলের আগমন প্রত্যাশায় নওয়াব-জাদারা রইলেন পথের দিকে চেয়ে।

কিন্তু কই, কোথায় কবি নজরুল?

কবির আসার সময় যে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে!

এতো আয়োজন করে খান্‌বাহাদুররা ঠিক সময়ে এসে কবির জন্যে অপেক্ষা করছেন, আর কবিব সেদিকে খেয়াল নেই?

রাগে লজ্জায় নওয়াবজাদাদের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো। অপমানিত বোধ করলেন তাঁরা। বলে কয়ে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তাঁদের এমন ভোজসভায় কেউ আসবে না, এ যেন তাঁরা ভা্বতেও পারেন না। তাঁদের জীবনে এমন ঘটনা কোনদিনই ঘটেনি।

কবি নজরুলের এই ব্যবহারে নওবাবজাদাদের মনে হলো, এ যেন শুধ তাঁদের নয়, তাঁদের বংশ-মর্যাদারও অবমাননা।

সময় পেরিয়ে যায় দেখে নবাব পরিবারের কর্মচারীরা পথে বেরোয় কবির খোঁজে।

এদিক, ওদিক, সেদিক—যেখানে যেখানে কবি নজরুলের থাকার কথা সবই খুঁজে দেখা হলো একে একে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুদের এক আড্ডায় পাওয়া গেল তাঁকে।

যারা খুঁজতে গিয়েছিলো, তারা দেখলো, কবি বন্ধুদের সঙ্গে ঢালাও আড্ডায় গা ভাসিয়ে দিয়ে দিব্যি হাসিখুশি আনন্দে মশগুল হয়ে রয়েছেন।

দেখে মনে হলো নওয়াবজাদাদের আয়োজন করা ভোজসভার কথা নজরুলের মনেও নেই।

কবিকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। অতোগুলি মানুষ গঙ্গার বুকে বজরায় বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন শুনে লজ্জিতও হলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি আড্ডা ছেড়ে উঠে পড়তে গেলেন।

আড্ডার এক বন্ধু সব শুনে অবাক হয়ে কবিকে বললেন, 'এ কী করেছো হে কাজী, যাঁদের দেখা পাওয়ার কথা সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারে না, সেই সব বহু সম্মানীয় ব্যক্তিরা তোমার জন্যে বজরায় বসে অপেক্ষা করছেন, আর তুমি কিনা এখানে আড্ডা দিচ্ছো?'

'বহু সম্মানীয় ব্যক্তি' কথাটা শুনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। খান্‌বাহাদুর আর নওয়াববাহাদুরদের চাইতে কি কবির সম্মান কোনো অংশে কম?

খান্‌বাহাদুর নওয়াববাহাদুরকে মাত্র কয়েকজন মানুষ সম্মান করবে কিন্তু কবি হচ্ছেন সারা দেশের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র।

নজরুলের আত্ম-মর্যাদাবোধ ছিলো অসীম। তাই তিনি বন্ধুর কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তারপর বললেন, 'দেখো, আমি দেশের কবি। নওয়াববাহাদুরেরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না তো কি করবেন? আমি তাঁদের কৃপা-প্রার্থী নই। আমি কবি। আমি নজরুল। সম্মান আমার নয়, আমার কবি-মনের। রাজপথ দিয়ে আমি চলবো, আর দেশের খান্‌বাহাদুর, রাজাবাহাদুরেরা পথের দু'ধার থেকে আমায় জানাবেন কুর্নিশ। আর আমি সেই কুর্নিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে যাবো। এই তো কবি আর নবাব বাহাদুরদের মাঝখানের সত্যিকারের সম্বন্ধ।'

কবি নজরুলের এই সমস্ত উক্তি শুনে সকলেই অবাক।

যে বন্ধুটি একটু আগে খান্‌বাহাদুরদের হয়ে নজরুলকে বলছিলেন, তিনি কবির এই আত্ম-মহিমাবোধের পরিচয় পেয়ে নিজেই লজ্জিত হলেন। আর আশেপাশে অন্য যে সমস্ত বন্ধুরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই বুঝলেন যে, নজরুল যতোই সহজ সরল উদার-প্রাণ মানুষ হোন্ না কেন, আত্ম-মর্যাদাবোধ তাঁর অত্যন্ত কঠিন। তাই তো তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'আমি আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিশ'।

১৯৩৮ সালের এক সঙ্গীতমুখর সান্ধ্য বৈঠকের কথা। 'অগ্নিবীণা'র কবি নজরুল তখন হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের অধিবাসী। আমি তাঁর প্রতিবেশী। কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর এক মাসিক সাহিত্য-পত্রের কার্যালয়ে নজরুল একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন— গজল, ভাটিয়ালি, স্বদেশী ও শ্যামাসঙ্গীত। আমরা সব নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোতা, সেই প্রাণমাতানো মুক্তকণ্ঠ আজ স্তব্ধ।

তারও পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র, উদ্বেলিত তরুণ সমাজ, কবি নজরুলের 'ধূমকেতু'র আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা চমকিত। এক পয়সার সেই সাপ্তাহিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক আশীর্বাণীতে আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্রোহী কবিকে। তাতে কবিগুরু লিখেছেন—

'অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।'

দেশের সেই মূক অর্ধ-চেতন মানুষদের জাগিয়ে দেবার জন্য কবি নজরুল কতো কি না করেছেন! নিজের সমস্ত চেতনাকে বিলিয়ে দিয়েই কি তিনি আজ লুপ্তচেতনা? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতার জন্য নজরুল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যা বিশ্বাস করতেন স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশ করতে কখনও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করতেন না। বিদ্রোহী কবি তাঁর সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কথাই প্রকাশ করেছেন 'ধূমকেতু'র একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'বিদ্রোহের

মতো বিদ্রোহ যদি করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত শিব জাগবে—কল্যাণ আসবেই'।

এমনি ভাষায় যাঁর লেখনী কথা বলে ইংরেজ শাসনে তাঁর পক্ষে কতোদিন আর বাইরে থাকা সম্ভব? 'ধূমকেতু'র প্রথম শারদীয় সংখ্যার একটি কবিতার সত্য ভাষণে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ যেন নড়ে উঠলো। দশভুজা দুর্গার বন্দনায় কবি প্রশ্ন তুললেন—

'আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলায় মূর্তি আড়াল?
স্বর্গকে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশী?'

এই বিদ্রোহের আহ্বানে প্রমাদ গুণলো ইংরেজ-সরকার। 'ধূমকেতু'র সমস্ত শারদীয় সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হলো। কবি নজরুল গ্রেপ্তার হলেন।

পরের বছর ৮ই জানুয়ারী ব্যাংকশাল কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সর্বদেশের সর্বকালের রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে তেমন নজীর খুব বেশী নেই। জবানবন্দীর এক স্থানে তিনি বলেছিলেন, '—আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পিছনে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক, সত্য-বিচারক হতে পারেন না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পিছনে

এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি, তাঁর আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক, দৃষ্টি অবাক হয়ে গেছলো।'

সেই জবানবন্দীরই আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমার বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হয় না। কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুঁ দিতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়; সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে।···দোষ আমারও নয়—দোষ তাঁর, যিনি আমার কর্ণে বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।'

সেই 'মহাবিদ্রোহী'ই আজ এমন 'রণক্লান্ত' যে, তাঁর মুখে আর কোনো ভাষা নেই! অথচ তিনিই বলেছিলেন—

'আমি সেই দিন হবো শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে, রণিবে না—'।

আজও তো অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটেনি, আজও নজরুলের সাধের বাংলার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে—তার বিরুদ্ধে কবি তো আর গর্জে ওঠেন না, বাংলার এ দুর্দিনেও কী করে তিনি এমন শান্ত সমাহিত? এক এক সময় মনে হয়, এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। কবি হয়তো তাঁর ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাই করেছিলেন, বিদীর্ণ বাংলা, বিভক্ত বাঙালীর বেদনাবোধকে যেন কখনো তাঁকে অনুভব করতে না হয়। তাঁর সেই প্রার্থনা আমরা শুনতে পাইনি, বুঝতে পারিনি—তাঁর স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের বাংলাকে আমরা খণ্ডিত করেছি, তাঁর সাধনার সমাধি ঘটিয়েছি। তাইতো কবি আজ বিস্ময়-স্তব্ধ।

দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিদ্রোহী কবি নজরুল শুধুমাত্র দেহ ধারণ করেই আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান।

নীরব বিদ্রোহীর দিকে তাকিয়ে

রাণা বসু

কেন জানি না, বর্তমান হানাহানি কানাকানি ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের দিনে কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথাই আমার সর্বপ্রথম মনে আসে। মনে আসে এই জন্য, নজরুল লিখেছেন: হিন্দু মুসলিম তারা কেউ পৃথক নয়—তারা এক। একই আল্লা অথবা ঈশ্বরের তারা সন্তান। উত্তেজনার বশে হয়তো একে অপরের ধর্মস্থান, সংস্কৃতি ইত্যাদি নষ্ট করে, কিন্তু ভুল অচিরেই ভাঙে। স্মরণে আসে:

যে-লাঠিতে আজ টুটে গুম্বজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কাল প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না, ভায়ে ভায়ে রণ
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া।

কাজী নজরুল ইসলাম বর্তমানে অসুস্থ, তাঁর লেখনী নীরব। একদিন যে লেখনী বাংলাভাষী ছোটো-বড়ো সব রকমের নর-নারীকে সজীব করেছিলো, প্রাণে উদ্দীপনা জাগিয়েছিলো সে-লেখনী নীরব। আমার মনে পড়ছে, কবির যেদিন পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো সেদিনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তবুও রোগশয্যায় শায়িত কবি বাংলার কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশে যে বাণী দিয়েছিলেন: 'আমি যেমন ভালো ছিলাম/তেমনি ভালো আছি,/হৃদপদ্মে মধু পেলো/মনের মৌমাছি।—এই বাণী আজ স্মরণ করি। কবি ভালোই থাকুন, আরোগ্যলাভ করে আবার তিনি তাঁর অগ্নিময় লেখনী ধারণ করুন।

নজরুল ইসলাম জাতিভেদ, ধর্মভেদ ইত্যাদি কু-ভেদাভেদগুলোকে কোনোদিন মানতেন না। চিরদিন তিনি ধর্মভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। লিখেছেন :

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাহি দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জাতি।

নজরুল ইসলাম একজন সু-কবিই নন, তাঁর আরেক পরিচয়—তিনি সঙ্গীত রচয়িতা। শুধু রচয়িতা বলি কেন, তিনি একজন সুর সাধক এবং সুকণ্ঠ গায়কও বটে। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে-কণ্ঠ নিঃশব্দ নতুন সুর আমরা আর শুনতে পাই না। নজরুল ইসলামের লেখা গজল, শ্যামাসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গানগুলো চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। যুগে যুগে গায়ক-গায়িকারা সে গানগুলো গেয়ে জনচিত্তে মুখর অমৃত প্রবাহ বইয়ে দেবেন।

নজরুলের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে বলি : নজরুল তাঁর বিভিন্ন কবিতার ছত্রে বহু আরবী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলোকে কাব্যশরীরের মধ্যে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, পাঠক পাঠিকা কবিতাগুলো পড়ার পরেও বুঝতে পারেন না যে, কতকগুলো বিদেশী শব্দ পাঠ করলেন। কবি নজরুলের কৃতিত্ব এখানেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি তাঁর অনেক কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃতি দিতে পারি, কিন্তু তা না করে 'শাতিল আরব', 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতার নামের উল্লেখ করেই অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই।

নজরুল ইসলামের কবিতায় লক্ষ্য করার মতন আর একটা বিষয় হলো : নিত্যকালের আহ্বান। কবির কাব্যে এ ধরনের অনেক কবিতাব মধ্যে 'সর্বহারা'র কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, 'জিঞ্জীর'এর অগ্রপথিক, 'ফণিমনসা'র সব্যসাচী বিশেষ উল্লেখ্য।

নজরুলের আরেক পরিচয় তিনি সাংবাদিক। কী ছিলো তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী। সত্যি কথা লিখতে তিনি কখনো পিছ-পা হন নি। এজন্য তাঁকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। কারাগারে গিয়েছেন, মুক্তি পেয়েই আবার ধরেছেন আগুন জ্বালানো লেখনী।

নজরুল ইসলামকে তাঁর দেশবাসী বিপ্লবী বলে জানেন। সত্যিই নজরুল বিপ্লবী। তিনি কর্মে বিপ্লবী, স্বমত প্রকাশে বিপ্লবী। তৎকালীন পরাধীন বঙ্গবাসীব চিত্তে তাঁর লেখনী স্বাধীন হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর সে মনমাতানো বাণী আজকের দেশবাসীর কাছে অজানা নয়।

কবি নজরুল ইসলামের জয়গান গাই। বলি : নজকুল তুমি যে-পথ আমাদের দেখিয়েছো, যে-মন্ত্র আমাদের শুনিয়েছো তার বিনিময়ে তোমাকে উপহার দিতে পারি এমন কোনো বস্তু আমাদের ভাণ্ডারে আছে বলে আমি জানি না। শুধু কবির সুবেব সঙ্গে সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করতে পারি :

আধমরাদের সচল করেছে তোমার সকল মন্ত্র
প্রাণহারাদের প্রাণ এনেছে তোমাব সে কোন্ যন্ত্র
বাংলারে যাঁরা ভাবে প্রাণহীন ভেঙেছে তাদের ভুল
চির দুর্জয় বাংলার কবি নজরুল নজরুল॥

নজরুলের খেয়ালখুশি

রমেন দাস

তখন নজরুল কাজ করতেন 'সওগাত' পত্রিকায়। এখান থেকে মাসিক আয় ছিলো কম পক্ষে ছুশো টাকা। তা ছাড়া বিভিন্ন রচনা আর বই লিখেও বেশ কিছু পেতেন। সুতরাং আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিলো বললেই চলে। ছুর্দিনে তিনি যেমন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতেন, সুদিনের স্পর্শ পেয়েও কিন্তু তিনি তাঁদের ভোলেন নি। ববং আরও ঘনিষ্ঠতর করে নিয়েছিলেন!

শুধু মাত্র বিদ্রোহী কবি, একনিষ্ঠ সাংবাদিক বা নির্ভীক দেশ-প্রেমিক হিসাবে নয়, একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশেষ পরিচিত। খেলাধুলোর নামে ছিলেন পাগল। প্রতিদিনই অফিসের কাজ শেষ করে কবি বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন খেলার মাঠে। সঙ্গে থাকতেন তাঁব সাহিত্যিক বন্ধুরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাস, অরিন্দম বসু প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সেদিন ছিলো একমাত্র বাঙালী দল মোহনবাগান ক্লাবেব সঙ্গে আর. ডি. সি. এল. আই. দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি মাত্র দল মোহনবাগান। তাও আবার খেলবে বিদেশী খেলোয়াড়-দলের বিরুদ্ধে। তাই বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিলো ঐ খেলা নিয়ে।

সবাই জানতো, ঐ আকর্ষণীয় খেলার টিকিট সংগ্রহ করা ভার হবে। তাই অনেক চেষ্টা করেও নজরুলের বন্ধু-বান্ধবেরা কোনো টিকিট সংগ্রহ করতে পারলেন না। ব্যথ মনোরথে তাঁরা এলেন কাজীর অফিসে। আগে থেকেই নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। তাই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বন্ধুদের জন্য টিকিট।...

গেলেন তাঁরা খেলার মাঠে। শুরু হলো খেলা। কাজীর পাশে সবাই দাঁড়ালেন হুঁশিয়ার হয়ে। কারণ, খেলা দেখতে গিয়ে বাহ্যিক জ্ঞান থাকতো না তাঁর। তিনি খেলার ভাবরাজ্যে ডুবে থাকতেন। জ্ঞানশূন্য কাজী নিজের অজান্তে পাশের লোককেই বল ভেবে হয়তো পদাঘাত করে বসতেন; উল্লাস প্রকাশ করতে যেতে হয়তো বা 'গোল-গোল' বলে লাফিয়ে উঠতেন! তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে মাঠের অন্যান্য দর্শকরাও হতো বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

চললো খেলা। মোহনবাগান দল ৭-১ গোলে পরাজিত করলো বিদেশী দলকে (সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃঃ)। এবার কে আর দেখে নজরুলের আনন্দ! প্রকাশ্য মাঠে তিনি শুরু করলেন উল্লাস নৃত্য। তারপর বন্ধুদের নিয়ে ঢুকলেন খাবারের দোকানে। কিন্তু কে আর কতো খাবে? তাঁর পকেট যে ছিলো গরম! কারণ, ঐদিনই পেয়েছিলেন তিনি 'সওগাত' অফিস থেকে বেতন। টাকা-গুলোর তো সদ্ব্যবহার করা চাই! তাই তিনি প্রস্তাব করলেন সবাইকে নিয়ে চন্দননগর যাওয়ার। কে আর তাতে গররাজী হয়? সবাই একমত। কারোর বাড়ীতে কোনো খবর না দিয়ে ওখান থেকেই সবাই চললেন চন্দননগর। কিন্তু ওখানে যেয়েও যেন তাঁদের সাধ মিটলো না।

নজরুল সবাইকে বললেন, 'চলো ঢাকা থেকে ঘুরে আসা যাক।' অদ্ভুত খেয়াল! কোথায় চন্দননগর আর কোথায় বা ঢাকা! কিন্তু বাসনা যেখানে অতৃপ্ত, সাধ যেখানে দুরন্ত, সেখানে কি আর ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা থাকে? এক জামা-কাপড়ে বাঁধনহারা নজরুলের নেতৃত্বে সবাই বেরিয়ে পড়লেন ঢাকার পথে। সেই রাত্রেই চন্দননগর থেকে হাজির হলেন তাঁরা শিয়ালদা ষ্টেশনে। টিকিট করতে গিয়ে খেয়াল হলো, হিসাব করে দেখলেন, নজরুলের পকেটে যা টাকা আছে, তাতে তো অতোগুলো প্রাণীর ঢাকা ঘুরে আসা সম্ভব নয়। আর সবার পকেটই যে শূন্য! পড়লেন এবার

ভাবনায়। টাকার অভাবে কি এতোবড়ো একটা আনন্দ-সূচী বাতিল করা যায়? তাই রসিক নজরুল আঁটলেন নতুন ফন্দী। বললেন, 'ঘাবড়াও মত্'! এগিয়ে গেলেন তিনি ষ্টেশনের প্রবেশ-দ্বারে। টিকিট-পরীক্ষক তো তাঁকে দেখে অবাক। শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানালেন কবিকে।

গৈরিকবসন পরিহিত, সুদীর্ঘ কেশধারী, বলিষ্ঠ পুরুষ নজরুল তখনকার দিনে প্রায় সকলেরই ছিলেন পরিচিত! নজরুল প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে। আমরা যাবো ঢাকা। কিন্তু টাকা যা আছে, তাতে হয়তো এতোগুলো লোকের খরচ কুলোবে না।' বলেই আবার বললেন, 'আমরা ভেণ্ডার গাড়ীতেই যেতে রাজী আছি।'

ব্যবস্থা হয়ে গেলো। চেপে বসলেন তাঁরা ইষ্ট বেঙ্গল মেলে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলেন তাঁরা গোয়ালন্দ ষ্টেশনে।

স্থলপথ শেষ। বাকী পথ যেতে হবে জাহাজে। কিন্তু এতোগুলো লোকের জাহাজের টিকিট হবে কি দিয়ে? আর না হলেই বা চলবে কেন? এই দূরদেশে তো আর কেউ চিনবে না তাঁদের! তাই নজরুল পড়লেন ভারী মুস্কিলে! কিন্তু যেখানে মুস্কিল, সেখানেই তো তার আসান। নজরুল কী ভাবলেন কে জানে! খানিকক্ষণ পরে বন্ধুদের কী যেন নির্দেশ দিয়ে একখানা টিকিট আর একখানা মাদুর কিনে জাহাজে উঠে পড়লেন তিনি। জাহাজের পুরোভাগে, 'ডেক'এ তিনি মাদুরখানা পেতে বসে পড়লেন। অন্যান্য বন্ধুরাও এরই মধ্যে এসে হাজির। অথচ টিকিট ছিলো না তাঁদের একজনেরও। নজরুল এবার হাঁটু-মুড়ে বসলেন মাদুরের উপর। আর ধরলেন 'গজল' গান। তাঁকে ঘিরে বসা বাকী বন্ধুরা কেউ মাথা নাড়িয়ে, কেউ বা হাততালি দিয়ে তালের সমতা রাখতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেলো। শুধু যাত্রীরাই নয়, নজরুলের সুমিষ্ট সুরের গজল শুনে জাহাজের কর্মচারীরাও আকৃষ্ট হলেন।

ব্যাপার হলো গুরুতর। একপাশে বেশী ভীড় হওয়ায় একদিকে কাত হয়ে পড়লো জাহাজ! জাহাজ চালানো মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। তাই জাহাজের কাপ্তেন রেগেমেগে নেমে এলেন। কিন্তু রাগ করবেন কার সাথে? তিনিও মজে গেলেন অতো সুন্দর গজল শুনে!

কাপ্তেন এবার নজরুল এবং তাঁর বন্ধুদের জাহাজের মাঝখানে বসে গজল গাইতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। জাহাজের টিকিট পরীক্ষকও গজল শুনে অভিভূত হলেন। ভুলে গেলেন তিনি যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করে দেখার কথা। নিজের হারমোনিয়াম আর তবলা নামিয়ে দিলেন নজরুলের বন্ধুদের, আর খোঁজ নিতে লাগলেন, তাঁদের কোনো অভাব-অভিযোগ আছে কিনা!

বন্ধুদল নিয়ে রসিক নজরুল এবারে পৌঁছলেন ঢাকা শহরে। কিন্তু মুস্কিল হলো তাঁদের থাকা-খাওয়া নিয়ে। এতোগুলো লোক নিয়ে তো আর যে কোনো একটা বাড়ীতে ওঠা সম্ভব নয়! তাই পড়লেন ভারী ভাবনায়। অনেক ভেবে তাঁরা বিভক্ত হলেন ক'টি দলে। তারপর ছোটো ছোটো দল নিয়ে কয়েকজন খুঁজতে বেরুলেন নিজ নিজ আত্মীয়-বাড়ী। নজরুল, বুদ্ধদেব বসু ও আর ক'জন মিলে হলেন এক দলের দলী। বুদ্ধদেববাবুর ভগ্নিপতি তখন ঢাকার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাই এ দলের ভার নিতে হলো তাঁকেই; কিন্তু যা একটু ভাবনায় পড়লেন নজরুলকে নিয়ে। কারণ, তখনকার দিনে আমাদের সমাজ আজকের মতো এতোটা অগ্রণী ছিলো না। ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা আর ব্যর্থ কৌলিন্যের বড়াই সমাজে বর্তমান ছিলো। তাই নজরুলকে 'নজরুল' পরিচয়ে তো আর তাঁর আত্মীয়-বাড়ী নেওয়া সম্ভব নয়। ওখানে তাহলে হয়তো তাঁদেরও ঠাঁই মিলবে না।

ভাবলেন। সবাই ভাবলেন, কী করা যায়! অনেক ভেবে তাঁরা নজরুলের অস্থায়ী নাম রাখলেন স্বামী রামানন্দ! বেশ মানানসই হলো নামটি। কারণ আগেই বলেছি, নজরুল পরতেন

তখন গৈরিক বসন, বাউলের মতো ছিলো তাঁর সুদীর্ঘ কেশ। তাছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ও দৃপ্ত চোখে-মুখেও ছিলো এক অপূর্ব দীপ্তি! তাই স্বামী রামানন্দ না বলে, নজরুলকে 'নজরুল' বলে কার সাধ্য? কৌতুক-প্রিয় বন্ধুদের সাথে নজরুলকে নিয়ে বুদ্ধদেববাবু এবার হাজির হলেন তাঁর আত্মীয়-বাড়ী, সন্ন্যাসীবেশী নজরুলকে দেখে বাড়ীর লোক তাঁর পবিচয় জানতে চাইলেন। বুদ্ধদেববাবু নজরুসকে বেলুড়মঠের 'রামানন্দ বাবাজী' বলে পরিচিত করালেন। মুহূর্তেই বাড়ীর মধ্যে আনন্দেব রোল পড়ে গেলো। সবাই হলেন মহাখুশী। লোকে যাঁকে ডেকে পায় না, তিনি কিনা অযাচিত অতিথি সৌভাগ্যবান তো তাঁরা বটেই! সাধক পুরুষের পদধূলি পেয়ে বাড়ীর সবাই-ধন্য হলেন। পাড়া-পড়শীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো 'বাবাজী'র নাম। সবাই তাঁর দর্শনলাভ করতে আসতে লাগলো। ভক্তি-প্রণাম জানিয়ে ছোটো-বড়ো সবাই হলো ধন্য! এবার আসতে লাগলো মিঠাই-মণ্ডা, ফলমূল, কতো রকম ভেট। রাজার হালে কাটতে লাগলো তাঁর 'বাবাজী-জীবন'।

নজরুলের প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। গণক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিলো। হাত দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যত বলতে তিনি ছিলেন অব্যর্থ। তা ছাড়া বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম-পুস্তকের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ও হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য তো ছিলোই, শ্যামাসঙ্গীতেও ছিলেন তিনি পটু। তাই, তাঁর এই গুণাবলী 'বাবাজী-জীবনে' বেশ কাজে লেগেছিলো। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতাব শ্লোক, সারগর্ভ ধর্মালোচনা এবং সময়-সুযোগ মতো শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে সমাগত পুণ্যলোভী ভক্তবৃন্দকে অভিভূত করে তুলতেন। অনুরক্ত ভক্তবৃন্দও বেশ দু'বেলা আসতো 'বাবাজী'র দর্শনলাভ করতে, আর ধর্মালোচনা শুনতে!

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই — চিত্তরঞ্জন দেব

বাংলা দেশের এক কবি। মানুষের চেয়ে বড়ো তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। কোনো মানুষ তাঁর কাছে এসে হাত পাতলে তিনি পকেট ঝেড়ে সব দিয়ে দেন। সেজন্য তাঁর হাতে কোনোদিনই পয়সা থাকে না। নিত্যদিনের অভাব লেগে থাকে তাঁর। মাঝে মাঝে ওঠেন গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঘুরে বেড়ান সারা দেশে। তাঁর কবিতা ও গান শোনবার জন্য দেশের সকল মানুষ ব্যাকুল হয়ে থাকে। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের আনন্দ বিধান করাই তাঁর একমাত্র নেশা।

এক বন্ধুর বাড়িতে আসর বসেছে গানের। একটি তিন বছরের মেয়ে এসেছে। এই শিশুটিকে আদর করতে করতে কবি বললেন, 'তোমাকে সমস্ত কলকাতাটা মোটরে করে ঘুরিয়ে দেখাবো একদিন, কেমন?'

শিশুটি এসেছিলো গ্রাম থেকে। ফিরে যাবার সময় হলো তার। হঠাৎ যখন আবার কবিকে দেখতে পেলো, সে দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি যে বলেছিলে মোটরে করে কলকাতা দেখাবে?'

শিশুর কথায় কবি যেন লজ্জা পেলেন। অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনই বেরিয়ে গিয়ে একটি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতা প্রদক্ষিণে। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পরেশ-নাথের মন্দির, লাটসাহেবের বাড়ি এবং আরও যা যা দেখবার আছে, সব দেখিয়ে নিয়ে শেষে মনে পড়লো দক্ষিণেশ্বরের কথা—গেলেন সেখানেও। ফিরে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে যাবেন, দেখেন যে, একটিও পয়সা নেই পকেটে। আবার সেই ট্যাক্সিটা নিয়েই

ছুটলেন পয়সার জন্য। এ-বন্ধু সে-বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে ট্যাক্সিওয়ালাকে দিলেন প্রায় পঁচিশ টাকা। এমনি ছিলেন বেহিসাবী। কিন্তু এতে তাঁর কোনো দুঃখ ছিলো না। এর মূলে ছিলো মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসারই সুখ। পয়সা উপার্জন কম হয়নি তাঁর, কিন্তু দারিদ্র্য ছিলো তাঁর নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যকে তিনি ভয় যে করতেন না, তার প্রমাণ আছে তাঁরই রচনায়—

'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান…'

তাঁর শিশু-প্রীতি আমাদের খৃষ্টের কথাই মনে করিয়ে দেয়। খৃষ্টের মানব-প্রীতির আদর্শ তিনি জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছিলেন। সেজন্য যেখানেই মানুষের প্রতি মানুষের দরদের অভাব লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি সকল মানুষের স্রষ্টা পিতা ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—

'তব মসজিদে, মন্দিরে, প্রভু নাই মানুষের দাবী—
মোল্লা, পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।'

আমাদের সমাজে যারা দীন, তুচ্ছ—সেই মজুর, মুটে, কুলিদের কথাও ভগবানের কানে তুলেছেন এই কবি। বলেছেন—

'তোমারে সেবিতে যাহারা হইল
মজুর মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র
অঙ্গে লাগালো ধূলি—
তারাই মানুষ তারাই দেবতা,
গাহি তাহাদের গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে
আসে নব উত্থান।

মানুষের কবি বিদ্রোহী নজরুলের এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি আমরা। তিনি আজ স্তব্ধ, জীবন্মৃত, কিন্তু তাঁর বাণীতে তিনি চিরমুখর, চিরচঞ্চল।

ফুলের জলসায়

বিশ্বনাথ দে

কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বিখ্যাত কে. বি. ক্লাব। বাংলা সাহিত্য-শিল্পের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ এর সর্বে-সর্বা। এই দলের মধ্যে ছিলেন হাসির গানের বিখ্যাত গায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্ত, অভিনেতা স্বর্গীয় জহর গাঙ্গুলী, শ্রীবরদা গুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রমুখ।

সববারের মতো সেবারেও দোলের দিনে কে. বি. ক্লাবে সারা-রাত্রি ব্যাপী এক জলসার আয়োজন করা হয়েছে।

বাড়ীর উঠোনের বিরাট নাটমঞ্চের উপর প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। অজস্র ফুলের সমারোহের মধ্যে দোলনায় দুলছে রাধা-কৃষ্ণ।

এই গানের জলসায় গান গাইবার জন্য বন্ধু নলিনীকান্ত নিয়ে এলেন কবি নজরুলকে। বসতে দেওয়া হলো কবিকে নাটমঞ্চের উপরে জলসার আসরে।

কবি সেখানে বসে তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্পে মেতে উঠেছেন, এমন সময় ক্লাবের উদ্যোক্তাদের ডাক এলো বাড়ীর অন্দর-মহল থেকে।

সারদা গুপ্ত গেলেন ভিতরে। গিয়ে দেখেন সেখানে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে। ভীষণভাবে রেগে উঠেছেন বাড়ীর গৃহিণী।

সারদাবাবুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এ তোমরা কি শুরু করেছো কি?'

সারদাবাবু বিস্ময়ে হতবাক। বললেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? ঠাকুরের নাটমঞ্চের উপরে মুসলমানকে

তুলে বসিয়েছো, আবার জিজ্ঞেস করছো কি হয়েছে?—জানো না ওখানে পূজো হয়? তোমরা কি জাত-ধর্ম কিছুই রাখলে না!—হোক না যতো বড়োই কবি, তাই বলে ওখানে তুলে বসাবে একেবারে? যাও, নাবাও গে ওখান থেকে।'

বকুনি খেয়ে সারদাবাবু অপ্রস্তুত। ভীষণ চিন্তিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এবার তাঁর হলো ত্রিশঙ্কু অবস্থা। কবিকে আর ওখানে বসে থাকতে বলতে পারেন না, আবার তাঁর প্রিয় কাজীদাকে ওখান থেকে উঠে আসতে বলাও তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তাই কয়েকজন মিলে যুক্তি করে ঠিক করলেন, জলসার শুরুতে প্রথমেই গান গাইতে দেবেন কাজীদাকে। আর গান গাওয়া হয়ে গেলে কাজীদা নিশ্চয়ই চলে যাবেন। নিজেদের মুখে আর তাঁকে চলে যেতে বা ওখান থেকে নেমে যেতে বলতে হবে না।

এই ভেবে জলসার শুরুতেই কবিকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করা হলো।

কবি তখন নাটমঞ্চের দেবতার সামনে, দোল্‌নায় দোলা রাধা-কৃষ্ণের ফুলের সমারোহের দিকে তাকিয়ে ভাব-বিভোর হয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে ভাবাবেগে অর্ধ-নিমিলিত চোখে গাইতে শুরু করেছেন:

'আমি শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমার শ্যামা-মা'র নাম।
শ্যামা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু
আর ঠাকুর হলেন রাধার শ্যাম।'

ভাব-বিভোর কবির এই গান শুনে সকলেই হলেন স্তব্ধ। আশ্চর্য এক জ্যোতির্ময় আভায় কবির সারা মুখমণ্ডল যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পরম যোগীর মতো আকুল আন্তরিকতা ফুটে উঠলো তাঁর গানে আর সুরে।

গান শেষ হতে বাড়ীর ভিতরের সেই গৃহিণী; যিনি কবিকে

নাটমঞ্চে ওঠানোতে হৈ-চৈ বাধিয়েছিলেন, তিনিই সবার আগে কবিকে প্রণাম করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলেন।

বাড়ীর ভিতর থেকে কবি-কণ্ঠের এই গান শুনে তিনি ক্রমেই এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর মনে ছিলো না—বাড়ীর বাইরে এতো লোকের ভীড়ের মধ্যে যাওয়া তাঁর পক্ষে অশোভন হবে।

কবি নজরুলের ব্যক্তিত্ব ছিলো এমন যে, সব রকম পরিবেশের সমস্ত আঘাত-অপমান তিনি জয় করতে পারতেন। যে তাঁকে যতো আঘাত হানতো, তার থেকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসা তিনি তার কাছে আদায় করে নিতে পারতেন।

জীবন-সায়াহ্নে কবি নজরুল

আজহারউদ্দীন খান

জীবন-সায়াহ্নের কবিকে আমি দেখতে গেছলুম। কবি তখন ছিলেন বাদুড়বাগান লেনে। কবিকে কিরূপ দেখেছিলুম তার পরিচয় নিয়ে আমার ডায়েরী থেকে তুলে দিলুম।—

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। কলকাতায় গেছলুম, জরুরী কাজে। ইচ্ছে হলো কবি নজরুলকে দেখবার। মনে ভয়ও ছিলো কেমন না জানি তাঁকে দেখবো; তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কবিকে দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখলুম কবির স্ত্রী একটি খাটে শায়িতা, তাঁর পালিতা মেয়েটি কাপড় সেলাই করছেন ও অনিরুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পত্রিকা ওলটাচ্ছেন। আমাকে হঠাৎ দেখে একটু থমকিয়ে গেলেন; আমি কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন অনিরুদ্ধ; আমার ইচ্ছে তাঁকে জানালুম! কবির স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে এমনি সাধারণ পরিচয়েব কথাবার্তা হলো; কথাবার্তায় জানলুম—তিনি পাশ ফিরতেও পারেন না, নীচেব অঙ্গ পক্ষাঘাতে একেবারে অচল, অতি কষ্টে চিঠি-পত্রের উত্তর দেন। কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো কবির ছবি দেখলুম। কি অপরূপ সুন্দর ছবিখানা। ছবিটি দেখে মনটা একটু গুমরিয়ে উঠলো—সেই উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল মহান্ মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ ললাট আর কি দেখবো? ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম। মুখ নীচু করে বসে আছি। এমন সময় কবির পালিতা কন্যা উঠে গিয়ে পাশের ঘরের কপাট খুললেন। কবি নজরুল বেরিয়ে এলেন। চমকে উঠলুম; এ নজরুলকে দেখে চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, ইনিই বিদ্রোহী কবি নজরুল। পরনে একটি লুঙ্গি ও ধূসর বর্ণের হাফসার্ট। মুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে,

তাঁর সেই বিদ্রোহী প্রাণশক্তির ছাপ অস্তরাগের বিলীয়মান আভার মতো মুখে খেলা করছে। দরজার পাশেই আসন পাতা, চারিদিকে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আসনে বসে পড়লেন তিনি ; পাশেই পুরোনো মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি ছেঁড়া অবস্থায় গুটোনো রয়েছে। সেগুলি পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলেছেন—পড়েন না। যখন সবগুলি ওলটানো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে ফিরিয়ে গোছ করে আবার উলটিয়ে চলেছেন। কথাবার্তা বলেন না—মাঝে মাঝে কি একটা বলছেন তা জড়িয়ে যাচ্ছে—বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কবির স্ত্রী বললেন, 'কথাবার্তা তো বলেন না। যখন কপাট খুলে দেওয়া হয় বা কখনো নিজে কপাট খুলে ঐ জায়গাটিতে বসে ঐ বইগুলো ওলটাতে থাকেন ; এই ওলটানোর ফলেই বইগুলোর অবস্থা এমন হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন কি ?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। আমরা সময়মতো খাইয়ে দি—যা দেওয়া হয় তাই খেয়ে নেন ; দুপুরবেলা কোনোদিন একটু ঘুমোন নইলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো চলাফেরা করতে থাকেন বা চুপ করে বসে থাকেন আর ঐ বিড়বিড় করে বকে চলেন। রাত্রে তাঁর বেশ ঘুম হয়। স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যেন তাঁর কাছে অন্ধকার। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের দেখলেও চিন্‌তে পারেন না।'

কবি মাঝে মাঝে আমার দিকে উদাসভাবে তাকাচ্ছেন আর ভিজে আঙুল দিয়ে পাতা উলটিয়ে চলেছেন, কি যেন একটা জরুরী জিনিস খুঁজছেন। একটি একটি করে পাতা ওলটান না ; একসঙ্গে দশ-বারো পাতা ওলটানো হয়ে যাচ্ছে। পূর্বের পাঠাভ্যাস ছাড়তে পারছেন না যেন। আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন। কবির

স্ত্রীকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলুম। কবি-পত্নী বললেন, 'কিছু বুঝতে পারলুম না।'

আবার কবির টাঙানো ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ে গেলো, শিউরিয়ে উঠলুম, যেন চিনতে পারছিনে। এ কবি আর ছবির কবি যেন এক নয়—ভিন্ন। যে কবি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির', তাঁর উন্নত শিরের ও ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে একে রুদ্ধ হয়ে আসছে। মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়ে গেছে, কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা উঠে গেছে, সে সৌম্য মূর্তি আর নেই। তাঁর কবিতার বই রইলো, রইলো তাঁর বিচিত্র বহুকর্মান্বিত জীবনের উজ্জ্বল অবিনশ্বর ইতিহাস—কিন্তু সমস্ত কীর্তির অন্তরালে ছিলেন যে কবি নজরুল, তিনি আর নেই—তাঁর স্থানে আছে রোগে জীর্ণ নজরুল।

কবির স্ত্রীকে তাঁদের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন, 'পূর্বে যে অবস্থায় চলতো, সেই অবস্থা।'

কবির স্ত্রীকে অনুরোধ করলুম যে, আমার খাতায় কবি যেন তাঁর নামটি লিখে দেন। তখন অনিরুদ্ধ আমার খাতা আর ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে কবিকে দিয়ে বললেন, 'লেখো তো বাবা, কা···জী··· নজ···রুল···ইস···লাম···।'

কবি নামটি লিখে দিলেন। কবি-পত্নী সেটা দেখে আমাকে বললেন, 'আপনার ভাগ্য দেখছি খুব ভালো, কেননা আজকাল উনি কোনো কিছু লিখতে চান না—যদিও লেখেন তাও দু'একটা অক্ষর লেখার পরই খাতা কলম ছুঁড়ে ফেলে দেন কিংবা একটা আঁকাবাঁকা লাইন টেনে দেন।'

কবি এখনো আনমনে বইয়ের পাতা উলটিয়ে চলেছেন; বেলাও বেশ হয়েছে। কবির স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আর নির্মম দেহবন্ধনে জর্জরিত কবিকে অন্তরেই আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

কবিকে যেমন দেখেছি   দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়

খুব ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন গ্রামের মধ্যে চলছে। ছাপা কিছু পেলেই হাতের কাছে টেনে নিই। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গান কবিতা স্কুলের ছেলেরা তখন নিয়মিত অভ্যাস করা শুরু করে দিয়েছে। শুনতে খুব ভালো লাগতো। আব্দার ধরলাম কবিব বইয়ের জন্য। তখনকার দিনে হাটে বই বিক্রি হতো। কাকা বই আনতে দিলেন হাটে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলাম, বই আসবে—কখন বইটি হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখবো, কখন নিজ ঘরে বসে আবৃত্তি অভ্যাস করবো? গ্রামের হাটে নজরুলের বই পাওয়া গেলো না। এর বহুদিন পরে একের পর এক বিদ্রোহী কবির রচনাগুলি পড়তে পড়তে এক অনাবিল আনন্দে মন ভরে উঠতো—সে আজ বহুদিন আগেকার কথা।

নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে যেতে পারবো, আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম। কিন্তু সত্যিই সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আজ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রথম কবিকে সংবর্ধনা জানালেন রবীন্দ্রসদনে।

রবীন্দ্রসদনের উৎসবে কবির সঙ্গে যাবার জন্য আমার ডাক পড়েছিলো? আমিই কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক গত চার বছর ধরে। কবি-পুত্র সব্যসাচী আমাকে উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে অনুরোধ করে রেখেছেন কবির সঙ্গে উৎসবে যাবার জন্য। আমার সঙ্গে কবির পরিবারের সম্পর্ক ঠিক আপন লোকের মতো। ঠিক চার বৎসর আগে কবির জন্মদিনে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন, কবির জ্যেষ্ঠ

পুত্র কাজী সব্যসাচী কবির চিকিৎসার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারপর থেকে কবির চিকিৎসার দায়িত্ব আমার হাতেই ন্যস্ত করেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ছোটো ছোটো ঘটনা আমি যা দেখেছি পাঠকদের আনন্দ ও আগ্রহ নিরসনের জন্যই সংক্ষেপে লিখছি। কবি একটি ছোটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যখন বসেন তখন দেখলে কিন্তু একটুও মনে হয় না আমাদের প্রিয় কবি অসুস্থ। ছোটো বালকের মতো তাঁর পুত্রবধূ উমা দেবীর কথা শুনে চলেন। প্রথম প্রথম কবিকে চিকিৎসার প্রয়োজনে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেলে অসুবিধায় পড়তাম, অনেক চেষ্টায় অনেক সময় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটু একটু করে পরীক্ষা করতে পারতাম। এইভাবে দিনের পর দিন কেটেছে, ক্রমে ক্রমে আমিও যেন ঘরের লোক হয়ে গেছি। এখন কবিব ঘরে গেলে কবি খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন। মনে হয় যেন আপন জন কাছে এসেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলছেন।

পুত্রবধূ উমা দেবী ব্লাড প্রেসার নেওয়ার জন্য কবিকে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করলে কবি শুয়ে পড়েন। এই সমস্ত ছোটোখাটো ঘটনা থেকে মনে হয় এখনও কবির অনুভূতি-শক্তি বর্তমান। সময়ে সময়ে যখন কবির শারীরিক অবস্থা ভালো থাকে না তখন কিন্তু কোনো কথাই শোনেন না। কবির শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো, হাঁটতে পারেন। চোখের দিকে চাইলে এক অপূর্ব জ্যোতি চাহনিতে প্রকাশ পায়।

কবির শারীরিক সুস্থতার মূলে কিন্তু দু'জনের কথা মনে আসে। একজন পুত্রবধূ উমা দেবী এবং অপরজন পুত্র কাজী সব্যসাচী। ঐ সঙ্গে মনে পড়ে কাজী অনিরুদ্ধ ও কল্যাণী কাজীকেও। তাঁরাও পিতার অক্লান্ত সেবা করছেন। তাঁদের অক্লান্ত দরদপূর্ণ সেবা কবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কতো সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষার ফলে

সাতাশ বৎসরের দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কবি আজও আমাদের জন্য রয়েছেন। ডাক্তার হিসাবে আমি এই সেবার কথা উল্লেখ করলাম।

কবি কি রোগে ভুগছেন এই প্রশ্ন জনসাধারণের মনে স্বভাবতই জাগে। কবির ব্রেনের সামনের অংশ নষ্ট হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই।...তিনি এক অসাধারণ রোগে ভুগছেন, তার কারণ Medical Scienceএ আজও বের হয়নি।

একদিন কবির ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু হাসলেন। তা দেখে আমার কি যে আনন্দ হয়েছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গত জন্মদিনের আগের কয়েকদিন তাঁর একটু উত্তেজনা ভাব দেখা দেয়, ব্লাড প্রেসার নিয়ে দেখি, প্রেসার বেড়েছে। কবি তাঁর হাত দিয়ে আমায় পরীক্ষা কাজ চালাতে নিষেধ করেন এবং শব্দ করে বিরক্ত ভাব প্রকাশ করেন। কাজী সব্যসাচী কবির ভাব দেখে বলেন, 'কবি কয়েকদিন থেকে একটু অন্য রকম, তাঁকে কি জন্মদিনে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?'

একদিকে অগণিত জনসাধারণ কবিকে একবার দেখবার জন্য অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করবেন অন্যদিকে কবির মানসিক অবস্থা ভালো নয়, অনুষ্ঠান থেকে বের হলে কবির অসুস্থতা বেড়েও যেতে পারে। এই সব কথা চিন্তা করে উপযুক্ত চিকিৎসায় উত্তেজনা কমিয়ে দিয়ে জন্মদিনে তাঁকে রবীন্দ্রসদনে যাবার জন্য বের করি। আপনজন হিসাবে আমি কবির সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিলাম, কবিও বেশ কিছুটা ভালো বোধ করছিলেন। ৭০তম জন্মদিনের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতো সুন্দরভাবে করেছিলেন যে, কবির পক্ষে কোনো প্রকার ক্ষতি বা উত্তেজনার কারণ হয়নি।

বহুদিন থেকে কবি অসুস্থ। কবিব বয়স বাড়ছে, কবি যাতে বাকী জীবন শান্তিতে এবং সুখে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থায় প্রয়াসী হওয়া দরকার জনসাধারণের। সরকার এই বিষয়ে অগ্রণী হয়ে দেশবাসার ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

কবির জন্য দরকার ছোটো একটি সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ী, সামনে খানিকটা সুন্দর বাগান, কবি ফুল ভালোবাসেন, ফুল দিয়ে ভরা থাকবে ঐ বাগানটি। ফুল যে কি রকম কবি ভালোবাসেন তার পরিচয় পাওয়া যায় যখনই কবি তাঁর জন্মদিনে নানা ধরনের লোকের আনাগোনার মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ করেন তখনই তাঁর বাল্যবন্ধু সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ফুল দিয়ে উত্তেজনা কমিয়ে দেন, ফুল পেয়ে খুশী হন তিনি। আবার কখনো কখনো তাঁর অস্থিরতা ভাব কেটে যায় যখন তিনি নিজের রচিত কোনো গান শোনেন। মনে হয় কবি ভালোবাসেন পুত্রবধূ উমা দেবী, কল্যাণী ও বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ এবং ছেলেদের। এঁরাই কবির অস্থিরতা খুব অল্প সময়ে শান্ত করতে সক্ষম হন। এই সমস্ত দেখে মনে হয় কবির অনুভূতিশক্তি এখনও লোপ পায়নি। তদ্বির এবং তদারকে কবিকে এখনও অনেকদিন জীবিত রাখা সম্ভব।

—দে গরুর গা ধুইয়ে!

অমি একেবারে সর্বাঙ্গ চমকে উঠলুম। প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে কবি গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'একি—এতো মালা-টালা দিয়ে এমন জবরজং করে সাজিয়েছে কেন আমায়? কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমায় বলি দেবে নাকি? এতো বেলা হলো, চা-টাও দেয়নি, ক্ষিদে পেয়ে গেছে! কালী কুল দে মা, নুন দিয়ে খাই। ওরে, চা-টা দিবি না কি?'

আমার তখন আনন্দ বিস্ময়ে চূড়ান্ত অবস্থা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এইমাত্র জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠলেন, আমারই চোখের সামনে। তাঁর চোখে মুখে আগেকার সেই বিখ্যাত তেজ ও উজ্জ্বলতা। সারা দেশের লোককে এ সুসংবাদ আমিই প্রথম জানাবো, এই আনন্দে আমারই তখন উন্মাদ হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কবির জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথম ইণ্টারভিউ ছাপাবার কৃতিত্বও আমার।

কবি এখন হাসিমুখে গলা থেকে ফুলের মালাগুলো খুলে ফেলেছেন এবং গুন্ গুন্ করে গান করছেন—বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল!—সেই ভরাট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর। আমি পকেট থেকে খাতা পেন্সিল বার করছিলুম, তিনি আমাকে এই প্রথম লক্ষ্য করে ধমকে বললেন, 'এই ছোঁড়া, তুমি এখানে কী করছো? অ্যাঁ?'

আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'কিছু না, মানে, আপনার

একটা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, আর যদি ছ'লাইন কবিতা লিখে দেন!'

'—এখন হবে না, যাও ভাগো! অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেলো, আবার কবিতা? হবে না, অটোগ্রাফ নেবে তো মেয়েরা, তোমার দরকার কি হে? এখন সময় নেই!'

আমি তবু চুপ করে বসে রইলুম। নজরুল আপন মনেই বললেন, 'ইস, এতো দেরী হয়ে গেলো! নেপেনকে নিয়ে পণ্ডিচেরী যাবার কথা ছিলো, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করবো—'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন?'

'—হ্যাঁ! চেনো নাকি?'

'—আজ্ঞে, চিনি। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। শ্রীঅরবিন্দও।'

'—অ্যাঁ, নৃপেন বেঁচে নেই? কী বলো? কবে মরলো? আমি তখন কোথায় ছিলাম?'

কবির গলায় অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠলো। মানুষকে দুঃখের খবর শোনাবার অভ্যেস আমারও নেই। আমিও খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। তবু মৃদুস্বরে বললুম, 'আপনি একটানা অনেকদিন ঘুমিয়েছিলেন। অ-নে-ক দিন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—'

'—হয়েছে? গেছে সাহেব ব্যাটারা? কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙেছে? সত্যি? তাহলে তো ফুর্তি করতে হয় একটু আজ। পণ্ডিচেরী থাক্, তাহলে আজ অচিন্ত্য আর প্রেমেনকে ডেকে একবার ঢাকা ঘুরে আসি। ওখানে বুদ্ধদেব আছে—'

আমি বললুম, 'বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়েছেন বহুদিন। তা ছাড়া, পাকিস্তান।'

'—পাকিস্তান? হক্ সাহেবের সেই পাকিস্তান? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! জিন্না-গান্ধীজীর ঝগড়া আজও মেটেনি?'

'—ঝগড়া মিটেছে কিনা জানি না, তবে ওঁরা কেউই আর ইহলোকে নেই।'

'—নেই? তবে পাকিস্তান কী জন্যে?'

'—পাকিস্তান ওঁরা বেঁচে থাকতেই হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব আর সিন্ধু নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে অনেকদিন আগে। গত বছর ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও হয়ে গেলো।'

'—যুদ্ধ হয়ে গেলো মানে? পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা যুদ্ধ করবে? চালাকি পেয়েছো? তুমি কে হে ছোক্‌রা? সত্যি করে বলো তো, বৃটিশের স্পাই নও তো?'

আমি বিষণ্ণ হেসে বললুম, 'পূর্ব বাংলার সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু এটা এখন একটা আলাদা দেশ। ওখানকার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, এমন কি বই-পত্রের বিনিময়ও বন্ধ। এখানকার বই ওরা পড়তে পায় না, ওদেব বইও আমরা পাই না।'

'—এরা আর ওরা? তুমি এখান থেকে ভাগো তো! যতো সব মিথ্যে কথা শোনাতে এসেছো। আমি আজকের ট্রেনেই ঢাকা যাবো, দেখি কে আমায় আটকায়! আমি, জসিমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রেমেন, শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, ওখান থেকে অজিত, পরিমল, মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো, দেখি কে কী করে? তুমি এখন সরে পড়ো!'

আমি বললুম, 'আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ করছেন, কিন্তু কথাগুলো সত্যি। আপনি যে ট্রেনে চাপবেন, সে-রকম সরাসরি কোনো ট্রেনই চলে না আজকাল আর। ওদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ সত্যিই একেবারে বন্ধ। আর যাঁদের নাম করছেন, তাঁরা অনেকেই দেশ বদলেছেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে চান, তাহলে দুই সরকারের মধ্যে লেখালেখি করে আপনার জন্যে একটা কোনো বন্দোবস্ত······'

কবি এবার খানিকটা হতাশ চোখে তাকালেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতোদিন সত্যিই ঘুমিয়েছিলুম। তুমি শুধু আমায় খারাপ খবর শোনাচ্ছো! ভালো খবর কিছু নেই?'

আমি চিন্তিতভাবে বললুম, 'ভালো খবর? হ্যাঁ, মানে, এই তো দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা হয়েছে, কলকাতায় অনেক বড়ো বাড়ো বাড়ি উঠেছে—'

তাকিয়ে দেখি কবি আবার অবসন্নভাবে হেলান দিয়েছেন। কী সব বিড়বিড় করতে করতে হাত দিয়ে মালার ফুলগুলো ছিঁড়ছেন।

রাজ-ভিখারী নজরুল হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি নন—একটি মহনীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ তিনি। সত্যিকারের বিরাট সাহিত্য স্রষ্টা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অগ্রদূত হিসাবে নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছে। বলেই রাজনীতিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কাজীর প্রতিভা অভ্রভেদী, গিরিশৃঙ্গে তার স্থিতি, গগনচারী বর্ণাঢ্য লঘুপক্ষ মেঘকে যেমন তার সদা আমন্ত্রণ, ভয়াল বক্রগর্ভ মেঘের আবির্ভাবেও তেমনি তার শৈলচূড়ায় এনে দেয় বাক্যকলাপের আনন্দ সমারোহ।

বিপ্লবী বাংলা চরম দুর্যোগের রাতে কবির বাণীতে তার আত্মার মর্মধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো। নব জাগ্রত বাংলার বুকে তখন নবতম স্পন্দন, নজরুলের প্রেরণায় বাংলার চৈতন্যে এক নবজীবনের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কাজীর কণ্ঠে তখন সহস্র কণ্ঠের ঐক্যতান, সহস্র ধ্বনির ঝঙ্কার ও অনুরণন। নানা রং, রস, নানা মূর্ছনার এ যেন বিচিত্র যাদুপুরী—ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈভব থেকে অগ্নিগিরির লাভা প্রবাহ, সব কিছু এই অপরূপ স্রষ্টিকর যেন রচনা করে যাচ্ছেন। নজরুলের প্রতিভার এক জ্বালাময়ী সর্ব ব্যাপক, সর্ব পরিপ্লাবী রূপে চোখ যেন ঝলসে যায়।

নজরুল তাঁর জীবদ্দশাতেই ইতিহাসের মর্যাদা কেড়ে নিতে পেরেছেন, ভবিষ্যৎ কালের পটে তাঁর নাম ইতিমধ্যেই অঙ্কিত হয়ে গেছে। অনাগত বংশধরের দল এ বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করে রাখবে প্রতিভার এক বিস্ময়কর কীর্তি রূপে এবং তুলনা করবে তাঁকে এক বজ্রধারী টাইটানের সঙ্গে, যে তার প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র ক্ষেপণ করে জড়তা ও মৃত্যু থেকে তার মাতৃভূমিকে বাঁচিয়েছিলো। আগামী দিনকে যারা ভালোবাসবে তারা নিজেদের প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতম করে

তুলবে কাজীর যাহুস্পর্শী কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এ সঙ্গীতে বিরহ ও মিলন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি, সুফীবাদ আর বেদান্ত, সব কিছুরই প্রশস্তি ও বন্দনা গাওয়া হয়েছে।

সত্যিকারের মানব দরদী হিসাবে নজরুল তাঁর বুকে জমাট করে রেখেছেন প্রপীড়িত মানবতার দুঃখ বেদনার গান। এ মরমী সঙ্গীত যে হৃদয়ে ঝংকৃত হয়েছিলো, তা আকাশেরই মতো উদার, প্রশান্ত সাগরের মতো প্রমত্ত, দুর্বার। কাজীর জীবনে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন শতদল—অপরূপ সৌগন্ধে ও মাধুরিমায়। কাজী একাধারে এক ভিখারী ও সম্রাট। কাজী এক মহিমময় রাজ-ভিখারী।

'একদিন রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা।
রানী গেলেন তুলতে কলমীশাক্
বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক্।
রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল-বাচ্চা শিকার করে।'

কে বলবে বলোতো ওপরের ঐ লেখাটি তাঁরই, যিনি লিখেছেন :

'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হবো শান্ত—
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না—'

নাম-প্রমাণাদি না থাকলে কি বিশ্বাস হতো বাংলার কারাদণ্ডে দণ্ডিত একমাত্র কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর লেখনী থেকে এমন দিল্‌খোলা অনাবিল হাসির কবিতা বেরিয়েছিলো ?

নজরুল প্রধানতঃ বিদ্রোহাত্মক কবিতার জন্যই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় আসন করে নিয়েছেন—অমরত্বের সম্মান-মাল্যের অধিকারী হয়েছেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁর দান অল্পই। আবার শিশুদের জন্য যে ক'টি হাসির কবিতা তিনি লিখে রেখেছেন, সংখ্যায় তা আরো নগণ্য। তবু তাঁর কবি-মনের বৈচিত্র্য এতেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, তাঁর অন্তরে একদিকে যেমন নিপীড়িত, অত্যাচারিত, পরাধীন মানুষের অবমাননায় এক বিদ্রোহীর আবির্ভাব হয়েছিলো, অন্যদিকে সহজ, সরল, হাসি-খুশীতে ঝল্‌মল্ এক সুকুমার শিশুও তাঁর ঠাঁই করে নিয়েছিলো। তাই নজরুল যখন শিশুদের জন্য হাসির কবিতা লিখতে গেছেন, তখন অন্তরের

সেই শিশুই যেন জেগে উঠেছে। আর কখনো সে প্রশ্ন করেছে, কখনো অন্যকে বিদ্রূপ করে নিজে বেদম হাসিতে ফেটে পড়েছে। আবার কখনো বা নিজের অপরিণত জ্ঞান-বুদ্ধিতে যা মনে এসেছে তাই বলে অন্যের হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

'খুকু ও কাঠবেড়ালি' কবিতায় নজরুলের অন্তরের সেই শিশুই যেন খুকু হয়ে কাঠবেড়ালিকে প্রশ্ন করছে—

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি!
পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও?
বাতাবি লেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তা'-ও?

কিন্তু কাঠবেড়ালি খুকুর কথার কোনো জবাবই দেয় না। সে আপন মনে পেয়ারা গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় আর ছোটো বড়ো সব পেয়ারা একলাই খায়। খুকু তার কাছে পেয়ারা চায়, কিন্তু সে খুবই স্বার্থপর, তাই তাকে একটাও দেয় না। খুকু রেগে ওঠে—

পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি কুষ্ঠি মুখে!
হেই ভগবান, একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে।

কি সহজ ভাষা আর কি স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। শিশুরা ঘোরালো-প্যাঁচালো কথা জানে না—তাদের কাছে অতো ঢাক-গুড়-গুড় নেই, যা মুখে আসে সোজাসুজি তাই বলে বসে।

শিশুরা দুষ্টুমিতে নিপুণ। তাই কবির অন্তরের সেই শিশু দুষ্টুমি করে তার খাঁদু-দাদুর সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করছে—

অ-মা, তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্ছে ন্যাদা—নাক ডেঙা ডেং ড্যাং!
ওঁর নাকটাকে কে করলে খাঁদা র‍্যাদা বুলিয়ে?

কিন্তু এই শেষ নয়—সে দুষ্টুমি করে মাকে আরো প্রশ্ন করছে—

ওর খাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় 'টু!'···
দাদু বুঝি চীনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু?

তাই বুঝি ওর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু ?
জাপান দেশের নোটীশ উনি নাকে এঁটেছেন !

তারপর দাদুর নাক খাঁদা হওয়ার কারণ এমন মজা করে ব্যক্ত করেছে, যা একমাত্র শিশুর দ্বারাই সম্ভব—

দাদুর নাকি ছিলো না মা অমন বাদুড় নাক,
ঘুম দিলে ওই ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজতো হাজার শাঁখ,
দিদিমা তাই থাব্ড়া মেরে ধ্যাব্ডা করেছেন।

অন্তরে এক শিশু আছে বলেই শিশুরা কি চায় না চায় তা কবির কাছে সুস্পষ্ট। শিশুরা নামতা পড়তে চায় না,—নামতা যদি না পড়তে হতো, আর রোজই যদি রবিবার হতো, তা হলে কি মজাটাই না হতো! তাঁর একটি ছোটোদের কবিতায় এই ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বাবা নামতা পড়ায়, আর না পড়লে মারে—তারই বিরুদ্ধে এ যেন সকল শিশুরই বক্তব্য—

আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হতো খোকা,
না হলে ওর নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।
রোজ যদি হতো রবিবার
কি মজাটাই হতো না আমার,
থাকতো না আর নামতা পড়া লেখা আঁকা-জোকা—

'চিঠি' কবিতায় দাদা ছোটো বোনকে চিঠি লিখছে—

পেয়েছি তোমার পত্র,
যদিও তিন ছত্র,
যদিও তার অক্ষর
হাত-পা যেন যক্ষর
পেটটা কারুর চিপ্‌সে
পিঠটা কারুর ঢিপ্‌সে
এক একটা যা বানান
হাঁ করে কি জানান।

অল্প কয়েকটি কথা, কিন্তু পড়লে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসতে হয়।

নজরুলের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় এই কবিতাটিতে বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

'খোকার বুদ্ধি' কবিতাটিতে আছে—

সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান,
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান।

এতে না হেসে কি উপায় আছে? 'রামগরুড়ের ছানা—হাসতে যাদের মানা'—তারাও হেসে উঠবে এ কবিতা পড়ে।

একটি দুষ্টু ছেলের লিচু চুরি করতে গিয়ে কি দুর্দশাটাই না হয়েছিলো, তারই চমৎকার বর্ণনায় এক অকৃত্রিম হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

কবি নিজেই যেন হয়ে উঠেছেন সেই দুষ্টু ছেলে। লিচু চুরি করতে গিয়ে পুকুরপাড়ের লিচুগাছটার ডালে যেই চেপেছে—ব্যাস্! অমনি ডালটা মড়াৎ করে ভেঙে পড়লো একেবারে মালীর ঘাড়েই! 'সে ব্যাটা বড়ো নচ্ছার/ধুমধাম গোটা দুচ্চার/দিলো খুব কিল ও ঘুসি/একদম জোরসে ঠুসি!' তারপর মালীর কাছে মার-ধোর খেয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় তাড়া করলো হাবুলদের ডাল-কুত্তা। তখন তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম:

আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়?
বাবাগো মাগো বলে
পাঁচিলের ফোকল গলে
ঢুকি গে বোসেদের ঘরে···

আর তারপর সে প্রতিজ্ঞা করলো:

যাবো ফের? কান মলি ভাই
চুরিতে আর যদি যাই।
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায়রে ভুলা—?

নজরুল শিশুদের জন্য লিখতে গিয়ে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর ভাষাতে কোথাও জড়তা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই। কবিতার বিষয়-বস্তুও সহজ ও সুনির্বাচিত। বিশেষতঃ হাসির কবিতায় তিনি যে রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন, যে লিপি-কুশলতা দেখিয়েছেন, তাতে তাঁকে অন্যতম সার্থক শিশু-সাহিত্যিক বলা যেতে পারে। কারণ শিশুদের হাসির কবিতায় যা মুখ্য উদ্দেশ্য তা সফল হয়েছে। শিশুরা তাঁর লেখা ছোটোদের হাসির কবিতা পড়লে না হেসে থাকতে পারবে না।

কবি নজরুল প্রসঙ্গে

মজহারুল ইসলাম

তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র। একটি কবিতা তখন বার বার বলে বেড়াতাম বুক ফুলিয়ে—

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট…।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম গান—

'শূন্য এ বুকে ডানা মেলে
পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়…।'

কিংবা—

'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।'

আমার মতো স্কুলে পড়া ছেলেটি তখন জানতো না ঐ কবিতা কে লিখেছেন, ঐ গানই বা কে লিখেছেন।

আশ্চর্য, হঠাৎ একদিন সেই কবিকেই চোখে দেখলাম। আমার মতো ছাত্রটির মনে সে কী উৎসাহ, যে কবির কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছি, যাঁর গান বার বার শুনেছি—তাঁর জন্মদিনে কোনো এক সূত্রে কবির তখনকার বাসভবন দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেদিনই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, আমার পিতৃদেব ডাঃ আবুল আহ্সান এখানে বহুবার এসেছেন কবি এবং কবি-পত্নীর চিকিৎসার জন্য। আর একজন লেখকের কথা সেদিন জানলাম—তিনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কবির বন্ধু, সেই সঙ্গে আমার পিতৃদেবেরও বন্ধু।

তার বেশ কিছুদিন পর কবির বন্ধুরা গঠন করলেন কবি নজরুল ইসলামকে সারিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'নিরাময় কমিটি'।

তখন আমি পরিচিত হলাম কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সঙ্গে। আমার মতো ছোট্ট ছেলেটির উৎসাহ দেখে তিনি তো অবাক। উৎসাহ থাকবে নাইবা কেন? আমার প্রিয় কবিকে সারিয়ে তোলা হবে, দেশের জন্য যিনি সব দিয়েছেন, চেষ্টা করলে দশে মিলে তাঁর জন্য কিছু করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। আমি যাঁদের কাছে অর্থের জন্য হাত পেতেছি, আমার উৎসাহ দেখে তাঁরা কেউ আমাকে নিরাশ করেন নি। কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি, আমি কবির জন্য কারো কাছে সাহায্য চাইনি। যাঁদের কাছে গিয়েছি, তাঁদের অকপটে বলেছি—কবি নজরুলকে সারিয়ে তোলার জন্য আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি, আপনারা যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেছেন—আমি তা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

দেশ তখন স্বাধীন। অতএব কবি নজরুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া বোধহয় উপায় ছিলো না। অথচ পরাধীনতার যুগে সমস্ত অত্যাচার কবিকেই সইতে হয়েছে। লোকেরা বাহবা দিয়েছে—অবাক হয়েছে। তারপর এক দশক যেতে না যেতেই স্বাধীনতামুগ্ধ দেশবাসী কবি সম্পর্কে হয়ে গেছেন নির্বিকার। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রমের পুরোভাগে ছিলেন নজরুল পাঠাগার। যতদূর মনে পড়ে একমাত্র নজরুল পাঠাগারই তখন নিয়মিতভাবে প্রতি বছর কবির জন্ম উৎসব পালন করতেন একান্ত ঘরোয়াভাবে। তার বিশেষ প্রচার বা আড়ম্বর ছিলো না, ছিলো আন্তরিকতা। যাই হোক, সেই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমি নিয়মিতই যেতাম। দেখতাম কবির সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের কী অনুপম উৎসাহ।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে তিনি অসুস্থ অবস্থায় প্রাণ দেবেন—স্বাধীন দেশের কোনো নাগরিকই তা মেনে নিতে পারেন না। স্বাধীন সরকারের সাহায্যের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের অগণিত নজরুল দরদীর সহযোগিতায় বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে বে-সরকারী উদ্যোগে

কোনো ক্রমে কবিকে পাঠানো হলো ভিয়েনায়, এই আশা নিয়ে যে, হয়তো কবি রোগমুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন আবার আমাদের মাঝে। পথভ্রষ্ট সমাজকে আবার দেখাবেন নূতন করে আলোর পথ।

আমরা হাওড়া স্টেশনে কবিকে পৌঁছে দিতে গেলাম। 'বিদ্রোহী কবি আবার ফিরে এসো' এই ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। প্রতি উত্তরে কবি চেয়ে রইলেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, আর তাঁর নির্বাক ঠোঁট ছুটি বার বার কেঁপে উঠতে লাগলো।

সবাই জানেন, ভিয়েনায় কবিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কবি যেদিন ফিরলেন, আমার সেদিনের বেদনাভরা মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেই বেদনা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো—যখন দেখা গেলো, দেশবাসীও ধীরে ধীরে কবিকে ভুলতে বসেছেন তাঁর কবিত্বের সাময়িক ঠুনকো মর্যাদা দিয়ে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা হারালাম কবি-পত্নী প্রমীলা দেবীকে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন একজনকে হারালাম, যিনি আমাকে পুত্রস্থলভ স্নেহে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। কবির আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় সে সময় আমিও গিয়েছিলাম কবির জন্মভূমি চুরুলিয়ায়, যেখানে কবি-পত্নী আজ চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। কবি ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে লাগলেন। কবির রচিত গানগুলি হারিয়ে যেতে লাগলো। আরো আশ্চর্য, কবির গানের ডিস্কেও মর্চে ধরতে শুরু করলো। তিন হাজার সঙ্গীত স্রষ্টার কপালে এই দশা দেখে কার না দুঃখ হয়!

এমন সময় শুরু হলো চীন-ভারতের বিবাদ। হঠাৎ চারিদিকে শুনি কবির গান, কবিতা। আবার অনুভব করলাম, দেশের মানুষকে দেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত করার জন্য কবি নজরুলের বুঝি জুড়ি নেই।

এই সুযোগে কবিকে আবার জনজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা গঠন করলাম 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি'।

এই কমিটি পরে মহীরূহের আকার ধারণ করেছে। তার পরিবর্তিত নাম হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি'। কবির সাহিত্য ও সঙ্গীত যাতে আরো বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তার চেষ্টা করার জন্যই জন্ম হয়েছে এই একাডেমির। আমাদের সে উদ্দেশ্য আজ বহুলাংশে সার্থক হয়েছে।

নজরুল একাডেমির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রাম-গঞ্জের নানা জায়গায় তখন শুরু হয়েছে কবির জন্মদিনের উৎসবের আয়োজন। দেখতে দেখতে আবার বাংলাদেশেব আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো কবিব গানে আর কবিতায়।

কবি তাঁর অসুস্থতার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সবকারের কাছে সাহায্য পাচ্ছিলেন সাড়ে ছ'শো টাকা। নজরুল একাডেমির প্রচেষ্টায় তা বেড়ে হলো মোট সাত শো টাকা। কবির চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও বিনামূল্যে সরকারী উদ্যোগে করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির অনুপ্রেরণায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রসদনে বিদ্রোহী কবির জন্মদিন পালনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে শ্রদ্ধেয় জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব উপস্থিত হয়ে কবি সম্পর্কে যেসব অবশ্যকরণীয় কাজের কথা বলেছেন, আশা করি অবিলম্বে সরকার সেগুলি কার্যকরী করবেন।

আমি কবির একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী। কবি যতদিন বেঁচে আছেন, একটু ভালোভাবে তাঁকে রাখা হোক, এই আমার কামনা। আর আমি যেন কবির বিদ্রোহী সত্তার সার্থক উত্তরাধিকারী হতে পারি—এই আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

কাজী নজরুল ইসলামের পিতা মুন্সী ফকির আহমদ সাহেব ছিলেন ধর্মভীরু, দানশীল, সরলচিত্ত আর আপন-ভোলা মানুষ।

ফলে তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগটুকু পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, আত্মীয় স্বজনেরা ফকির সাহেবের যেটুকু বিষয় সম্পত্তি জমি জিরেৎ ছিলো সব নিয়ে নেয়, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সত্যসত্যই 'ফকির' করে ছেড়ে দিলো তারা।

ফকির আহমদ সাহেবের কিন্তু বিশেষ কোনোও চিত্ত-বৈকল্য ঘটলো না তাতে। বরং সংসারের প্রতি আরও ঘোরতরভাবে উদাসীন হয়ে পড়লেন তিনি। ধর্ম-কর্মের দিকে ঝুঁকে পড়লেন প্রবলভাবে। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতেন স্থানীয় মসজিদে আর পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের দবগাহে।

দরগাহে খাদেমাগিরি (সেবাইৎ) করে, মসজিদে ইমামতী (আচার্য) করে আর ভক্তজনের বাড়ীতে বাড়ীতে মিলাদ্ শরীফ পাঠ করে সামান্য যা কিছু পেতেন, তাই দিয়েই স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যার ভরণ-পোষণ চালাতেন কায়ক্লেশে। তাছাড়া বাংলা ও উর্দু ভাষার উপর ফকির আহমদ সাহেবের রীতিমতো দখল থাকায়—হাতের লেখাও সুন্দর ঝরঝরে মুক্তোর মতো হওয়ার ফলে চুরুলিয়া এবং তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলের অনেকের দলিল দস্তাবেজ লিখে দিয়ে আরো বাড়তি কিছু রোজগার করতেন তিনি।

নজরুল ইসলামও ওয়ারিশানসূত্রে পিতার এই গুণগুলি কম-বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন নিজের চরিত্রে। পেয়েছিলেন পিতার মতো স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ···কোমল অন্তঃকরণ···দরাজ দিল···আর তাঁর মতো শিল্পী ধাঁচের সুন্দর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন

কঠোর দারিদ্র্য—যে দারিদ্র্য ছিলো তাঁর পিতার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এর জন্য নজরুলের মনে ছিলো না কোনো ক্ষোভ কোনো অভিযোগ। বরং তিনি সমুচ্চ কণ্ঠে বলেছেন :

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছো মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছো খৃষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছো তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব হলো তরবার।"

নজরুলের বয়স যখন আট সেই সময়ে ফকির আহমদ সাহেবের জীবনাবসান ঘটে। অভাবের সংসার এইবার একেবারেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো। তিন নাবালক পুত্র আর এক শিশু কন্যা নিয়ে তাঁদের মা জাহিদা খাতুন ঘোর দুর্দশায় পড়লেন।

পিতার দারিদ্র্যতা হেতু জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সাহেবজান উচ্চ শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ পান নি। তিনি যখন লোকান্তরিত হলেন তখন আর তাঁর কতই বা বয়স? কিশোর বললেই হয়। তবু, সেই বয়সেই বেঁচে থাকার আর মা-ভাই-বোনদের বাঁচিয়ে রাখার স্বাভাবিক প্রেরণায় আসানসোলের কোনোও এক কোলিয়ারীতে বহু কষ্টে একটা চাকরি যোগাড় করেছিলেন।

তাঁর মতো স্বল্পশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ আর অপরিণত বয়স্ক তরুণের কাজই বা কি আর মাইনেই বা কতো! তবু অনটনের সংসারে সেই 'মুষ্টিভিক্ষা'ও কিছুটা তো উপকার করেছিলো। একেবারে অনশনে দিন না কাটিয়ে অর্ধাশন তো জুটেছিলো সকলের।

এতো অভাব, এতো কষ্ট—তবু নজরুলের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেন নি জাহিদাবিবি। তিনি যে কিভাবে ছেলেকে তখনও গ্রামের মক্তবে পড়িয়ে চলেছিলেন, সেটাই আশ্চর্যের।

নজরুলের লেখাপড়ার প্রথম ধাপ শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে।

বাবাই ছিলেন তাঁর সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু। তারপর অক্ষর পরিচয় শেষ হলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো পাঠশালায়।

পাঠশালার গুরু ছিলেন মৌলভী কাজী ফজলে আহমদ সাহেব। আরবী, ফার্সী, উর্দু আর বাংলা ভাষায় তাঁর প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি ছিলো। বাংলা বানান শেখানোর সাথে সাথে নজরুলকে তিনি আরবীও শেখাচ্ছিলেন সযত্নে। কারণ তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুয়ায়ী শরীফখানদানের মুসলমান ছেলেদের পক্ষে কিছুটা আরবী শিক্ষা করা অপরিহার্য ছিলো।

খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন নজরুল ইসলাম। মক্তবের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি বেশ সাবলীলভাবে আর নির্ভুল উচ্চারণে 'কোরাণ শরীফ' পাঠ করতে পারতেন। তাঁর আরবী, উর্দু—বিশেষ করে আরবী উচ্চারণ আর সঠিক কোরাণ পাঠ শুনে, একবার এক জবরদস্ত মৌলানা বালক নজরুলের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ছাত্র হিসাবে নজরুল ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী। ছাত্র-গুরু নির্বিশেষে সকলের ছিলেন তিনি প্রিয় পাত্র। তাই শিক্ষকের পরলোক-গমনের পর—শত দুঃখ, কষ্ট, অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়ে, বছর দুই পরে নজরুল ইসলাম যখন এক শুভদিনে গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন, তখন সারা গ্রাম ধন্য ধন্য করে উঠলো তাঁর নামে।

কিন্তু ছেলেকে হাইস্কুলে পড়াবার যে দুর্বার বাসনা ছিলো জননী জাহিদাবিবির অন্তরে—যে দুরন্ত অভিলাষ ছিলো ছোট্ট নজরুলের ততোধিক ছোট্ট মনের ভিতর সংগুপ্ত হয়ে, সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেলো দারিদ্র্যের জন্য।

এই কাজী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি-সংবেদক আর শ্রদ্ধাশীল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিরা মাতা-পুত্রের এই স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলতে না পারলেও তাঁদের দারিদ্র্য মোচনের একটা উপায় অবশেষে করে

দিলেন সকলে মিলে। যে মক্তবে নজরুল নিজে পাশ করে বেরিয়েছেন হালফিল সেই ছোট্ট মক্তবের ততোধিক ছোট্ট মৌলভীর পদে সাদরে বরণ করে নিলেন তাঁকে।

মাইনে যেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তেমনি নিয়মিতও নয়। তবে নিয়মিত পাবার আশা করা যায় ছাত্রদের বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেওয়া 'সিধে'টা—অর্থাৎ কিছু চাল-ডাল-কলা-মুলো-বেগুন-কাঁচকলাব ডালি। আর ভাগ্য যদি খুবই সুপ্রসন্ন থাকে, তবে নৈবেদ্যব চূড়ায় সন্দেশের মতো—দু'একটা হাঁস বা মুর্গীব ডিমও অধিকন্তু জুটে যেতে পারে বরাতে। সিধের পরিমাণ অবশ্য বেশী হবার কথা নয়—কারণ ছাত্র সংখ্যা তো নগণ্য, তার উপর সকলের অবস্থা বা রুজি-রোজগারও সমান নয়।

তবু মন্দের ভালো হিসাবেই জাহিদাবিবি ব্যবস্থাটাকে তখনকার মতন মেনে নিলেন।

শুধু পাঠশালার গুরুগিবিই নয়, সেইসঙ্গে আরো একটি সম্মানের কাজও জুটে গেলো নজরুলের কপালে। কাজটি হলো, স্থানীয় মসজিদের ইমাম (আচার্য) আর মোয়াজ্জীনের (আজান-দাতা) পদ। যে কাজটি তাঁর মরহুম (স্বর্গীয়) আব্বাজানই করে গেছেন শেষ জীবনে। পদটি যতো গুরুতর—পদাবৃত লোকটি কিন্তু ততো হালকা। কারণ নবীন ইমাম আর মোয়াজ্জীনেব বয়স তখন সবে মাত্র এগারো বছর। চুরুলিয়া গ্রামের ইতিহাসে—সম্ভবতঃ সারা মুসলিম জাহানের ইতিহাসেই কোনোও মসজিদের এতো তরুণ ইমাম এই প্রথম।

কাজও যেমন বাড়লো, সংসারে আয়ও তেমনি বাড়লো। জাহিদা-বিবির চোখের সামনে অনবরত ঝুলে থাকা কৃষ্ণ-যবনিকার স্থানে স্থানে রীতিমতো ফাটল দেখা দিলো যেন।

নজরুলের পিতা মুন্সী ফকির আহমদ জীবনের শেষ পর্যায়ে পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের দরগাহের খাদেমী আর মসজিদের ইমামী

করে গেছেন। ফকির আহমদ সাহেব ঐ দরগাহে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সাঁঝ-ঝাড়ু দিতেন। সেখানে নিরালা নির্জনে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন একাসনে—বালক নজরুল তাঁর আব্বাজানের সেই ধ্যান-সমাহিত মূর্তি দেখেছেন বহুদিন বহুভাবে। মসজিদে গিয়ে পিতার সঙ্গে নমাজ পড়তেন, সাজ্দা (আভূমি নত হয়ে প্রণাম) করতেন অভিজ্ঞ নমাজকারীর মতো, সময়ে রোজাও রাখতেন। সেই যে ধর্মভাব স্ফুরিত হয়েছিলো ধার্মিক পিতার সান্নিধ্যে থেকে—এবার নিজে ইমাম নিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বর্ধিত হলো।

কিন্তু যোগ্যতা এক জিনিস এবং ধর্মভাব আর এক জিনিস। মসজিদের ইমামতী করতে হলে যে যোগ্যতা বা উপযুক্ততার প্রয়োজন হয়, নজরুল ইসলামের তা খুব অল্পই ছিলো। প্রথম অভাব ছিলো অভিজ্ঞতার, দ্বিতীয় অভাব ছিলো বয়সের। তবু পিছু হঠলেন না তিনি। দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে এলেন ইমামতীর কাজে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য-পরামর্শ বিধি-বিধান আর উৎসাহ দিয়েছিলেন নজরুলের দূর সম্পর্কের এক কাকা মুন্সী বজ্‌লে করিম।

মুন্সীচাচার কাছে ইসলামের ধর্মীয় ভাষার 'সবক' (পাঠ) নিতে গিয়ে নজরুল প্রথম সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, চাচাজী বাংলা গান ও উর্দু গজল লেখেন। শুধু লেখেনই না, তাতে সুর দিয়ে গুন্‌গুন্ করে গেয়েও থাকেন। এই সুরের ঝংকার তাঁর অন্তরে সংগোপনে থাকা সেই স্পর্শকাতর স্থানটিতে হঠাৎ ধাক্কা দিলো। নজরুলের ঘুমিয়ে থাকা কবি প্রতিভার কমল-কোরক এইবার জেগে উঠে তার পাপ্‌ড়ি মেলা শুরু করলো। মনের পাপিয়া-বুলবুল আর দোয়েল-শ্যামারা চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই ছন্দোময় আঘাতে।

নজরুলের ঘুমন্ত কবি-সত্তার জেগে ওঠার আরো একটা কারণ হলো গ্রামবাংলার হিন্দু বা মুসলিম ধর্মানুষ্ঠানে পুঁথি-পড়ার রেওয়াজ।

এই সমস্ত পুঁথি হিন্দুদের লেখা হতো পয়ার ছন্দ আর গানে কীর্তনে; মুসলমানদের লেখা থাকতো—উর্দু-ফার্সী এবং বাংলার সংমিশ্রণে গজলের আকারে। এই সব দেখে-শুনে ও পড়ে, নজরুল সেই কিশোর কালেই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গীত ও গজল লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। অবশ্য তাঁর ঐ সময়কার সমস্ত গানই ধর্মভাব-পূর্ণ ও মোল্লা প্রভাবিত শরীয়তী আদর্শে রচিত। কারণ—কিশোর আচার্য নজরুলের সে জীবন তখন মোল্লা-প্রভাবান্বিত জীবন। বয়সে নবীন—একেবারে নেহাৎই কচি ও কাঁচা হলেও তাঁর উপর যে কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা কচি-কাঁচাদের উপযুক্ত নয়। মসজিদের মাননীয় ইমাম তিনি; তাঁর অধীনে বহু লোক নমাজ পড়েন, 'খোত্‌বা' (ধর্ম উপদেশ) শোনেন; আসরে আসরে দুলে দুলে সুর করে তাঁকে মীলাদ শরীফ পাঠ করতে হয়। কাজেই তরুণ নবল-কিশোর নজরুল যতো গীত-গজলই লিখুন না কেন, ধর্মভাব-পূর্ণ গান না লিখে অন্য চটুল ধরনের কোনো কিছু লেখা তাঁর পক্ষে বেমানান নিশ্চয়।

নজরুলের সে সময়কার লেখা গজলের নমুনা এই রকম—

নমাজ পড়ো মিঞা ওগো নমাজ পড়ো মিঞা,
সবার সাথে জমায়েতে মসজিদেতে গিয়া,
তাতে যে নেকী পাবে বেশী
পর সে হবে খেশী
থাকবে নাকো কীনা, প্রেমে পূর্ণ হবে হিয়া॥

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় আর একটি হলো—আরবী-ফার্সী শব্দের বাহুল্য। এই বাহুল্যতা কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের রচনার ভিতরেও বর্তমান। বিভিন্ন ভাষার শব্দ চয়ন, এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগও যে মুন্সীয়ানার পরিচায়ক—নজরুল ইসলাম বহুবার তার পরিচয় দিয়েছেন।

যাই হোক, কিশোর নজরুলের জীবনে এই মোল্লাগিরির প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তিনি মক্তবের মৌলভী…দরগাহে খাদেমী আর মসজিদে ইমামতী করেও, সংসারের উপর চেপে বসে থাকা পাষাণভার দারিদ্র্যের চাপ একটুও হালকা করে তুলতে পারলেন না। বরাতে যে অর্ধাশন—সেই অর্ধাশনই বজায় রইলো। খিদের জ্বালায় ছোটো ভাই আলী হোসেন আর কচি বোন কুলসম যখন অবুঝের মতো কাঁদতো, তখন মায়ের সেই কাতর-করুণ ও অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইতো নজরুলের। নিজেও সময়ে সময়ে দিশাহারা হয়ে পড়তেন কর্তব্য কি বুঝতে না পেরে।

ক্ষুধার্ত ভাই-বোনের কাতরানি…অসহায় মায়ের চোখের জল… নিজের অক্ষমতা—এ সব ভেবে মন তাঁর অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠলো। নমাজে আর মন বসে না; খোত্‌বা শোনাতে গিয়ে কি মিলাদ শরীফ পড়তে বসে আগেকার সেই আন্তরিকতার সুর যেন তিনি আর ফিরে পান না। ধর্ম মানুষের জীবনে মঙ্গলময় নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্তহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে যাদের সব সময়ে লড়তে হচ্ছে… মাসের ভিতর কুড়িটা দিন যাদের আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে, তাদের পক্ষে খালি পেটে ধর্ম কর্মে মন দেওয়া একটু কঠিন বৈকি! তা ছাড়া—হুজ্জত তো অনেক। শরীয়তী আইনে ইসলামধর্মের বিধি-বিধানও আবার অনেক, আর বিচ্ছিরি রকমের কড়া। পয়সার অভাবে ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে গেলে মনের যে স্থিরতা আর চিত্তের যে প্রশান্তির প্রয়োজন—নিত্য অভাব অভিযোগের তাড়নায় নজরুলের তা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তা ছাড়া বাসাটাও ঐ স্থিরতা প্রশান্তি বা সমাধিস্থতার পক্ষে অনুকূল ছিলো না। তবু কিশোর আচার্যটি যে উপবাসী থেকে, বাড়ীর সমস্ত অভাব-অনটনের অশান্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে, দিনের পর দিন মসজিদের মিনারে উঠে সুরেলা কণ্ঠে আজান দিতে পেরে-

ছিলেন, খোত্‌বা শুনিয়ে, মিলাদ পাঠ করে আর নির্ভুল উচ্চারণে নমাজের 'কেরাত্‌' পাঠ করতে পেরেছিলেন, নর-নারী বালক-বৃদ্ধ যুবা সবাইকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের স্বল্প কিন্তু সংহত ক্ষমতার পাশে আবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন ঐ অভুক্ত অবস্থায়—কাউকে এতোটুকু বুঝতে দেন নি, জানতে দেননি নিজের অনশনের কথা, ইমামী বা খাদেমিতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি কিম্বা ভাব-বৈষম্য, এটাই আশ্চর্যের। নজরুলের চারিত্রিক দৃঢ়তার এও একটা প্রমাণ।

'অভাবে স্বভাব নষ্ট'—বাংলা প্রবাদেই আছে। সুতরাং আর থাকতে না পেরে, ক্ষুধার তাড়না আর সইতে না পেরে, নজরুল যদি ধর্মের বেড়া-বাঁধন কেটে, শরীয়তী গণ্ডী পেরিয়ে জীবনের মুক্ত খোলা অঙ্গনে আসবার জন্য শেষ পর্যন্ত আকুল হয়ে ওঠেন, তবে তাঁকে নাস্তিক বা পাতকী বলে অভিযুক্ত করা যায় কি? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো বটেই।

নজরুল ইসলাম যদি ঐ ধর্মীয় বেড়া-বন্ধন আর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারতেন কোনো রকমে, তবে গ্রাম্য মুসলমানদের কাছে তিনি হয়তো একদিন একজন বিরাট মোল্লা কিম্বা ছোটোখাটো পীর সাহেব হতে পারতেন ঠিকই—কিন্তু ভবিষ্যতে সুবে বাংলার 'কবি বুলবুল' কিম্বা 'বিদ্রোহী কবি' হতে পারতেন না কোনোদিনই। সে সম্ভাবনা তাঁর কচি মোল্লার জীবন-বেদীতেই বলিদান হয়ে যেতো।

ভাগ্যিস সে সময়ে চুরুলিয়া গ্রামাঞ্চলে লেটো-গানের প্রভাব বেড়ে চলেছিলো, ফলে ধীরে ধীরে ঐ লেটো-গানওয়ালাদের আনন্দ-স্ফূর্তি আর স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে তাঁর মনও ঝুঁকে পড়েছে তাঁরই লেখা একটি গানে—

সে নমাজ আর বন্দেগীতে নাই ফল ভাই রে,
যাতে দেহের সাথে দেলের যোগ নাই রে।

মন আছে ক্ষেতে ভুঁইয়ে
তন্ আছে মজিদ ছুঁইয়ে
দেহ আর দেল দূরে দূরে দুই ঠাঁই রে।
তার চেয়ে গান গাওয়া ভালো, তারে-নারে নাইরে॥

লেটো-গানের দলে যোগ দিয়ে পেটের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষিতভাবে মিটলো না সত্য, তবে মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবেই মিটলো। তাঁর শুকিয়ে আসা প্রাণ-তরু আর মূর্ছানো কবিত্ব কুসুম আবার রঙে-রসে-গন্ধে আর রূপে সজীব হয়ে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল ইসলাম আবার প্রাণবন্ত কিশোর হয়ে উঠলেন। মুখে দেখা দিলো হাসি। প্রাণে জেগে উঠলো কবিতা—সে কবিতা গান হয়ে ঝরে ঝরে পড়লো তাঁর সুধাকণ্ঠ থেকে। তিনি বুলবুল হয়ে মাতিয়ে তুললেন কবিতার গুলবাগিচা।

এক কিশোর-আচার্যের সমাধিতে জেগে উঠলো এক কিশোর কবির টলটলে চারা। তাতে দেখা দিলো আগামী দিনের কুসুমিত মাসের কোরক কিশলয় আর হিল্লোল।

নজরুল স্মৃতি

পঞ্চানন ঘোষাল

সুদূর বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করলে প্রথম নজরুল-দর্শনের বিষয় মনে পড়ে। আমি ও আমার ভ্রাতা ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল তখন স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় আমরা নজরুলের অগ্নিবীণা পড়ে মুগ্ধ হই। আমাদের অভিভাবক রায় সাহেব কালিসদয় ঘোষাল তখন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার। ঐ বইখানি সরকার বাহাদুরের নির্দেশে রিভিউ করার জন্য কোয়ার্টারে এনেছিলেন। এর পরে তাঁর আরও একখানা বই আমরা পড়েছিলাম। এই বইখানার নাম ছিলো—'রিক্তের বেদন'। আমরা দূর হতে দেখলাম উনি অনুবাদ করলেন 'প্যাঙ্গস্ অফ দি ডেসটিটিউড (Pangs of the Destirtude)। এর পর আমরা তাঁর আরও একখানি বই পড়ে মুগ্ধ হই। ঐ বইখানির নাম ছিলো 'বিষের বাঁশী'। আমাদের কিশোর মনকে এ তিনখানি বই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। অসহযোগের আন্দোলনের সময় একদিন স্কুল ত্যাগ করে দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনতেও বেরুই। কিন্তু পরদিন হতে আবার আমরা শান্তশিষ্ট ও অভিভাবকদের অতিবাধ্য হই। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের দর্শনলাভের জন্য অতি ব্যাগ্র হয়ে উঠি।

আমাদের তদানীন্তন পারিবারিক গ্রামীন বাড়ী রায়বাহাদুরস লজ হতে বার হয়ে নৌকাযোগে আমরা গঙ্গা পার হলাম। আমাদের জমিদারীর নায়েব কাজী নজরুলের হুগলির ঠিকানাটা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমাদের অভিভাবক এবং বহু আত্মীয়স্বজন তখন উচ্চপদস্থ পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মী। তাঁদের মুখে শুনে-ছিলাম নজরুলের সঙ্গে দেখা করলে আর কখনও আমরা তাঁদের মতো

আই. সি. এস. কিংবা আই. পি প্রভৃতি চাকুরে হতে পাবো না। কাজী নজরুলের বাড়ীতে গোয়েন্দা বিভাগ হতে ওয়াচ বাসনো আছে। তাঁর বাড়ীতে কেউ গেলে তাদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর কর্তৃপক্ষের কাছে চলে আসবে। তাই গোপনে তাঁর হুগলির বাসায় গিয়ে আমরা দেখা করলাম। আমাদের প্রতি তাঁর সুন্দর ব্যবহার আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিদায়কালে বড়ো-রাস্তা পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছিয়েও দিয়েছিলেন তিনি নিজে।

কিন্তু কলকাতায় ফেরার দু'দিন পরে আমাদের অভিভাবককে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছ হতে ফিরে এসে আমাদের অভিভাবক আমাদের দুই ভাইকে ডেকে পাঠিয়ে চীৎকার করে বললেন—'তোমরা কাজী নজরুলেব বাড়ীতে কেন গিয়েছিলে?' আমরা অবাক হয়ে সেদিন ভেবেছিলাম—বাপরে! কোথায় হুগলি আর কোথায় কলকাতা। তাহলে কেউ কি এতখানি পথ আমাদেরকে 'ফলো' করেছে? পুলিশের বড়োকর্তা আমাদের ঐ অভিভাবকের মুখে একটা শুভ সংবাদও শুনলাম। আমাদের ঐ অভিভাবক স্যার চার্লস টেগার্টকে বলেছিলেন যে, উনি আমাদেরকে আর কখনও আমাদের দেশের বাড়ীতে যেতে দেবেন না। এবং সর্বদা আমাদেরকে তাঁর চোখে চোখে রেখে দেবেন। এতে স্যার চার্লস টেগার্ট উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, 'উঁহুঁ। এতে সমস্যার সমাধান হবে না। Put them in the Police—ওদের কলকাতা পুলিশেতে ভর্তি করে নিতে হবে।' সেই যুগে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের চাইতে কলকাতা পুলিশ ইনস্পেক্টরদের বেতন অধিক ছিলো। অধিকন্তু ঐ চাকুরিতে দেশ-দেশান্তরে না ঘুরে এই শহরেতেই থাকার সুবিধা ছিলো। তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্র-পৌত্রদের পক্ষে এটি ছিলো এক প্রকার লোভনীয় চাক্‌রী। ঐ সময় কোনোও ভারতীয়কে ডেপুটি পুলিশ কমিশনাররূপে পর্যন্ত নিয়োগ করার রীতি ছিলো না। এমন কি থানাগুলিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের

প্রায় অধিকাংশ ছিলো য়ুরোপীয় বা এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ান। যাক, বুঝলাম যে, কাজী নজরুল ইসলামের পরোক্ষ দয়াতে আমাদের একটি করে চাকুরির বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। তবে হ্যাঁ আমাদের এজন্য গ্রাজুয়েট হওয়া চাই এবং কাজী নজরুলের মতো রাজ-দ্রোহীদের ত্রিসীমানাতে যেন আর আমাদের দেখা না মেলে। এর পর আমরা কাজী সাহেবের কাব্য ও গীতের অধিকতর ভক্ত হয়ে পড়ি বটে, কিন্তু ছাত্রাবস্থাতে আর কোনোও দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সাহসী হই নি। আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৩০-৩১ সনে কলকাতা ত্যাগের কিছুকাল পূর্বে স্যার চার্লস টেগার্ট আমাদের অভিভাবককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'ইওর বয়েস আর নাউ গ্রাজুয়েট ?—কলকাতা পুলিশে অফিসার পদের জন্য ওদের দরখাস্ত করতে বলো। এই বারকার ব্যাচেতে ওদের আমি ভর্তি করে নেবো।' সত্যই—আশ্চর্য ছিলো ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের কথার মূল্য ও স্মরণ-শক্তি। কিন্তু আমার ভ্রাতা হিরণ্ময়ের মন তখনও শাসককুলের প্রতি অতীব বিরূপ। এই বিপাক এড়াতে হিরণ্ময় যথা সত্বর পড়াশুনার অজুহাতে য়ুরোপে পাড়ি দিলো। সেই বছব হতে আজও পর্যন্ত সে ঐ দেশেতেই আছে। কিন্তু আমাকে স্যাব চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে হলো এবং তাঁর সিলেকশন বোর্ডেও আমাকে উপস্থিত হতে হলো। স্যার চার্লস টেগার্ট আমাকে, আমাদেব উক্ত অভিভাবক রায় সাহেব কালিসদয় ঘোষাল এবং আমাদের পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষালের মতো নামী সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন এবং সাদরে এই কলকাতা মহানগরীর পুলিশী কর্ম-কৃত্যে ভর্তি করে নিলেন।

এর পরের বছরে জোড়াসাঁকো থানাতে আমি অফিসাররূপে নিযুক্ত হলাম। একদিন রাত্রে রাত্রিকালীন রোঁদে বার হয়েছি। কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানী হতে প্রত্যহ অধিক রাত্রে নির্মীয়মান সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউর পথেতে পদব্রজে বাড়ী ফিরতেন।

একদিন বেশী রাত্রে ঐ পথে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। উনি আমাকে চিনলেন। সমাদর জানালেন। শেষে আমাকে পুলিশ হতে হলো—আমি তাঁকে দুঃখ জানালাম। এতে তিনি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা জানিয়ে বললেন—'ওরকম কথা আমাকে বলো না। এটা তোমার মনের গভীরতম প্রদেশের কথা নিশ্চই নয়। সেবাপরায়ণ মন নিয়ে পুলিশে থাকলে মিশনরীদের চাইতে জনগণের সেবা করার সুযোগ তুমি বেশী পাবে।' এর পর আমার উপন্যাস ও কবিতা লেখার প্রচেষ্টা এবং সেগুলির প্রকাশনের বিষয় তাঁকে আমি বলেছিলাম। শুনে তিনি আমাকে সেদিন বলেছিলেন—'উঁহু। ওসব পথে যেয়ো না। ওতে সফল হবে না। বরং অপরাধীদের জীবনী পর্যালোচন করো, ওদের অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসীদের জানাও। এই সুযোগ তোমাদের প্রচুর। ঐ সব বিষয় লেখো।' পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ও এই উপদেশ আমাকে দিয়েছিলেন।

তারপর অধিক রাত্রে প্রায়ই আমাদের ঐ একই স্থানে দেখা হতো। ঐ পথে উনি রাত্রে গ্রামোফোন কোম্পানী হতে ফিরতেন এবং ঐ পথে রাত্রিকালীন রোঁদে আমিও বার হতাম। বড়ো ফাঁপা ড্রেন পাইপ নির্মীয়মান সেনট্রাল এ্যাভুনিউর পাশে জমা করা ছিলো। দু'এক সময় ঐ পাইপগুলির একটির উপর বসে পা দুলিয়ে আমরা কিছুক্ষণ গল্পও করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এতো রাত্রে ওঁর সাথে আমাকে কোনোও সরকারী কর্মচারী কিংবা তাদের কোনোও সংবাদদাতা দেখতে পাবে না। কারণ—অন্যদের মতো প্রমশনাদিতে বিঘ্ন হওয়ার ভয় আমারও ছিলো। কিন্তু পৃথিবীতে কোনোও সংবাদই অজ্ঞাত থাকে না। একদিন এ সম্বন্ধে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন কর্মকর্তা আমাকে সকলের অজ্ঞাতে ডেকে পাঠালেন ও বললেন—'ওহে, কাজী সাহেবের সঙ্গে তোমার রাউণ্ডের সময় দেখা হয় বুঝি? ঠিক আছে। ওঁর সঙ্গে ভাব রেখো। ভয় নেই। ওঁর বাড়ীতেও

যেতে পারো। তুমি হলে তো আমাদের লোক। ওঁদের দলের তো কেউ নও; পরে একদিন এসো। তোমাকে আমি কিছু বলবো।' আমি ঐদিন সাজ্যাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সারমর্ম বুঝতে পেরে মনে মনে একটু হেসেছিলাম। নানা কথাবার্তার মধ্যে কাজী সাহেব আমাকে একদিন বলেছিলেন—'যদি দেশের জন্যে মন কাঁদে তো চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ো। কিন্তু পুলিশে থেকে নিয়োগকর্তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কদাচ নয়। বিশ্বাসঘাতক সর্বদা ঘৃণ্য ও বধ্য।' এই কথাটা বিদ্যুৎ গতিতে আমার সেদিন মনে পড়ে গিয়েছিলো। এরও কিছুকাল পবে আমার তদানীন্তন জনৈক বাঙালী উর্ধ্বতন অফিসারের দু'জন সঙ্গীতজ্ঞ ভাইঝি আমাকে ধরে পড়লো। কাজী সাহেবকে এক রাত্রে আমাদের পুলিশ কোয়ার্টারে আনতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য—কাজী সাহেবের কাছে সুব শিখে গ্রামোফোন রেকর্ড করানো। তাদের অনুরোধে আমি কাজী সাহেবকে অনুরোধ করলাম ও প্রস্তাব করলাম—থানা-বাড়ির পিছনের গেট দিয়ে রাত্রে তাঁকে আমাদের ওপরের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবো। কাবণ—আমার এই উর্ধ্বতন অফিসার এঁইভাবে কবিকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে বলেছেন। অফিসারের এই গোপন প্রস্তাবে কাজী নজরুল ইসলাম হো হো কবে অট্টহাসি হেসে বললেন—'আমি যেখানে যাই সম্মুখ দিয়ে রাজপথের ওপর দিয়ে যাই স্ব-ইচ্ছাতে। তোমাদের ওখানে ওভাবে তো যাবো না। তবে যদি কখনও এদেশ স্বাধীন হয় তাহলে স্ব-ইচ্ছাতে সগৌরবে এই থানা-বাড়িতে ঢুকবো। অবশ্য ততোদিন জীবিত থাকবো কিনা জানি না। যাক, তুমি আমাদের বাড়িতে আগে তো একদিন এসো।'

আমি জানতাম ওঁর বাড়ীতে বিনা কারণে যাওয়া বিপদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন অবাঞ্ছিত সুযোগ এসে গেলো। সে সুযোগ আমার জীবনে না এলেই ভালো হতো। রাত্রি দশটার সময় আমাদের থানাতে সংক্ষেপে একটি টেলিফোন মেসেজ এলো—'কিপ্‌ রেডি।

ওয়ান অফিসার ওয়ান হেড্ কন্‌স্টেবল ফর এ সার্চ ইন ইওর এরিয়া এ্যাট ফোর এ. এম.।' বলা বাহুল্য কাজী নজরুল ইসলাম তখন আমাদের থানার এলাকাতে থাকতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ দিনে থানা অফিসাররূপে আমাকেই নির্ধারিত করা হলো। ভোর রাত্রি চারটের সময় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা এলেন। আমরা থানা হতে কেবল তাঁদের রক্ষকরূপে একসঙ্গে চলেছি। তাঁদের কাছে আদালতের তল্লাসী পরোয়ানা। আমরা কি জন্য কোথায় যাচ্ছি তা তখনও জানি না। পুলিশ দল তাঁদের নির্দেশে মোড় ঘুরে পাশের একটি পথে ঢুকে কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তাঁদের অনুরোধে আমি গতিবান পুলিশ ক'টিকে হুকুম দিলাম—'হল্ট্'। ওঁরা তাড়াতাড়ি বাড়ীটা সকলকে নিয়ে ঘিরে ফেললেন। কড়া নাড়াতেই কাজী সাহেব বার হয়ে এলেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। ভোরও হয়ে এলো। পুলিশের দল সদর্পে ঐ বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। কোনোও দিক হতে কোনোও বাধা নেই। ইতিমধ্যে দিনের আলোও ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও বিজলী বাতিগুলোও পূর্বের মতো জ্বলছে। ওগুলো নেভানোর চিন্তা কোনো পক্ষেরই নেই। আমি এবং শ্রদ্ধেও কাজী সাহেব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে দেখছি। কিন্তু বাক্যের আদান-প্রদান নেই। যেন কেউ কাউকে চিনি না। কোনোও দিনই যেন কেউ কাউকে দেখিনি। উপস্থিত গোয়েন্দা অফিসারদেরও তাই ধারণা। এঁদের একজন কাজী সাহেবকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এঁকে চেনেন? নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। উনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।' আমি নির্বাক হয়ে একটু অধোবদন হলাম, কাজী সাহেবও মৃদু হাসি হাসলেন। এতক্ষণ কাজী সাহেবও তাঁর গৃহের অন্যান্য প্রতিটি কক্ষের প্রতিটি বাক্স খুলতে ও দেখতে বরং সাহায্যই করছিলেন। অবশ্য সত্য কথা বলতে হলে বলবো কোনোও বাধা দিচ্ছিলেন না। কিন্তু একটি বাক্স গোয়েন্দা

অফিসার খুলবার উপক্রম করা মাত্র কাজী সাহেব সেখানে ছুটে এসে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'না না, ওটাতে হাত দেবেন না।' তাঁকে এইভাবে হঠাৎ বিচলিত হতে দেখে পুলিশের সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। ঐ বাক্‌স খুলে উপুড় করা মাত্র কাজী সাহেবের চোখ হতে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো। আমরা এযাবৎ কাল তাঁর চোখে শুধু আগুন ঝরতে দেখেছি। ওরকম শক্ত একজন মানুষের চোখে জল দেখে সকলেই অবাক হলাম। ঐ বাক্‌সে কিছু শিশুর খেলনা ও শিশুর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছিলো। এগুলি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম পুত্র স্বর্গত বুলবুলের ব্যবহৃত সামগ্রী। যাতে এতোদিন অন্য কেউ হাত দিতে সাহস করেনি তাতে আজ এই পুলিশ প্রথম হাতের স্পর্শ দিয়েছে। আমি তখন ঐ বিভাগে নবাগত এক তরুণ পুলিশ অফিসার, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন সেই বাক্‌সটি খোলার ও সেটি উপুড় করার ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে পারিনি। বরং নিস্ফল ও নিস্পন্দভাবে ঐ সব কাজ ক্ষুণ্ণ মনে দেখেছি।

জীবনে বহু জায়গায় বহু পরিবেশে বহু মানুষের ঘর-বাড়ী সার্চ করতে হয়েছে, কিন্তু কবি নজরুলের বাড়ী সার্চ করার সেই বেদনাঘন স্মৃতি আমি জীবনে ভুলবো না।

★